প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৯।

মূল্য ২৲ টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল,
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস্",
৭৭ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

উপহার

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা, ভারতী-সম্পাদক

কল্যাণীয় শ্রীমান্ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু—

ভাই সৌরীন!

প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে—আরম্ভেই যাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহার সমাপ্তির আশা কোন দিনই করি নাই। সেই অল্পমাত্র সম্বলে তুমি যখন জোর করিয়া ইহাকে লোক-চক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলে, তখন ভয় হইয়াছিল,—একি শেষ হইবে! যাই হোক্, শুধু তোমার উৎসাহ যে কতখানি বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া আমার লেখাকে চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, সে কেবল তুমিই জান! তুমি ইহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছ, তাই 'প্রত্যাবর্ত্তন' তোমার হাতেই দিলাম।

কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩২৯।

আশীর্ব্বাদিকা—
দিদি

প্রত্যাবর্ত্তন

সূচনা

শ্মশানে

শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছিল ধূ-ধূ, ধূ-ধূ—

দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি। পরপারের সীমারেখাকে অস্পষ্ট করিয়া যেখানে দুইটি নদী মিলিত হইয়াছে, তাহারই সঙ্গমস্থলে অনেকখানি বালুর চর নদীগর্ভ হইতে তীরের দিকে খোলাজমির সৃষ্টি করিয়াছে। সেই বালুচরের উপর শ্মশানঘাট। শ্মশানে তখন একটি মাত্র চিতা জ্বলিতেছিল। সূর্য্য সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। ধূসর বর্ণের মেঘের ভিতর দিয়া অস্ত-সূর্য্যের রাঙ্গা আলো আকাশেও যেন চিতার আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। তরঙ্গহীন শান্ত নদীর জলে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়ায় জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেন একই ভাবের সমন্বয় চলিতেছিল। কথোপকথননিরত সহযাত্রী-দলের সঙ্গ এড়াইয়া চিতার অদূরে বসিয়া যে যুবক,—সে-ই জ্বলন্ত চিতায় এইমাত্র জীবনের সমস্ত সুখ-আশা বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার বুকের মধ্যেও বুঝি চিতাবহ্নি এমনি লেলিহান রসনা মেলিয়াই জ্বলিতেছিল।

যুবকের নাম গৌরীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। চিতায় যে দেহ জ্বলিতেছিল, তাহা তাঁহারই সহধর্ম্মিণী দুর্গাবতীর।

ক্রমে সূর্য্যাস্তের রাঙ্গা আলোর সহিত চিতার আলো নিভিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। শ্মশানযাত্রীরা নদী হইতে কলসী ভরিয়া জল তুলিয়া

আনিয়া চিতা ধুইয়া স্নান করিতে গেল। গ্রাম-সম্পর্কে একজন গৌরী-পতির খুড়া হন,—তিনি কাছে আসিয়া গৌরীপতির কাঁধে হাত রাখিয়া নাড়া দিয়া তাঁহাকে সচেতন করিয়া কহিলেন,—"গৌরি, আর কেন বাবা, সব ত শেষ হয়ে গেল, এইবার স্নান করে বাড়ী চল।" গৌরীপতি এতক্ষণের পর যেন সসংজ্ঞ হইয়া আহ্বান-কারীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "খোকা—?" খুড়ামহাশয় দূরে বৃক্ষতলে যেখানে কালী চাকর একটি সুন্দর বালককে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া দেখাইয়া কহিলেন, "খোকা ঐ যে কালীর কোলে। তার স্নান হয়ে গেছে—ছেলে একবারও কাঁদ্‌ল না, গোপাল আমাদের যেন পাথরের গোপাল হয়ে গেছে—আহাহা, কি লক্ষ্মীই আমরা হারালুম!" বলিয়া অকৃত্রিম বেদনার অশ্রুসজল দৃষ্টি সদ্য-ধৌত চিতার দিক্ হইতে ফিরাইয়া লইয়া গৌরীপতিকে একরকম জোর করিয়াই টানিয়া তিনি স্নান করাইতে লইয়া গেলেন। স্নান সারিয়া সকলে তীরে উঠিলে কালী অগ্রসর হইয়া ছেলেটিকে গৌরীপতির কোলে দিয়া কহিল, "দাদা, খোকাকে নাও—।" ছেলেকে কোলে লইয়া দুই হাতে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলে এতক্ষণের পর গৌরীপতির চোখ দিয়া শোকের তীব্র দাহ অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিয়া খুড়ামহাশয়-প্রমুখ সকলেই আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন, শোক এইবার সহের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

প্রথানুসারে বালক গোপালকে দিয়া সেই যে তাহার মৃতা জননীর মুখাগ্নি করানো হইয়াছিল, তাহার পর দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গোপাল একবারও কাঁদে নাই, একটিও প্রশ্ন করে নাই! শুধু বড় বড় দুটি কালো চোখের অপলক দৃষ্টি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে ভরিয়া জ্বলন্ত চিতার পানেই চাহিয়াছিল। চিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। শেষকার্য্য শেষ

হইল! তবু বালকের দৃষ্টি ও মন সেই একই দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। বাড়ী ফিরিবার সময় সে প্রথম কথা কহিল, বলিল, "বাবা, মা যে একলা রইল!" এ প্রশ্নের জবাব গৌরীপতি দিতে পারিলেন না। অপর একজন কহিল, "না গোপাল, মা ত একলা নেই ভাই, তিনি ঠাকুরের কাছে স্বর্গে চলে গেছেন কি না।" গোপাল দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না; কেবল সংশয়িত বিস্ময়-ব্যাকুল চোখে মায়ের চিরানন্দময়ী মূর্ত্তি-দগ্ধকারী নির্ব্বাপিত চিতার পানে বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মা স্বর্গে গিয়াছেন এ কথা সে কেমন করিয়া মানিয়া লইবে? স্বর্গ—সে ত ঐ নীল আকাশেরও ঊর্দ্ধে কোন্ জ্যোতির্ম্ময় আলোকের রাজ্যে! সেখানে দিব্য বেশে দিব্য রথে চড়িয়া যাইতে হয়। দেবদূতেরা পুষ্পমাল্য রক্ত-বস্ত্র ধারণ করিয়া লইতে আসে যে! কিন্তু গোপাল নিজের চোখে দেখিয়াছে তাহার মাকে ইহারা কাঠের ভিতরে চাপা দিয়া আগুনে জ্বালাইয়া দিয়াছে—বাবাও তাহাতে যোগ দিয়াছে—আর গোপাল—! নিজে তাঁর ঘুমন্ত মুখে চুমা না খাইয়া, গলা জড়াইয়া তাঁহার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া না থাকিয়া, ঐ লোক-গুলা তাহারই হাত ধরিয়া যে আগুনের জ্বলন্ত জ্বালা মার মুখে লাগাইয়া দিয়াছিল, সেই আগুনের খড় নিজের হাতে ছুঁইয়াছে যে,—তবে!

দাহকারীরা বাড়ী ফিরিতেই ক্রন্দনের চাপা আওয়াজ উচ্চ হইয়া উঠিল,—"ওরে বাবা, আমার সোনার প্রতিমা কোথায় বিসর্জ্জন দিয়ে এলি রে! আমার ঘরের লক্ষ্মীকে কার কাছে রেখে এলি রে বাপ—!"

গোপাল-মন্দিরের সেবায়েৎ গৌরীপতির ছোট-খাট সংসারখানি অনেকের আদর্শ ও ঈর্ষার স্থল ছিল। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য এবং বিদ্যা একাধারে এই সংযোগ গৌরীপতিকে গ্রামের মধ্যে আদর্শ আখ্যা দিয়াছিল। স্নেহময়ী সন্তান-বৎসলা জননী, প্রেমময়ী পত্নী, বাল-গোপালের প্রতিকৃতি তাঁহার বালক পুত্র গোপাল, ভগবানের অজস্র করুণারই দান বলিয়া মানিয়া

লইয়া নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করিত। অতি সুখ সহে না,—বিধির এই উক্তির সার্থকতা দেখাইতেই যেন কাল বিসূচিকা রোগ বারো ঘণ্টার মধ্যে গৌরীপতির সাংসারিক জীবনের সুখ-শান্তি অপহরণ করিল! সহধর্ম্মিণী দুর্গাদেবী সজ্ঞানে স্বামী ও শাশুড়ীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাসিমুখে স্বর্গারোহণ করিলেন, মরণের পূর্ব্বে সন্তানের মুখের পানে চাহিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে চাহিতেছিল, সাধ্বী সবলে তাহা দমন করিয়া স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—"গোপাল এত ছোটবেলায় মা-হারা হচ্ছে, ওকে তুমি আর একটি মা এনে দিয়ো। আমাদের মারও সেবার ত্রুটী যেন না হয়, দেখো।" এ কথায় গৌরীপতি শিহরিয়া ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "না দুর্গা, এ-রকম অনুরোধ তুমি আমায় করে যেয়োনা, গোপালকে দিয়ে তুমি ত আমায় পিতৃ-ঋণে মুক্তি দিয়েছ! গোপাল আমার মার কাছেই সহস্র মায়ের স্নেহ পাবে, আর মার জন্য আমি ত রইলেম। এখানকার বাকী কটা দিন একলাই আমার কেটে যাবে, তারপর—সেখানে তোমাকেই যে আবার আমি পাব!" এ কথার পর পরম-সুখে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া স্বামীসৌভাগ্যবতী যে নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, মরণকালে তাঁহার মুখে যে গভীর নির্ভর ও বিশ্বাসের চিহ্ন ফুটিয়াছিল, সংসারের সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অতি-দ্রুত-অগ্রসর জীবন-সায়াহ্নের প্রান্তে দাঁড়াইয়াও গৌরীপতি সে দৃষ্টি ভুলিতে পারেন নাই।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া গৌরীপতি শোকাকুলা মাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা, তোমার গোপালকে নাও।"

সর্ব্বমঙ্গলা দেবী আঁচলে বারবার চোখ মুছিতে মুছিতে গোপালকে কোলে লইতে গেলে, সে দুই হাতে দৃঢ়ভাবে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আপত্তির সুরে কহিল, "না, আমি বাবার কাছে থাকব।"

আকাশে সাড়ম্বরে মেঘ জমিতেছিল দেখিয়া খুড়ামহাশয় সংসারের অনিত্যতার চিরপুরাতন বাঁধা উপদেশ নূতন করিয়া শুনাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনের পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে যাঁহারা তখনো পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে আশ্বাস দিয়া ছেলের মুখ চাহিবার পরামর্শ দিয়া জানাইলেন যে, 'যে ভাগ্যিমানি ভগিস্তের জোরে গৌরীকে পতি পাইবার বর লাভ করিয়াছে,' তাহার অনূঢ়া-কাল উত্তীর্ণ হওয়াতেই এই অল্প-ভোগিনী বধূটিকে এত-শীঘ্র নিজের পদ ছাড়িয়া দিয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে বাহির হইতে হইয়াছে—এ যে বিধাতার বিধি—মানুষের গড়া নয় ত! তবে হ্যাঁ, যেমনটি যায়, তেমন কি আর হয়? না, অসময়ের ফলে সময়ের ফলের স্বাদ পাওয়া যায়! ছেলের আবার বৌ হবে বটে, কিন্তু তাঁহার সুখ আর হইবে না! উদাহরণের মধ্য দিয়া ইহাও তাঁহারা জানাইয়া দিতে ক্রটি করিলেন না যে, তেমন সুখের বরাতই যদি তাঁহার হইবে, তবে এমন দুর্ঘটনা ঘটিবেই বা কেন! পোড়া অদৃষ্ট যখন নিজেই পুড়িয়াছে, তখন অন্যের কাছে কিসেরই বা প্রার্থনা! আর সে পাওয়াতেই বা কোন্ সার্থকতা! যাই হোক্ অতঃপর মন বাঁধিয়া ছেলের মুখ চাহিবার উপদেশ দিয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলেন।

রাত্রেও গোপাল বাপের কাছ-ছাড়া হইল না। পিতার কম্বল-শয্যায় তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া সে শুইয়া রহিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গৌরীপতি জাগিয়া ছিলেন। কৈশোর-যৌবনের কত অতীত স্মৃতি আজ যেন ছবির মত তাঁহার মনোদর্পণে একে একে ফুটিয়া উঠিতেছিল, আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল। মনে পড়িতেছিল, কৈশোরের সেই আনন্দময় অনাবিল জীবনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম, বিদ্যাশিক্ষায় কি প্রবল অনুরাগ! আর তাঁহার শিক্ষক? স্নেহময় উন্নত উদার-হৃদয় পিতা, কত স্নেহে, কত কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার সে শিক্ষাদান, তার পর

কি আকস্মিক তাঁর অকাল-মৃত্যু, সহায়-হীনা শোক-কাতরা মায়ের সেদিনের সে মুখচ্ছবি তাঁহাকে কত শীঘ্র জীবন-যুদ্ধে প্রলুব্ধ করিয়া শোক সহিতে সক্ষম করিয়া তুলিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে আর একখানি চিত্র ফুটিয়া উঠিল। বিবাহের বর-কনে গৌরী ও দুর্গা একত্রে মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, মায়ের সেদিনকার যুগপৎ হর্ষ-বিষাদের মিশ্র চিত্র, দুই কোলে দুই জনকে বসাইয়া চোখের জলে ভাসিয়া মা সেদিন বলিয়াছিলেন, "আজ আমার এত দুঃখ স'য়ে বেঁচে থাকা সার্থক হলো গৌরী,—ভগবান্ তোদের দুটিকে যেন কখনো জোড়-ছাড়া না করেন, এই আমার আশীর্ব্বাদ!" বালিকা বধূ—কেহ শিখাইয়া না দিলেও মার সে আশীর্ব্বাদ কেমন সহজে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া আপনা হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়াছিল; কি হইল আজ দুর্গামণি! সে কামনা আজ অটুট রাখিতে পারিলে কই? হাসি-মুখে দিব্য ত চলিয়া গেলে! চিরদিনের সঙ্গীটিকে সঙ্গে লইলে কই? এমনি সহস্র চিন্তা ধীরে ধীরে মানস-পটে ফুটিয়া আবার পরক্ষণেই ধীরে ধীরে মনের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে সারাদিনের দুঃখ-ক্লেশ-মথিত শোকাতুর চিত্ত কখন যে বিশ্রামদায়িনী ঘুমের মধ্যে শান্তি পাইল, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।

সহসা বাহিরে প্রচণ্ড বজ্রনাদের সহিত প্রবলধারে বৃষ্টিপাতের শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গৌরীপতি তাড়াতাড়ি বিছানা হাতড়াইয়া ডাকিতে লাগিলেন, "গোপাল—গোপাল—" মনে পড়িল, খানিক আগেও ঘুমের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গোপাল তাহারই কণ্ঠালিঙ্গনে তাঁহাকে দুখানি বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া রাখিয়াছিল; হয় ত তাঁহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া মা গোপালকে তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। তা'ই সম্ভব! আলস্যে ও অবসাদে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। তবু প্রচণ্ড ঝড়ে বাহিরে দুম্‌দাম্ করিয়া

দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দে বাধ্য হইয়া গৌরীপতি বাহিরে আসিলেন; আসিয়া দেখেন, কালীচরণ তাঁহার পূর্ব্বে উঠিয়া দ্বার জান্‌লা বন্ধ করিয়া উঠানে যেখানে একরাশ শুক্‌নো কাঠ জলে ভিজিতেছিল, তাহারই উদ্ধার-সংকল্পে দাঁড়াইয়া আছে। গৌরীপতির সাড়া পাইয়া সর্ব্বমঙ্গলা দেবী বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "গোপাল ভয় পাবে যে, তাকে একা রেখে এলে গৌরী? চল, ঘরে চল।"

গৌরীপতি কহিলেন, "গোপাল কোথায় শুয়েচে মা? তাকে কখন তুমি তুলে নিয়ে গেছ, আমি ত কিছু জান্‌তেও পারিনি।"

"আমি নিয়ে গেছি! সে কি কথা—" বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা দেবী এক প্রকার ছুটিয়াই ঘরে ঢুকিলেন। জলে, ঝড়ে হারিকেন লণ্ঠনটি কখন নিভিয়া গিয়াছিল। অনুসন্ধান করিয়া দিয়া শলাই বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া মাতা-পুত্রে প্রত্যেক ঘর আতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন। কোথায় গোপাল—? গোপাল ত নাই! শয়নের পূর্ব্বে কালী নিজের হাতে বাহির দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া দিয়া আসিয়াছে, তবে এ দ্বার খুলিল কে? মুক্ত-বদ্ধ কপাট দুইখানা বাতাসের জোরে তাঁহাদের বুকের পাঁজরার উপর হাতুড়ির ঘা দিয়া যেন সশব্দে বুঝাইয়া দিতেছিল, এই পথ দিয়াই সে বাহির হইয়া গিয়াছে রে! সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও গৌরীপতি পাগলের মত ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। প্রবল ঝড় আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি, চোখে-মুখে তীরের ফলার মত আসিয়া বিঁধিতেছিল—বাহিরে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! পাঁচ বছরের ছেলে,—সে কি এই অন্ধকার রাত্রে এই দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতির কোলে একা বাহির হইতে কখনও সাহস করিতে পারে—না, না, এ অসম্ভব! তবু যদি সত্যই সে তা করিয়া থাকে? সারারাত্রি একবার ঘর—একবার বাহির—তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া পরিচিত-অপরিচিত অনেকের বাড়ী খোঁজ লইয়াও গোপালের কোন সন্ধান পাওয়া

গেল না। ভোরের দিকে জল-ঝড় কমিয়া সকালে বৃষ্টি থামিয়া গেল। এক রাত্রের প্রবল ধারাপাতে নদীর জল অনেকখানি বাড়িয়া ছোটখাট বালুচর গুলিকে ডুবাইয়া দিয়াছে। গৌরীপতির মনে পড়িল, গোপাল রাত্রে একবার বলিয়াছিল, "মার যদি ভয় করে বাবা—মা যদি ভাল হয়ে উঠে আমাদের খোঁজেন ?" তখন সে কথার তিনি জবাব দেন নাই অথবা কি-একটা দিয়াছিলেন, এখন আঁর তাহা স্মরণ নাই। কি জানি, মাতৃহীন বালক যদি সেই শ্মশানঘাটে মাকে খুঁজিতেই গিয়া থাকে! সে পথ ত গোপালের অচেনা নয়, তাঁহারই সহিত কতদিন ঐ পথ দিয়া বালক যে নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছে। প্রভাতে সূর্য্যোদয় ও সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের অপরূপ সৌন্দর্য্য মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিয়াছে। যুক্তকরে "স্মরপতিভাগে রক্তিমরাগে—" প্রভৃতি স্তোত্র পাঠে পিতার মনে আনন্দ সিঞ্চন করিয়াছে। তবু এই ঘনঘটাময়ী তামসী নিশীথে সে পথে বাহির হওয়া শিশুর পক্ষে কি সম্ভব ? কে জানে! যদি সে তাই গিয়া থাকে আর অন্ধকারে অসাবধানে পিছল পথে চলিতে গিয়া নদী-গর্ভেই পড়িয়া গিয়া থাকে! গৌরীপতি শিহরিয়া উঠিলেন। সেখান হইতে গৌরীপতিকে তাঁহার অমূল্যনিধির বার্ত্তা কে আনিয়া দিবে! ক্ষুধিতা রাক্ষসী নদী গৌরীপতির প্রাণাধিকার চিতাভস্ম মাখিয়াও বুঝি তৃপ্তি পায় নাই, তাই স্ফীতবক্ষে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে!

পরদিন সন্ধ্যার সময় কালীচরণের সহিত গৌরীপতি যখন শূন্যক্রোড়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, সর্ব্বমঙ্গলা দেবী সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ছাব্বিশ বছরের ছেলের মাথার সব চুলগুলি চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে!

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুড়ান ছেলে

ইন্দ্রনাথ জমিদারের ছেলে। পুরুষানুক্রমেই ইহারা জমিদার। এ বংশে কেহ কখনও পরের চাকরি করে নাই। বাণী-মন্দিরের দ্বারেও কাহারো পদধূলি বড় পড়ে নাই। জমিদারী রক্ষার জন্য যতটুকু বিদ্যার প্রয়োজন, গৃহে মুন্সী রাখিয়া পণ্ডিত রাখিয়া ততটুকু শিক্ষা করাই এ গৃহের চিরন্তন নিয়ম। সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণের সহিত একাসনে বসিয়া সামান্য শিক্ষকের শাসন-তাড়না সহিয়া শিক্ষালাভ করা এ বংশের প্রথাই নয়।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু চিরদিনের নিয়ম উল্টাইয়া ইংরাজী শিক্ষার জেদ ধরিল। সতেরো বৎসর পূর্ব্বে দুই বছরের শিশু পুত্রকে লইয়া কাত্যায়নী দেবী যেদিন এই বৃহৎ সংসারে অনাথা হইয়াছিলেন, সেদিন সেই ক্ষুদ্র-শিশুই তাঁহাকে সংসারের মায়াজালে বদ্ধ করিয়া মৃত্যু-কামনার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহারই মুখ চাহিয়া স্বামী হারাইয়াও আবার তিনি গৃহ-কর্ম্মে মন দিয়াছিলেন। নতুবা কিসের গৃহ, কাহার জন্যই বা সংসার? তারপর কত ঝড়ই না মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে! জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম বুঝিতে অনেক ক্লেশ ও সময় লাগিয়াছিল, তবু সবই তিনি সহিয়াছিলেন সেই বংশধরের মুখ চাহিয়া, তাহারই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। ছেলে যখন জেদ ধরিল, সে ইংরাজী শিখিবে, স্কুলে যাইবে, তখন বিমুখ-চিত্ত সহস্রবার পিছনে ফিরাইলেও তাহার ঈপ্সিত পথে তাহাকে যাইতে দিতে মানা করিতে পারিলেন না। এ বংশের চিরদিনের নিয়ম-ভঙ্গে বিদেশী শিক্ষায় পাছে ছেলের অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে অনেক দেবদেবীর

মানত করিয়া ছেলের মাথায় অপরাধের জরিমানার মূল্য স্পর্শ করাইয়া পূজা তুলিয়া রাখিয়া মনে মনে দেব-দেবীদের উদ্দেশে তিনি বলিয়াছিলেন,—হে মা দুর্গা,—হে বাবা শিব, বাছাকে আমার ভালয় ভালয় ঐ ছায়ের পড়া সাঙ্গ করাইয়া দাও, আমি ভাল করিয়া তোমাদের পূজা দিব—মন্দির-চূড়া সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিব। মায়ের আশীর্ব্বাদে দেব-দেবীদের কৃপায় ও নিজের চেষ্টায় ইন্দ্রনাথ তাহার ঈপ্সিত ফল লাভ করিয়া বিদ্বৎ-সমাজে একদিন বরণীয় হইয়া উঠিল। দেশবিদেশ হইতে অনেক মূল্যবান্ পুস্তক আনাইয়া সে গৃহে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিল এবং সময়ের তৃতীয়াংশ-কাল পরমানন্দে সেইখানেই কাটাইতে আরম্ভ করিল।

মা এইবার বিবাহের জন্য জেদ ধরিয়া বসিলেন। ইন্দ্রনাথ হাসিয়া প্রত্যাখ্যান করিল—এই অধ্যয়নের পরমানন্দেই বাকী জীবনটা সে উৎসর্গ করিবে। সংসারের শোক, রোগ, অভাব-অভিযোগের মধ্যে কোনমতেই সে নিজেকে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম অনেকদিন পর্য্যন্ত অনুনয়, অনুরোধ, মানাভিমান ও অশ্রুবর্ষণের পর মাও হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এত বড় বনিয়াদি বংশ—সেই বংশ-লোপের ভয়ও যখন উহার নাই, তখন তিনিই বা আর করিবেন কি? মনে করিলেন, এ তাঁহারই কৃত কার্য্যের ফল। সন্তান-স্নেহে অন্ধ হইয়া চিরদিনের নীতি-পথ লঙ্ঘন করিয়া ছেলেকে বিদেশী শিক্ষা দিয়া যে মহাপাপ তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ভোগ তাঁহাকেই যে ভুগিতেই হইবে! ইহার সহিত প্রবল অভিমানও জড়িত ছিল। মনে হইল, এ সংসারে আমি তবে কেহই নই, পেটের ছেলে,—সেও পর হইল, এতটুকু দিয়াও সুখী করিল না! মনে করিলেন, বিবাহ হয়ত করিবে, আমি বাঁচিয়া থাকিতেই করিল না! ইহার পর সুগভীর অভিমানে একেবারেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। জ্ঞানানন্দে বিভোর-চিত্ত ইন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মুক্তি পাইয়া একবার সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিল, হইল কি?

মা যে বড় চুপ্‌চাপ্‌! তখনই নিজের অনুকূলে ধরিয়া লইল, মা এইবার তবে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন। যাক্‌ বাঁচা গেল!

সে বৎসর—কংগ্রেসের পর ইন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরিতেছিল। ফিরিবার সময় স্থলপথে না ফিরিয়া জল-পথে ফিরিবার সে সংকল্প করিল। ইহাতে ট্রেনের গোলমাল না থাকায় মনের এবং জল-বিহারে শরীরের—এক ঢিলে এই দুই পাখী মারার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। মা খবর পাইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, তীর্থের পথে যদি যাওয়া ঘটে তবে তিনিও সঙ্গী হইবেন। ইন্দ্রনাথের আপাততঃ তীর্থ ভ্রমণের সাধ ছিল না,—শুধু জল-বিহারে আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই সে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও বাধা পড়িল, জল-পথে শরীরের উপকার না হইয়া অপকারই হইতেছিল। বিরক্তচিত্তে ইন্দ্রনাথ অবিলম্বে বাড়ী ফিরিবার হুকুম দিল।

পূর্ব্বরাত্রে ভয়ঙ্কর ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া সকাল বেলা আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। নিস্তরঙ্গ নদী-জলেও পূর্ব্ব রাত্রের বিশ্ব-গ্রাসিনী ভীমা মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল না। ঝড়ের সময় বজরা তীরে বাঁধিয়া ইন্দ্রনাথ সদলে আশ্রয়ের সন্ধানে তীরে উঠিয়াছিল। কিন্তু নিকটে কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন না দেখিয়া অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া বজরা-বক্ষেই তাহাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অনুপায়ে রাত্রে কাহারও আহার হয় নাই। তাই সকাল বেলা সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ রন্ধনের আয়োজনে ব্যাপৃত, কেহ কাছে কোন বাজার-হাট আছে কিনা তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, কেহ-বা নদী-জলে স্নানাদি করিতেছিল। ইন্দ্রনাথ মুখ-হাত ধুইয়া জলযোগান্তে তীরে-তীরে একটু ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাত্রে অন্ধকারে স্থানটিকে ভাল বুঝিতে পারা যায় নাই। এখন দিনের আলোয় জনহীন স্থানটিকে নির্ব্বাসিতের দ্বীপের মত মনে হইতেছিল। নদী-তীরে বড় বড় গাছ—অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, আরও

নানা জাতীয় বৃক্ষ,—ছোট গাছগুলির অধিকাংশই কোথাও ভগ্ন, কোথাও অর্দ্ধভগ্ন। পুরাতন শিকড় বাহির-করা বড় বড় গাছগুলি কেবল প্রকৃতির বিভীষিকার প্রতি তীব্র উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সমভাবে সতেজে দাঁড়াইয়া আছে। ইন্দ্রনাথ লক্ষ্যহীনভাবে তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কখন শান্ত নদী-বক্ষের পানে চাহিয়া দুর্য্যোগময়ী রজনীর তাণ্ডব নৃত্যের সহিত মানব-চিত্তের ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীলতার তুলনা করিতেছিল। সহসা চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল,—নদী-তীরে একেবারে জলের ধারে ঝুঁকিয়া পড়া একটা বৃহৎ বটগাছের শিকড়ের ফাঁকের ভিতর ও কি পড়িয়া রহিয়াছে? কাছে গিয়া ভালো করিয়া লক্ষ্য করিতেই ইন্দ্রনাথ বুঝিলেন, তাঁহার অনুমান মিথ্যা নয়—একটি ছোট ছেলে। হয় ত গতরাত্রির ঝড়-জলে নৌকাডুবি বা অমনি কোন কারণে জল-মগ্ন হইয়া বালক স্রোতে ভাসিয়া এখানে আসিয়া বৃক্ষ-কোটরে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ছেলেটি বাঁচিয়া আছে কি না বুঝিতে পারা যায় না। শ্বাস-পতনের চিহ্ন ছিল না। সারারাত্রি জলে ডুবিয়া থাকায় হাত-পা-মুখ সমস্তই কুঞ্চিত বিবর্ণ দেখাইতেছিল, তবে বিকৃত হয় নাই। গাছের ফাঁকে ফাঁকে শাখার আড়াল দিয়া যেটুকু রৌদ্রালোক আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছিল, তাহাতে মর্ম্মর মূর্ত্তির মুখে যেন জীবনের রক্ত-আভা জাগাইয়া তুলিয়া ছিল। ইন্দ্রনাথ কাছে বসিয়া ছেলেটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, নিশ্বাস নাই—বক্ষস্পন্দনও থামিয়া গিয়াছে। বুকের উপর কান পাতিয়া অনেকক্ষণ পরে মনে হইল, বুঝি শ্বাস আছে, অতি ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট, তবু হয় ত আছে! চেষ্টা করিলে এখনও হয় ত এই মৃত-দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার করিতে পারা যায়। পুঁথিগত বিদ্যার ইন্দ্রনাথের অভাব ছিল না। ডাক্তারি শাস্ত্রও সে অনুশীলন করিয়াছিল। জলমগ্নকে বাঁচাইবার জন্য যে যে প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাহার সমস্তই সমাধা করা হইল। ছেলেটিকে সাবধানে বজরায় তুলিয়া আনা হইল, এবং দুর

গ্রাম হইতে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসককেও পাওয়া গেল। সমবেত যত্ন ও চেষ্টার ফলে একটু একটু করিয়া ছেলেটির মৃতদেহে যেন জীবন-সঞ্চার হইল। ধীরে ধীরে প্রথম সূর্য্যোদয়ে বিকশিত কমল-কলির মতই সে তাহার পদ্মপলাশ চক্ষু দুটি উন্মীলন করিয়া চারিদিকে বিহ্বলের মত চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সে দৃষ্টিতে জ্ঞানের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া গেল না। সদ্যজাত শিশু-দৃষ্টির ন্যায় তাহা স্বচ্ছ নির্ম্মল ভাবহীন। ইন্দ্রনাথ আশাতীত আনন্দ-লাভে পুলকিত-চিত্তে ছেলেটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার জল-যাত্রা সার্থক হইয়াছে।

এই ছেলেটির জন্যই তাহাদের বাড়ী ফিরিতে আরো কিছু দিন বিলম্ব হইয়া গেল। ছেলেটি অত্যন্ত ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইল। ইন্দ্রনাথ, চিকিৎসক ও অন্য সকলেই বুঝিলেন যে, তাহার পূর্ব্বস্মৃতি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা পুনরায় আয়ত্ত হইবার আর কোন আশা নাই। নূতন করিয়া তাহাকে ভাষা হইতে সকল বিষয়ই শিক্ষা দিতে হইবে। অতীত জীবনের উপর যে কালো যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা উত্তোলন করা এখন আর চেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়। নিজের কথা সে কিছুই জানাইতে পারিল না, নাম, জাতি, গোত্র, দেশ,—এ-সব কথা কে জানাইবে? বালকের দেহে সে যে শিশুর জীবন লাভ করিয়াছে! ইন্দ্রনাথ কাছাকাছির মধ্যে তিনি-চারি-খানি গ্রামে খোঁজ লইলেন, কেহ তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিল না। ছেলের ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় কাত্যায়নী দেবী ব্যাকুল হইয়া তাড়া দিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। আর বিলম্ব করা অনুচিত বুঝিয়া ইন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের জন্য অনুসন্ধানের ভার তুলিয়া রাখিয়া আপাততঃ বাড়ী ফিরিবার দিকে মনঃসংযোগ করিল। ইন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে কাত্যায়নী দেবী দেখিলেন যে একটি বছর পাঁচ-ছয়ের ছেলেকে সে সঙ্গে

লইয়া আসিয়াছে। ছেলেটির বিষয়ে ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই তাঁহাকে পত্রে সংবাদ জানাইয়াছিল, তাই বিস্মিত না হইলেও তিনি মুগ্ধ হইলেন। ছেলেটির কাঁচা সোনার বর্ণ, সুন্দর মুখ, বড় বড় কালো চোখে অর্থহীন দৃষ্টি—প্রচণ্ড বাত্যাপীড়িত পত্র-পুষ্পহীন শ্রীহীন তরুর মত শীর্ণ দেহ সহজেই মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া নিজের দিকে ফিরায়। ছেলেটিকে মার কোলে দিয়া ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "তুমি ছেলে চেয়েছিলে মা, তাই ভগবান্ একে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েচেন—এ আমারি ছেলে।" মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছেলেটিকে কাছে টানিয়া তাহার গাঁয়ে মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আহা, কার বাছা কোল খালি করে এলো রে! আহা, এ ধন হারিয়ে বাপ্ মা যে বুক ফেটে মরে যাবে ইন্দু, কি করে তারা মনকে প্রবোধ দিয়ে জীবন ধারণ করবে, বাবা?" ইন্দ্রনাথ ছেলেটির উদ্বেগহীন শান্ত মুখের পানে চাহিয়া চিন্তিত-মুখে কহিল, "তারাই কি বেঁচে আছে মা, তোমায় তা লিখেছিলুম, আগের রাতে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। হয়ত নৌকাডুবি হয়ে তাঁরা মারাই গেছেন। এও কি বাঁচ্‌ত? তুমি যে বল মা, রাখে কৃষ্ণ মারে কে,—তা খুব সত্যি মা। ভগবান্ নেহাৎ একে বাঁচাবেন বলেই বাঁচিয়েছেন। নৈলে তেমন জায়গায় আমরাই বা বজরা বাঁধ্‌তে গেলুম কেন? সহর নয়, গাঁ নয়, কিছু না, একেবারে একটা পতিত জমি। ইচ্ছে করে সেখানে কেউ কখনো নামে না। নেহাৎ ওর আয়ু আছে বলেই না। ডাক্তাররা বল্‌ছেন ক্রমে ক্রমে আবার ওর জ্ঞান-বুদ্ধি ফিরে আস্‌তে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব-স্মৃতি হয়ত কখনও ফির্‌বে না।"

কাত্যায়নী দেবী সনিশ্বাসে বলিলেন, "কি জাতের ছেলে, তাও ত বোঝা গেল না।" ইন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল, "বল্লেম ত মা, আমার ছেলে, তবে আর কি জাত হবে! ওর গলায় একটি রক্ষা-কবচ না কি ছিল সেটি খুলিয়ে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে কি শর্ম্মা—এইটুকু

পড়্‌তে পারা গেছ্‌ল। ভূর্জ্জপত্রটুকু অনাবশ্যক ভেবে এমন করে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল যে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে। মাথাতেও ছোট একটি শিখা ছিল—আমার ছেলে যে! বামুন না হয়ে যায় কি!"

উচিত-বোধে ইন্দ্রনাথ কিছুদিন সংবাদ-পত্রে ছেলেটির সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিল। দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া ক্রমে বৎসর ঘুরিয়া গেল, কেহই সংবাদ লইতে আসিল না। ক্রমে এ চিন্তা ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নীর মন হইতে একেবারেই দূরে চলিয়া গেল, বরং ইদানীং মনে করিতে ভয় হইত, পাছে কেহ সহসা কোনদিন আসিয়া তাহাকে দাবী করিয়া বসে! অরুণকে ছাড়িয়া তাঁহারা বাস করিবেন কেমন করিয়া। সে যে কাত্যায়নী দেবীর অন্তরের কতখানি অংশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া তিনি সময়-সময় আশঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ভরত রাজার মৃগশাবক-প্রীতির ন্যায় তাঁহারও শেষ-জীবনে এ কি দুশ্ছেদ্য মায়া-জালের বেষ্টন লাগিল! তবু এ জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি পাইতেও ইচ্ছা হয় না। ইহাকে স্নেহ করিয়া ভালবাসিয়া, ইহার আবদার-বায়না শুনিয়া যে তাঁহার বন্ধন-প্রার্থী হৃদয় তৃপ্ত হইতেছিল। ছেলে সংসারী হইল না, এ দুঃখ অহরহ কণ্টক-ক্ষতের ন্যায় মনের ভিতর জ্বলিতে থাকিলেও মুখে কখন আর সে কথা প্রকাশ করিতেন না। সে যখন ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে দুঃখ দিতে বদ্ধ-পরিকর, সাধ্যসত্বেও সে যে তাঁহার সংসারের কোন সাধ মিটাইতে দিল না, এ দুঃখ কি আর ভুলিবার! মনে পড়িল, একদিন অত্যন্ত জেদাজেদি করায় ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল, সাধ করিয়া কেন কষ্ট ডাকিয়া আনিতে চাও মা, আমরা মায়ে-ছেলেয় বেশ ত আছি। পরের মেয়ে সে কি তোমায় বুঝিবে, না তোমার উচিত মান্য-শ্রদ্ধা দিতে পারিবে! গভীর অভিমানে সেদিন কাত্যায়নী দেবী নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হইয়াছিল, ছেলে তবে তাঁহাকে এইরূপই বুঝিয়াছে। হায়রে, তিনি

কি তাঁর সাতরাজার ধন সাগর-সেঁচা মাণিক ইন্দুর বৌয়ের মান্য-ভক্তিরই কাঙ্গাল! নাই বা করিল সে তাঁহার সম্মান! তবু ত সে তাঁহারই বুকের ধন, ইন্দুর বৌ! তাঁহার পতিকুলের, ভবিষ্যৎ বংশ-রক্ষকের জননী হইবে; অভিমানের অশ্রু অঞ্চলে মুছিয়া কাত্যায়নী দেবী মনে মনে উদ্দেশে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "মার সাধ, ইন্দু তুই বিয়ে করে ছেলের বাপ্ হোস্, নৈলে কেমন করে বুঝ্‌বি, ছেলে কি জিনিস!" সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, হয়ত সে প্রার্থিত দিনও আসিবে, কেবল দুর্ভাগিনী, তিনিই তাহা দেখিয়া যাইতে পারিবেন না।

অরুণকে পাইয়া কাত্যায়নী দেবীর মনের ক্ষোভ দুধের অভাবে ঘোলেই অনেকটা মিটিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে অরুণ তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিত। কিন্তু বিনা উপদেশেই সে কাত্যায়নীকে মা বলিতে সুরু করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের কড়া হুকুমে কেহ কখনও তাহার অতীত জীবন সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে পাইত না। জমিদার-পুত্রের মতই তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল; দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই মনে করিল, ইন্দ্রনাথ নিশ্চয় ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র লইবে। অরুণকে পাইয়া কাত্যায়নী দেবী ছেলের দিক হইতে অনেকখানি মন সরাইয়া লওয়ায় ইন্দ্রনাথও খুসী হইয়াছিল। মাও কাজ পাইলেন, তাঁহার সংসার করা, ছেলে মানুষ করার সাধ মিটিবার একটুও যে অবসর মিলিল, এ ভালই হইল। ইন্দ্রনাথও এইবার নিশ্চিন্তভাবে নিজের ইচ্ছামত পড়াশোনা লইয়া থাকিতে পারিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাগ্য-পরিবর্ত্তন

মানুষের ইচ্ছা ও তাহার নিয়তি কখনো সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে না।

কিছুদিন হইতে ইন্দ্রনাথের অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। বিকালের দিকে চোখ জ্বালা করে, মাথা টিপ্ টিপ্ করে, আবার সন্ধ্যার পর বা রাত্রে সে ভাবটা কাটিয়া যায়। স্বভাব-শিথিল ইন্দ্রনাথ বুঝিতেছিল,—এ ভাবটা ভাল নয়! অল্প একটু কাশিও সময় সময় দেখা যায়—তবু ঔদাসীন্য বশতঃ এ-সব সে গ্রাহ্য করিল না। মা তাহার এই অক্ষুধা, কার্য্যে আলস্য ও শারীরিক শীর্ণতা স্পষ্ট বুঝিতেছিলেন। বলিলে ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিত, "মার কেবল ভয়! তুমি যে কেবল ছায়ার পেছনে ছুটতে চাও" বলিয়া মাকে সে থামাইয়া দিত। সে নিয়মিত স্নানাহার করিত; সারাদিন প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা চলিত, পড়া আর লেখা, লেখা আর পড়া—ইহারই কেবল সময়াভাব ছিল না—আলস্যও ছিল না—বরং শরীর যত খারাপ হইতেছিল, গ্রন্থ-রচনার উৎসাহ সেই পরিমাণে বাড়িয়াই চলিতেছিল। কাত্যায়নী জোর করিয়া ডাক্তার আনাইলেন—ডাক্তার বিধিমত পরীক্ষান্তে যে রিপোর্ট দিলেন, তাহা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের চেয়েও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। ডাক্তার বলিলেন,—রোগ কঠিন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর দূত একেবারে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাত্যায়নী বা ইন্দ্রনাথ কাহাকেও রোগের বিস্তারিত বিবরণ জানানো হইল না; যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সহজ করিয়া বলা হইল। তবু

ডাক্তারিতে অভিজ্ঞ ইন্দ্রনাথ চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ঔষধাদি দেখিয়া অনেকখানি অনুমান করিয়া লইয়া নায়েবকে ডাকিয়া উইল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। খবর শুনিয়া কাত্যায়নী মাথা কুটিয়া মাথা ফুলাইয়া ফেলিলেন। দেব-মন্দিরে নিত্য-পূজার বরাদ্দ বাড়াইয়া দিলেন, নায়েবকে ডাকাইয়া জানাইলেন, উইল-টুইল করা হইবে না। যাহাদের বয়সের গাছ-পাথর থাকে না, গঙ্গা-পানে পা বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারাই শুধু উইল করে— তাঁহার সোনার চাঁদ অন্ধের যষ্টি ইন্দুর কি এখন উইল করিবার বয়স! এই সব অনাচার ঘটিতে দিলে তাঁহার সাগরসেঁচা মাণিকের অকল্যাণ ঘটিবে। দেওয়ান ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—দু'দিন না হয় দেরীই হইবে, করা যাইবে কি—! গৃহ-কর্ত্রীর আদেশ ত অমান্য করা যায় না? তাড়াতাড়িই বা কি এমন!

কিন্তু তাড়াতাড়ি তাঁহাদের না থাকিলেও অন্যত্র যে ছিল, তাহা শীঘ্রই স্পষ্ট বুঝা গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে করিতে ইন্দ্রনাথ কহিল, "মা, আমি তোমার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ সন্তান,— কেবল তোমায় দুঃখ দিয়েই গেলেম, সুখী কর্‌তে পার্‌লেম না।"

কাত্যায়নী উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া অর্দ্ধাবরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "ইন্দু, বাবা আমার, তোমায় পেয়ে আমি যে কি অমূল্য নিধিই পেয়েছি, সে কেবল আমিই জানি, বাবা। তুই যে আমার নারায়ণেরো উপরে রে—তাঁকেও যে আমি প্রাণ ভরে কখনো ডাক্‌তে পারি নে। তোর ভাবনাই আমার সবার উপর।"

ছেলের রোগশীর্ণ হাতখানি কাত্যায়নী বুকে চাপিয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথের মুদিত চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "বড় ভুল করে ছিলে, মা, কাঁচের পুতুল পেয়ে বুকের ঠাকুরকে মাটীতে বসিয়ে ছিলে, তাই ঠাকুর আমার ভালর জন্যেই সে ভুল সুধ্‌রে দিলেন—

আবার শীঘ্রই আমরা একত্র হ'ব, মা—কিন্তু ঐ অনাথ—" কাত্যায়নী দাঁত দিয়া জোর করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া কষ্টে কান্না চাপিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "তুই ভাল হয়ে ওঠ্ ইন্দু, আমি কাশী গিয়েই থাক্‌ব। বিশ্বনাথের চরণে আমার সব লোভ সঁপে দেব বাবা,—সংসারের মায়া আর কোনদিনও কর্‌ব না।"

"না, না, কাশী যাওয়া তোমার আর হবে না, তুমি বল, আমি চলে গেলেও—ওকে, ঐ অভাগা ছেলেটাকে তুমি ফেল্‌বে না,—ওকে তুমি মানুষ করে তুল্‌বে,—বল? ওর জন্যে যা ভেবে রেখেছিলুম, তা'র কিছুই করে যেতে পার্‌লুম না। তবু তা'র জন্যে আমার সব—"

বাকী কথা আর বলা হইল না। একটা আকস্মিক বেদনায় কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্রনাথ অভিভূত বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়া রহিল। তা'রপর কতক জ্ঞানে কতক অজ্ঞানে আরও দুইটা দিন ও একটা রাত্রি কাটিয়া গিয়া দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় পরম শান্ত-মুখে শান্তভাবে ইন্দ্রনাথের আত্মা অনন্ত শান্তিতে মিলাইয়া গেল। ইন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত মনের ইচ্ছা—অরুণের ভাগ্য-নির্ণয় অমীমাংসিতই রহিয়া গেল। এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা স্মরণ করাইয়া দিল না, ইন্দ্রনাথেরও স্মরণ হইল না।

ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দেশের লোক হায়-হায় করিয়া অনেকে বলিল,—এমন জমিদার আর হইবে না। পরের জন্য ভাবিতে, দীন-দুঃখীকে দয়া করিতে, সুখে দুঃখে সহানুভূতিতে সকলের সহিত সম-চিন্ততায় দেশের জন্য দশের জন্য ভাবিবার লোক এমনটি আর জন্মাইবে না। প্রজারা তাঁর সত্য সত্যই সন্তান ছিল, আজ তাহারা পিতৃ-হীন হইল। সংসারে এইটুকুই বিচিত্র—যে দশের জন্য ভাবিত, সে কেবল নিজের জন্য ভাবে নাই!

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিয়া গেলে বিস্ময়ের সহিত লোকে শুনিল, জমিদার দানপত্র বা উইল কিছুই করিয়া যান নাই। তাঁহার চরম ইচ্ছা মনে মনে

সকলে জানিলেও মুখের কথা কিছুই কেহ পায় নাই। ইন্দ্রনাথের দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা আলোকনাথ তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী। উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই এখন বিষয়ের মালিক। পুত্রের ঐকান্তিক ইচ্ছা কাত্যায়নীর জানা ছিল, তবু আলোকনাথের দলের কাছে ও তাহার আনীত উকিলের সাক্ষাতেও তাঁহাকে অন্যের অনুরোধে একথা স্বীকার করিতে হইল যে সমস্ত বিষয় অরুণকে দিতে হইবে এমন কোন আদেশ মুখে বলিবার অবসর ইন্দ্রনাথ পায় নাই। শ্বশুরকুলের বংশকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া অজ্ঞাত-কুলশীল একটা পথের ছেলেকে সমস্ত সম্পত্তির মালিক করা কাত্যায়নীর ধর্ম্মজ্ঞানেও বাধিতে ছিল। তবু ইন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছা তিনি ভাল রকমই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এখন যে-কথার লিখিত মূল্য নাই, সাক্ষীসাবুদ নাই, সে কথা কেই বা কানে তুলিবে? আর তুলিবেই বা কেন? যে বংশের তিলক, যাহার হাতে জল-পিণ্ড মিলিল এবং ভবিষ্যতে মিলিবার আশাও রহিল, তাহাকে বাদ দিয়া অচেনা অজানা পথে-কুড়ানো—কে জানে হয়ত যাহার জন্ম রহস্য অনাবিষ্কৃত থাকাই তাহার পক্ষে মঙ্গলের হেতু,—তাহাকেই কি না করিতে হইবে এত-বড় সম্পত্তির মালিক! এ যেন ঘুঁটে-কুড়ানীর পুত্রকে রাজহস্তীতে শুঁড়ে তুলিয়া রাজপাটে বসাইয়া দেওয়ার মতই। ইংরাজী-শিক্ষিত সাহেবী চাল-প্রাপ্ত বংশগৌরব-বিস্মৃত ইন্দ্রনাথ যাহা করিতে পারিত—ন্যায়-বিচারক ভগবান্‌ ত তাহা পারেন নাই, তাই মরণকালে জমিদারের মাথায় শুভ বুদ্ধি দিয়া তিনি মহা পাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, আলোকনাথকেও বাঁচাইয়া দিয়াছেন! নহিলে নিরপরাধ সে বেচারা ত একেবারেই ডুবিয়াছিল। ফলে এতবড় রাজসংসারে অরুণের মাথা গুঁজিবার মত এতটুকুও স্থান রহিল না। জমিদারের পালকপুত্র একদিন যে পোষ্যপুত্ররূপে বিষয়াধি-কারী হইবে বলিয়া শত্রু-মিত্র কাহারো মনে সংশয় ছিল না,—আজ তাহার

সম্বন্ধে ব্যবস্থার এই অভাব দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে মনে করিল, "এ হইল কি?" কেহ আন্তরিক কেহ বা মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া অরুণকে জানাইলেন যে তাহার এই অপূর্ব্ব ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহারা সকলেই দুঃখিত। ইহার পর তাহাকে ভাগ্যপরীক্ষার চরম অবসর দিয়া ইন্দ্রনাথের মৃত্যুর দ্বাদশ দিবসে কাত্যায়নী দেবীরও সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়া অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কাত্যায়নী দেবীর বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এ ক'দিন অর্দ্ধ-অচৈতন্যের ন্যায় অভিভূতভাবেই তিনি পড়িয়াছিলেন। বাহিরে কে কি বলিতেছে, কোন কথাই তাঁহার কাণে প্রবেশ করিতেছিল না। দেওয়ান অনেক বার তাঁহাকে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি তাহা শুনিয়াছেন মাত্র, চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। কেবল মধ্যে মধ্যে যখন ক্রন্দনস্ফীত চক্ষে ম্লান-মুখে অরুণ আসিয়া নীরবে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া কাছে বসিতেছিল, তখনই তাঁহার মনে পড়িতেছিল, সংসারের সহিত সব সম্বন্ধ এখনও তাঁহার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই, কিছু বাকী আছে। ইন্দ্রনাথের নয়ন-মণি এই অনাথটার জন্য আবার একবার তাঁহাকে এত বড় আঘাতের পরও খাড়া হইয়া উঠিতে হইবে। আবার বিষয়-সম্পত্তির কথা শুনিতে হইবে, বলিতে হইবে। হয়ত আদালত পর্য্যন্ত মামলা লড়িতে হইবে। আর একদিন এমনি এক দারুণ শোকের ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াও তাঁহাকে গা ঝাড়িয়া উঠিতে হইয়াছিল। তবু সেদিন বয়সের অল্পতায় ভবিষ্যতের আশায় অবসাদ-গ্রস্ত চিত্তেও নব বলের অবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এখন এ জরাগ্রস্ত বাহুতে সে বল তো আর নাই! ইন্দু যে সেখানাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া গিয়াছে! এ সব চিন্তার সমাধান আর তাঁহাকে করিতে হইল না, ভগবান্ সকল চিন্তার অবসান করিয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা

উপকথায় শুনা যায়, যাদুকরের মায়াযষ্টি-স্পর্শে রাজপ্রাসাদ অকস্মাৎ এক বিশাল অরণ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছিল! অরুণের ভাগ্যও তেমনি অপূর্ব্ব উদাহরণ দেখাইল। ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নীর মৃত্যুতে যে শোকের ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহা শুধু তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিল না, সে ঝড় তাহাকে উড়াইয়া ধূলি-মলিন অনাবৃত পথের প্রান্তে ফেলিয়া দিয়া গেল। গভীর নিশীথে স্বজন-বেষ্টিত নিশ্চিন্ত সুখ-শয্যায় নিদ্রিত লোক যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখে, অগ্নিতপ্ত বালুকাময় মরু-প্রদেশে কেবল একা সে পড়িয়া আছে, তখন নিজের অবস্থা প্রথমটা তাহার স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হয়। অরুণের মনে হইল, সে বুঝি চোখ চাহিয়া তেমনি স্বপ্ন দেখিতেছে! সে শুনিল—ইন্দ্রনাথের মরণে সে পিতৃহীন হয় নাই। শুধু আশ্রিত—আশ্রয়দাতাকে হারাইল মাত্র—সে তাঁহার সন্তান নয়, রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয় নয়,—সে অজ্ঞাত-পরিচয় অনাথ। আলোকনাথের দলের কাছে সে জানিল, ইন্দ্রনাথ তাহাকে স্বগোত্রে উন্নীত করিয়া লইলেও লোকে তাহা স্বীকার করিয়া লইবে না। দেশের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক হইয়া তিনিই যদি সমাজের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার চালাইতে চান, তবে অপরেই বা সুবিধা-স্থলে এ দৃষ্টান্ত না লইবে কেন? বিচারকের আসনে বসিয়া দেশের জমিদার যদি অবিচার করেন, ধর্ম্ম ও সমাজ রাখিবে কে? ঝড় সহিবার শক্তি আছে বলিয়াই না ভগবান্ বড় গাছের আশ্রয় সৃষ্টি করিয়াছেন?

স্নেহের অনুরোধে এত-বড় অন্যায়কে ত প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। কোথাকার কুড়ানো ছেলে,—যাহার জাতি পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই, তাহারই সহিত একত্র পান-ভোজন শোয়া-বসা কেমন করিয়াই বা চলিতে পারে! না পারিলেও ছেলেটা আবার অভ্যাস-দোষে দুঃখ পাইবে। অতএব উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য উহাকে দূরে রাখিয়া দেওয়াই আলোকনাথের সদ্যুক্তি মনে হইল। অবশ্য অরুণের জন্য ব্যয় যাহা হইবে, তিনি তাহা বহন করিবেন। সত্যই ত আর তিনি অনাথকে ফেলিতে পারেন না? এখন ইচ্ছা করিলে দিন কিনিয়া লওয়া না লওয়া তাহার হাত! ছুতারের কাজ শিখিতে পারে—কাঁশা-পিতল ঢালাইয়ের কাজ শিখিতে পারে—আরো কত কি কাজ আছে। কাজের জন্য আবার ভাবনা! বাবুর বদান্যতায় মোসাহেব পদ-প্রার্থীর দল ধন্য ধন্য করিয়া কেহ বলিল,—বাবু আমাদের দয়াময়, নহিলে শত্রুকেও এত দয়া। শত্রু নহে ত কি আর—একটু হইলেই ত সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া বসিতেছিল। কেহ বলিল, বাবু আমাদের স্বয়ং বৃহস্পতি,—কেমন বুদ্ধি বাহির করিলেন, দেখ না—জাতি বাঁচিল—উহার মনে দুঃখও দিতে হইল না! সাপ মরিল, লাঠিও ভাঙ্গিল না—এই আর কি!

নিরপেক্ষ দলের কেহ কিন্তু বাহবা দিল না। তাহারা যে জানিত কি আশায় ইন্দ্রনাথ এই ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিল! অরুণের প্রতি স্নেহ-শীল লোকের যে অভাব নাই, বুদ্ধিমান আলোকনাথ তাহা বুঝিয়াছিল। সেই জন্যই তাহাকে সে দূরে রাখিতে চাহিতে ছিল। এ সংসারে স্বার্থপর কুটিলমতি কুপরামর্শ-দাতার ত অভাব নাই। কে কখন কুপরামর্শ দিয়া বিপদ্ বাধায় বলা ত যায় না কিছুই। বিশেষ ছেলেটাও আবার ইংরাজী নবীশ। এ-সব লোককে কিছু বিশ্বাস নাই! ইহারা সবই করিতে পারে। তবু সে সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্যই অরুণের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিল। নহিলে উহার জন্য এক পয়সা খরচ করিতেও তাহার

আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। পুত্রশোকে হতবুদ্ধি কাত্যায়নী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু না ঘটিলে কে জানে, স্রোতের গতি এতক্ষণ কোন পথে বহিত!

এ-সব কথা অরুণের কানেও আসিয়া পৌঁছিত। সে ইহার উত্তর দিত না, ইহাতে ব্যথাও অনুভব করিত না। যে অসীম দুঃখে তাহার তরুণ হৃদয় পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেখানে সংসারের এ-সব তুচ্ছ লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখিবার জায়গাই ছিল না। সে যে ইন্দ্রনাথের পুত্র নয়, এ দুঃখের কাছে সব দুঃখই তাহার খাটো হইয়া গিয়াছিল। যে যজ্ঞ-সূত্র অমল শুভ্র সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের ন্যায় এখনও তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া দুলিতেছে, এখনও দুইবেলা সে যে গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করে, ইহাতে যথার্থ অধিকার তাহার আছে কিনা এমন সংশয়ও উঠিয়াছে! তাহার সম্মান লইয়াও কেহ কেহ কানাকানি করিতেছে! সে এ-সংসারের কেহ নয়! জমিদার ইন্দ্রনাথের পুত্র নয়, ময়ূর-পুচ্ছধারী কাকের মত এতদিন কেবল পরের ঐশ্বর্য্যের তলে নিজেকে সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এইবার তাহার বাহিরের খোলসখানা খুলিয়া গিয়া সত্যকার রূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে! সে একটা অনাথ ছেলে—পথের ভিখারী! কে জানে, কোথায় কোন্ পর্ণকুটিরে তাহার অজানিত পিতা হয়ত এখনও তাহাকে স্মরণ করিয়া দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিতেছেন! তাঁহাদের মনের মধ্যে আজও সে বাঁচিয়া আছে। অথবা অসীম জলরাশির তলে তাঁহাদের অনন্ত শয্যা সেই কাল রজনীতেই বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে! হায়, কে তাহাকে জানাইয়া দিবে—সে কে—কোথা হইতে ঝড়ে উড়িয়া আসিয়া এই স্নেহের খাঁচায় বন্দী ছিল! ভাগ্যবিপর্য্যয় অনেকের হয়—সুখ-দুঃখ-ভোগও জীব-মাত্রের কর্ম্মাধীন। অরুণ এ-সব তত্ত্ব-কথা বুঝিত না, কেবল বুঝিত, এমন করিয়া তাহার ন্যায় জাতি-গোত্র হারাইয়া কেহ সর্ব্বহারা হয় কি না।

তাহার প্রতি স্নেহ-শীল কর্ম্মচারীর দল অনেকে তাহাকে পরামর্শ দিল,

"খোকাবাবু মকদ্দমা করুন—বিষয় ফিরে পাবেন। এ রাজার রাজ্যিপাট ছেড়ে কেন মিথ্যে রামচন্দ্রের মত বনে যাবেন! বাবুর ইচ্ছে ত আমরা সব জানতুম। আমরা সাক্ষী দেব—সময় পেলেন না বৈ ত নয়—নইলে মাঠাকরুণকে যা বলেছিলেন, তা আমরা স্বকর্ণে শুনেচি। বলে, যার ধন তার ধন নয়—এ যে দেখি তাই হচ্চে—অনুমতি দিন, আমরা ত আছি।"

দাঁতে জিভ কাটিয়া অরুণ অসম্মতি জানাইল। "ছিঃ, মকদ্দমা কা'র সঙ্গে করতে বলেন? ওঁর যে ন্যায্য পাওনা! ধর্ম্মতঃ যদি আমার কোন দাবী থাকত, তা'হলে বাবাও তা করতেন—মাও সময় পেতেন। যেখানে জজকোর্ট হাইকোর্ট প্রিভিকাউন্সিলে ধাপে-ধাপে বিচার, সেখানকার আদালতে বিচার-বিভ্রাট অনেক হয়, কিন্তু যেখানে এক-ছাড়া উপায় নেই, সেখানকার বিচারক ভুল করেন না।"

যুক্তি বলিত, ঠিক হইয়াছে। মনকে ধমক দিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া সে বলিতে চায়, মিথ্যার আবরণ ফেলিয়া সত্যকার মানুষ হইয়া তুমি যে দাঁড়াইবার অবসর পাইলে, এ তোমার পক্ষে ভালই হইল। তবু ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাটলে জন্মিয়া যে-সব আগাছা ভিত্তি-মূল পর্য্যন্ত শিকড় গজাইয়া তোলে, তাহাদেরই মত মনের অতি-নিভৃত অংশে গোপনে বসিয়া নৈরাশ্য বলিত, বুঝি, এতটা না হইলেও চলিতে পারিত। ঐশ্বর্য্য! ছাই ঐশ্বর্য্য—সে আজ অর্থের জন্য তো কাতর নয়! তাহার কাতরতা জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত যাঁহাকে সে অস্থি-মজ্জায় মিশাইয়া পিতা বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, যাঁহার অভেদ্য স্নেহ-দুর্গের অভ্যন্তরে বসিয়া এত-বড় বিপ্লবের সংবাদও তাহার কর্ণগোচর হয় নাই! যে সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী স্নেহময়ীর মাতৃস্নেহের অক্ষয় বর্ম্মে আবৃত হইয়া তাহার শৈশব-জীবন অতিবাহিত হইল, তাঁহারা তাহার কেহই নহেন! আর একমাস পূর্ব্বে সে যাহার নামও শোনে নাই, সেই আলোকনাথই তাঁহাদের আত্মীয়তম! এই গৃহ, এই

গৃহের প্রত্যেক ইট-কাটখানি পর্য্যন্ত—যাহারা তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সহস্র সুখ-দুঃখের সহিত জড়িত—সেই এই গৃহের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই! সুসজ্জিত গ্রন্থশালায় ঝকৃঝকে বাঁধানো বইগুলির মধ্যে বেশী বইয়ে তাহারই নাম সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত। ঘরে-বাহিরে তাহারই নানা বয়সের নানা বেশের সজ্জিত আলোক-চিত্র ও তৈল-চিত্রের সমাবেশ। পাঠাগারে তাহারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য মূল্যবান্ কক্ষ-সজ্জা। এ গৃহের প্রত্যেক জিনিষটি এত দিন সে সম্পূর্ণরূপে নিজের বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছে। কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে এ-সব দু'দিনের খেলা। অভিনেতা সাজিয়া সে যেন এতদিন অভিনয় করিতেছিল, সাজ-সজ্জা খুলিয়া রং-রাংতা মুছিয়া ভাল-মানুষটির মত এইবার তাহার বাড়ী ফিরিবার পালা। কেবল জ্ঞান ও অজ্ঞানের ব্যবধান। চিরদিনের সুখ-দুঃখ আশা-স্মৃতি-মণ্ডিত স্নেহভবন—আজ আর তোমার কোলে অরুণের জন্য এতটুকুও স্থান নাই। কোথাকার নগণ্য বিদেশী বালক—আজ আর এ গৃহের, এ সংসারের এখানকার সমাজের কেহ নয় সে! বিদায়, হে আমার চির-প্রিয়তম স্নেহময় আশ্রয়-নীড়, আমার করুণাময় আশ্রয়-দাতার স্বর্ণ-মন্দির, তোমার কাছে অনাথ বালক আজ চির-বিদায় মাগিতেছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নূতন নীড়

গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে ছোট একখানি পল্লী ! দৃশ্য হিসাবে পল্লীখানির কোন মনোহারিত্ব ছিল না। সেইখানে আলোকনাথের ইচ্ছানুসারে তাঁহারই আত্মীয়-সম্পর্কীয়া এক প্রৌঢ়ার গৃহে অরুণের থাকিবার স্থান হইল। তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হয়—কিন্তু উপায় কি ? একগুঁয়ে অবাধ্য অরুণ যখন নিজের মঙ্গল বুঝিবে না, তখন জোর করিয়া সদুপদেশ গিলাইয়া আলোকনাথ কেমন করিয়াই বা তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন গঠনের উপায় করিয়া দিবেন ? ইংরাজী বিদ্যার শোকে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। ছেঁড়া কাঁথায় বসিয়াও অনেকে রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন দেখে যে ! পাশ করিলে জজিয়তীই বা মিলিয়া যায় ! ওরে অবোধ, যদি তাই হইবে, তবে বঁড়শীর বিদ্ধ মৎস্য অগাধ জলে পলাইবে কেন ? একটা চলিত কথা আছে—'জিস্‌কো না দেয় খোদাতালা, উস্‌কো দেনে না শকে আস্‌ফউদ্দৌলা'। খোদাতালা না দিলে দান-বীর আস্‌ফউদ্দৌলাও কাহাকেও কিছু দিতে পারেন না।

ভগবান্ না দিলে মানুষের সাধ্য কি, কেহ কাহাকে কিছু দিতে পারে ! এই যে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণই ত এই আলোকনাথ ! মানুষে ঠকাইতে চাহিলে হইবে কি ? দেনেওয়ালা যে তাহার ভাগ্যফলকে সতন্ত্র লিপি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন !

আলোকনাথকে আমরা দোষ দিতে পারি না। সে মানুষ—মানুষের

লোভ, মোহ, ভয়, অবিশ্বাস—সবই তাহার চিত্তে বিদ্যমান। নিজের স্বার্থ কে না চায়? আর স্বার্থের পথের প্রধান অন্তরায়কে কে-ই বা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে পারে? আমরা সত্য কথা বলিব। অরুণের চোখের জলে সত্যই তাহার মন ভিজিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে সে যে তাহার স্বার্থের পথে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, নিজের ও হিতৈষীবর্গের এ ধারণা সত্ত্বেও সে তাহাতে কোন বাধা দিল না। কাছে রাখিতে সাহস না করিলেও গ্রামান্তরে তাহারই জানিত লোকের আশ্রয়ে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষা-লাভের সুযোগ করিয়া দিল—ইহার অধিক চিরশত্রু প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য কে আর বেশী কি করিতে পারে? অপরিচিত দেশে, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদের সংস্রবে, অজ্ঞাত জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহে প্রথম প্রথম অরুণের খুবই কষ্ট হইয়াছিল। অপরিমিত ভোগ-সুখ-পালিতের পক্ষে দরিদ্র গৃহের সহস্র অভাব ও অসুবিধা প্রতি পদক্ষেপে বাধা জন্মাইতে ছিল। সহিষ্ণু শান্তচিত্ত বালক তাহার এতটুকু আভাষ বাহিরে প্রকাশ করিত না। অদৃষ্ট অদৃষ্টকে সে যখন মানিয়াই লইয়াছে, তখন ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট পথে কণ্টক-গুল্ম, খানা-ডোবা দেখিয়া মুখ ফিরাইলে চলিবেই বা কেন? পথের শেষে যদি পৌঁছিতেই হয় ত বীরের ন্যায় উঁচু মাথায় সরল গতিতে পৌঁছানো চাই! পায়ে-পায়ে বাধিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে হুঁচট্ খাওয়ায়—যাত্রার সার্থকতা কোথায়?

তবু এই নূতন আশ্রয়ে তাহার একান্ত অভাব অনুভূত হইত,—সঙ্গীহীনতায়। সংসারের অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ যতই থাকুক্, উপস্থিত মনের অবস্থায় সে সকলের দুঃখ সে তখন তেমন করিয়া আর অনুভব করিতে পারিতেছিল না। কেবল সময় সময় নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হইত।

বাড়ীর কর্ত্রী মুক্তা ঠাকুরাণী অত্যন্ত রাশভারি মানুষ। কাজের কথা ছাড়া তিনি কখনো বাজে কথা একটিও কহিতে ভাল বাসিতেন না। তা'

ছাড়া ইঁহার সহিত কি কথাই বা সে কহিবে? তাহার মনের অভাব মিটাইবার শক্তি কি ইঁহার আছে? বাড়ীতে একটি ঠিকা ঝী দুইবেলা বাসন মাজিয়া উঠানে-দালানে গোবর-মাটী লেপিয়া বাজার করিয়া দিয়া যাইত এবং রাত্রে মুক্তা ঠাকুরাণীর কাছে আসিয়া সে শয়ন করিত। বাড়ীতে তাহার ছেলে আছে। বৌটি ছেলেমানুষ—ঘর-কন্না দেখিতে হয়, তাই বাকী সময়টুকু সে নিজের বাড়ীতেই থাকিত। অরুণ আসিলে তাহার রাতের চৌকি দেওয়ার কাজে ছুটী মিলিল। অল্প-বয়সী হউক, তবু পুরুষ মানুষ একজন বাড়ীতে রহিল ত, আর কি-ই বা এমন সোনা-দানা শাল-দোশালা তাঁহার আছে,—যাহার জন্য এত ভয়?

মুক্তা ঠাকুরাণীকে গ্রামের লোকে সম্মান করিত। তাঁহার গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ মুখে এমন একটি তেজস্বিতার ভাব ছিল, যাহাতে ছেলে-বুড়া সকলকে তিনি অনায়াসে বাধ্য করিতে পারিতেন। মনে যত বড় অনিচ্ছাই থাক্, মুখ ফুটিয়া তাঁহার কাজে বা কথায় কেহ কখনো প্রতিবাদ করিতে পারিত না। পাড়ার বধূ-কন্যারা দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিলে সসঙ্কোচে বেচাল সংশোধন করিয়া লইত। সম্বোধনসূচক পদবী-যোগে কেহ জ্যেঠাই-মা, কেহ খুড়ী, কেহ মাসী, কেহ দিদি প্রভৃতি পাতানো সম্পর্ক ধরিয়া "ঐ লো ঐ—আস্‌চেন" বলিয়া চোখে চোখে সতর্কতার টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বিশেষভাবে সকলে নিজ নিজ কার্য্যে মনোযোগী হইত। না জানি, মুক্তা ঠাকুরাণী এখনি আবার কাহার কি ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া দুই কথা শুনাইয়া দিয়া যাইবেন! কিছুই ত বলা যায় না। লেখা-পড়া হিসাব-বোধ বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসায় পাড়ার মধ্যে 'মুক্ত বাম্‌নির' নাম বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শোনা যায়, মামলা-মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত ব্যাপারেও পাড়ার প্রাচীনেরা নাকি তাঁহার পরামর্শ লইয়া থাকেন। পাড়ার দলাদলি ব্যাপারেও তাঁহাকে না বলিয়া কাহারো কোনরূপ রফা করিবার সামর্থ্য ছিল না।

মুক্তা ঠাকুরাণী এই গ্রামেরই মেয়ে। অন্য সন্তান-সন্ততি কিছু না থাকায় বাপ গৃহ-জামাতা করিয়া তাঁহার স্বামীকে ঘরেই রাখিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, এই উপায়ে ছেলে-মেয়ের সব সাধই মিটাইয়া লইবেন,—বাল-কণ্ঠের কল-কাকলীতে তাঁহার গৃহপূর্ণ হইবে। কিন্তু মানুষের আশা প্রায়ই পূর্ণ হয় না। যৌবনাগমের পূর্ব্বেই মুক্তা ঠাকুরাণী বিধবা হইয়া মা-বাপের সকল সাধের শেষ করিয়া দিলেন; এবং পতিগৃহের সহিত সেইদিন হইতে সম্বন্ধ চুকিয়া গেল। পল্লীগ্রামে ঝিউড়ী মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ আঁটা-আঁটি নাই। মুক্তা ঠাকুরাণী অসঙ্কোচে সকলের সহিত কথা কহিতেন, সবার সম্মুখে বাহির হইতেন। তবু সেই তেজস্বিনী বাল-বিধবার সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও কেহ কখনো নিন্দার কোন কথা বলিতে পারিত না। বাপের কাছে তিনি লেখা-পড়া শিখিয়া ছিলেন। দুপুর বেলা রামায়ণ, মহাভারত, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পড়িয়া পাড়ার মেয়েদের শুনাইতেন। তাঁহার গৃহে দ্বিপ্রহরিক বৈঠকের সভাটি বড় ছোট-খাট হইত না। সামান্য জমি-জমা যাহা কিছু ছিল, তাহাই বিলি করিয়া প্রজা বসাইয়া কোন রকমে সংসার চালাইতেছিলেন, খাজনা-আদায় প্রভৃতিও তিনি নিজে করিতেন। দূর হইতে উন্নত-নাসা শুভ্রবসনা শ্যাম-কান্তি বিধবাকে আসিতে দেখিলে দেনাদার তটস্থ হইয়া পড়িত; মুক্তা ঠাকুরাণীর পাওনা যেমন করিয়াই হউক এখনই ফেলিয়া দিতে হইবে। 'দিচ্চি' 'দিব' এ সব ওজর-আপত্তির কর্ম্ম নয়। কি জানি, ঠাকুরাণী যদি রাগ করিয়া বসেন—তবেই যে মুস্কিল! শুধু জবরদস্ত বলিয়াই যে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নয়, অন্তরের ঐশ্বর্য্য নিজ হইতেই লোক-চিত্তে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে যেমন ভয় করিত, তেমনি ভক্তিও করিত। দেশের লোকের আপদে-বিপদে রোগে-শোকে আগে গিয়া তিনি বুক দিয়া পড়িতেন। পীড়িতের সেবায়,

রাত্রি-জাগরণে, শোকার্ত্ত পরিবারের উপস্থিত প্রয়োজনে, যজ্ঞ-বাড়ীর যজ্ঞ-রন্ধনে সর্ব্বত্রই তাঁহার কুশল হস্তের সহৃদয়তা ও দক্ষতা দেখা যাইত।

কোথায় কোন্ গরীব গৃহস্থ মানের দায়ে ভিক্ষায় বাহির না হইয়া দুই-দিন উপবাসী রহিয়াছে, কাহার অভিমানিনী বধূ শাশুড়ীর গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া আত্ম-নাশের উপায় সন্ধানের চেষ্টা করিতেছে, কোন্ তরুণ যুবা বুড়ো মা-বাপের মুখ না চাহিয়া বধূ লইয়া উন্মত্ত, বা কোন্ ক্ষুদ্রচিত্তা বধূ শাশুড়ীর সম্মান না রাখিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্তা,—এ সকল সংবাদ মুক্তা ঠাকুরাণীর এজ্‌লাসে আগে আসিয়া পৌঁছিত এবং তাহার যথাসম্ভব প্রতিবিধানেরও বিলম্ব হইত না। একবার জানাইতে পারিলেই অভিযোক্তা দায়ে খালাস। তা'র পর কেমন করিয়া কি করিতে হইবে, সে ভাবনা বিচারকের।

সংসার শক্তির বশ। যে বৃহৎ গ্রহের শক্তি অধিক, সে নিজের কেন্দ্রে স্থির থাকিয়াও ক্ষুদ্র গ্রহ-উপগ্রহগুলাকে অনায়াসে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ইচ্ছামত ঘুরাইয়া লইতে পারে। শুধু শারীরিক বলেই সকল স্থলে কার্য্যোদ্ধার হয় না, মানসিক শক্তিই মানবের জড়ত্ব-নাশের প্রধান সহায়। এই জন্য গৃহস্থালীতে কর্ত্তা-গৃহিণী, রণ-ক্ষেত্রে সেনাপতি, সমবেত-কার্য্যে নেতার প্রয়োজন। যেখানে নেতার শক্তির অভাব, সেইখানেই নেতৃত্ব বিশৃঙ্খল। সৃষ্টিরক্ষার্থে মহাশক্তি তাই সদা-জাগ্রতা।

শক্তিশালিনী মুক্তা ঠাকুরাণী লোকের অভাব-নিবারণে যেমন সক্ষম, তাহাদের দোষ-ত্রুটি পাইলে রসনার তীক্ষ্ণ ব্যবহারেও আবার তেমনি নির্ভীক। তাঁহার নিকট দোষীর কাঠগড়ায় যে একবার দাঁড়াইবে, সহজে তাহার আর নিষ্কৃতি ঘটিবে না। এ-টুকু সবাই জানে—যে নাকের জলে চোখের জলে মিলাইয়া "ঘাট মানা" তাহার ভাগ্যে অনিবার্য্য। "আপনার" বলিতে তাঁহার বড় বিশেষ কেহ ছিল না! তাই 'বসুধৈব কুটুম্বকম'—

সকলকেই তিনি আপনার করিয়া লইয়া ছিলেন। আপনার বলিতে কেবলমাত্র তাঁহার এক ভাগিনেয়ী ছিল। সে বিদেশে স্বামীর কাছে থাকিত। বিবাহের পূর্ব্বে সময় সময় সে মাতুলানীর পিতৃগৃহে আসিয়াও বাস করিত; এবং বিধবার শূন্য অন্তঃকরণের অনেকখানি অংশ ভরাইয়া রাখিত। এখন সেও পর হইয়া গিয়াছে। তবু সেই তাঁহার একমাত্র নিকটতম আত্মীয়। সম্প্রতি তিনি তাহারো বৈধব্যের সংবাদ পাইয়াছেন। আর সেই জন্য তাঁহার গম্ভীর মুখ আরও বেশী গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। স্বল্প ভাষা আরও স্বল্প হইয়া গিয়াছে। এমন সময় অরুণ আসিয়া তাঁহার নিরানন্দ গৃহে আপনার নিরানন্দ জীবনের নূতন পর্ব্ব আরম্ভ করিল। জমিদার দয়া করিয়া তাহার জন্য মাসিক পনেরো টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিল। পল্লীগ্রামের খাওয়া-পরা ইহাতে অনায়াসে চলিতে পারে। কিন্তু বই কিনিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক, তাহার সঙ্কুলান হয় না। অরুণ খাওয়ার খরচ দশ টাকা করিয়া তাঁহাকে দিতে চাহিলে মুক্ত ঠাকুরাণীর গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হইয়া গেল, কিন্তু তিনি একটুও অসম্মতি জানাইলেন না। মনে করিলেন, টাকা কয়টি মাস মাস উহারই কোন ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য তুলিয়া রাখিবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে দুই বেলা দুই মুঠা শাক-ভাত খাইবে, তাহার কি আবার মূল্য লইতে হইবে? এ কি সহরের হোটেলখানা? গলায় দড়ি! গৃহস্থ-বাড়ীতে অতিথি যে গুরু! মুখে কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিলেন না। অরুণ টাকা দিলে তিনি বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন।

সংসারে সব হারাইলেও অরুণ দুইটি অনন্য-সাধারণ বস্তু হারায় নাই। এক—দৈহিক সৌন্দর্য্য, দ্বিতীয়—সচ্চরিত্র। মানুষ মাত্রেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হয় কে? মুক্তা ঠাকুরাণীও অরুণের সুন্দর মুখ ও অসহায় অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি একটু বিশেষ স্নেহাকৃষ্ট হইলেন।

অরুণের সুন্দর মুখ, প্রসন্ন স্নিগ্ধ দৃষ্টি, বিনীত শান্ত ভাব, সুকুমার কান্তি—ছেলেটিকে কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায়? তাহার তরুণ-ললাটে বিষাদের যে নিবিড় ছায়া এই বয়সেই আসন বিছাইয়া ছিল, লোক-চক্ষে তাহাতেও সহানুভূতির সৃষ্টি করিত। সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। পাড়ার প্রবীণেরা তাহাকে স্নেহ জানাইতেন, পাঠে উৎসাহ দিতেন। নবীনেরা বন্ধুত্ব করিতে চাহিত। ইহার অধিক সে দরিদ্র পল্লী বেশী আর কি দিতে পারে? অরুণ মিষ্টভাষে সকলের সহিত কথা কহিত, মিশিবার চেষ্টাও করিত। কিন্তু চিরদিনের অনভ্যাসের ব্যবধানে বাধিতে থাকিত। তাহার ভিতর-বাহিরের অসহ্য শূন্যতা তাহাকে অনেক দূরে ঠেলিয়া রাখিত। প্রাণ খুলিয়া সে কাহারো সহিত মিশিতে পারিত না। নিজের অন্তরের দীনতা সে কাহারো কাছে প্রকাশ পাইতে দিত না। পাছে গরীব বলিয়া কেহ তাহার প্রতি দয়া করিতে চায়, এই ভয়ে অভাবের কথা কাহারও কাণে সে তুলিত না। এত দিন জমিদার পুত্ররূপে যে শত শত দীন-দরিদ্রের অভাব মোচন করিয়াছে, আজ সে দয়া চাহিয়া কাহার কাছে মাথা নামাইবে? বরং এই যে তাহার অন্ন-বস্ত্রের মূল্য—আলোকনাথের কৃপার দান বলিয়া যেটাকে মনে হয়, ইহার ভার নামাইতে পারিলে সে বুঝি লঘু নিশ্বাস লইয়া আবার সুস্থ হইতে পারে! দানের সুখ যে পাইয়াছে, যাচকের দুঃখ যে তাহার পক্ষে মরণাধিক দুঃখকর!

মুক্তা ঠাকুরাণীর স্বল্পায়তন বাড়ীর বাহিরের একমাত্র ঘরখানি দখল করিয়া অরুণ তাহার অল্প-স্বল্প জিনিষ বই খাতা প্রভৃতি গুছাইয়া লইল। ঘরে টেবিল-চেয়ার আল্‌মারি কিছুই ছিল না; বহুকালের একখানি ঘুণ-ধরা তক্তাপোষ—তাহার চারিটি পদ চারিখানা অর্দ্ধভগ্ন ইষ্টক-খণ্ডে স্থাপিত করিয়া একমাত্র গৃহসজ্জারূপে অবস্থিতি করিতেছিল। প্রয়ো-

স্থানানুসারে এইখানিই টেবিল ও খাটের অভাব পূর্ণ করিত। অনিচ্ছাতেও তাহার পূর্ব্বের সুসজ্জিত পাঠাগারের বহুমূল্য মেহগ্নি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ডেক্সটি আর ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নী দেবীর চির-স্নেহময় হাসি-ভরা মুখ বার বার তাহার মানস-নেত্রে ফুটিয়া অশ্রুবাষ্পের কুয়াসায় মিলাইয়া যাইত। মানুষ যে সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ, অরুণ তাহা নিজেকে দিয়াই অনুভব করিতেছিল। এই যে যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন, ইহাও ত সে বেশ সহিয়া গেল? আর একবার এমনি আঘাত,—যাহা সে শত-চেষ্টাতেও স্মরণ করিতে পারে না, তাহাও ত সহিয়াছিল! হস্তচ্যুত সুদূর অতীত—অরুণের জীবনের সব আশা-আনন্দই যে তোমার আনন্দময় আলোকোজ্জ্বল অঙ্কে বিলীন! ভবিষ্যৎ—বৈচিত্র্যহীন দুঃখময় তিমিরাবৃত ভবিষ্যৎ—না জানি, তোমার দুর্ভেদ্য রহস্যময় গর্ভে আবার কি ইঙ্গিত তাহার জন্য গোপনে সঞ্চিত রাখিয়াছ!

সংসারের সব-কিছু হইতে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিয়া সে এখন যোগীর ন্যায় একমনে পাঠাভ্যাসেই নিজেকে নিযুক্ত রাখিল; কোন বাধা, কোন অসুবিধাই তাহার গ্রাহ্যে আসিল না। পূর্ব্ব-স্মৃতি ভুলিয়া থাকিবার, বর্ত্তমানকে কাটাইয়া তুলিবার একমাত্র উপায়,—সে এই শিক্ষালাভের আনন্দেই পাইয়াছিল।

দুই বেলা অনেক পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হয়। অল্প বয়সের ক্ষুধা—অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে দয়া করিত না। তা'ই সে যখন বৈকালে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিয়া যথাসাধ্য ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়া বাড়ী ফিরিত, তখন তাহার মুখখানি শুষ্ক দেখাইত। মুক্তা ঠাকুরাণী কিছুদিন হইতেই ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহার সুন্দর মুখ ও নিষ্পাপ মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক দৃষ্টি ধীরে ধীরে এই সন্তানবঞ্চিতা নারীর হৃদয়ে সন্তানস্নেহ জাগাইয়া তুলিতে-ছিল। অরুণের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাহাকে দুপুরবেলা কিছু

কিনিয়া খাইবার জন্য চারিটি করিয়া টাকা দিতে চাহিলে, অগত্যা অরুণকে তাহা লইতে হইল। বাক্-বিতণ্ডা করিতে সে দক্ষ নয়, তা'ছাড়া স্নেহের কাঙাল স্নেহের দান ফিরাইতেও ব্যথা বোধ করিল। আশ্রয়-দাত্রীর সমবেদনায় তাহার চোখে কৃতজ্ঞতার সহিত যে জলের আভাষ ফুটিয়াছিল, তাহা গোপন করিবার জন্য সে তখন ব্যস্ত থাকিলেও দাতার চক্ষে সেটুকু ধরা পড়িতে বিলম্ব ঘটিল না।

আড়ম্বর-হীন দরিদ্র জীবন ধীরে ধীরে তাহার মনে শান্তি আনিতেছিল। পূতাচারী ঋষি-বালকের ন্যায় নিজেকে সে ধর্ম্মে ও জ্ঞানে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। দুই বেলা স্নান করিয়া নিয়মিত সে সন্ধ্যাবন্দনা করিত। আলোকনাথ যাহাই বলুক, সে তাহার নবজীবনদাতা মহানুভব পালক পিতার দানের অবশিষ্ট—এই যজ্ঞোপবীতটুকু কাহারও কোন কথায় ত্যাগ করিবে না। স্কুল হইতে ফিরিয়া সে গৃহ-কর্ত্রীর সখের বাগানের প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া দিত। বাগানটিতে লাউ-কুমড়া সিম্ ও পালমশাক ছাড়া অন্য কিছু বড় জন্মিত না। দুই-চারিটা গাঁদা দোপাটি অপরাজিতা প্রভৃতি ফুলের গাছও ছিল। একপাশে একটুখানি কবিরাজী গাছ-গাছড়ার ক্ষেত করা হইয়াছিল। তুলসী, আদা, ব্রাহ্মীশাক, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মুক্তা ঠাকুরাণীর চিকিৎসা-বিদ্যার সাক্ষ্যস্বরূপ প্রতিবেশীদের সাহয্যার্থ সযত্নে রক্ষিত হইত। অরুণের চেষ্টায় বাগানটির একটু উন্নতি দেখা যাইতেছিল। বাগানের কাজ নিজ হাতে না করিলেও ইন্দ্রনাথের শিক্ষা দিবার পদ্ধতিতে এ বিষয়ে অনেকখানি অভিজ্ঞতা তাহার জন্মিয়াছিল। সেখানে সকালে ঊষা-ভ্রমণ-কালে ইন্দ্রনাথ তাহাকে শুধু গল্পচ্ছলে যে কত শিক্ষা দিতেন, তাহা তখন না বুঝিলেও এখন সে বুঝিতে পারে। শারদ সন্ধ্যায় যখন সে তাঁহার সহিত ছাদে বা বাগানে বসিয়া থাকিত, তখন আকাশের ঐ সব নক্ষত্রাবলীর পরিচয়

সে তাঁহার কাছে কত সহজ ও সরল উপায়ে লাভ করিয়াছিল। সে তখন বুঝিতেও পারিত না যে পিতা তাহাকে কোন কঠিন বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন। এমনি সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে তিনি তাহাদের নাম শিখাইতেন। কোন্‌টি কোন্ গ্রহ, সে অনায়াসে বলিয়া দিতে পারিত। কোন্‌টি শনি, কোন্‌টি শুক্র,—এ সব সে জানিত; গুণাবলীর পরিচয়ও দিতে পারিত। যে গ্রহের অবস্থান যেখানে থাকুক, অবলীলায় নিত্য-পরিচিত পুরাতন বন্ধুর মত তাহাদের সে চিনিয়া লইতে পারিত। পক্ষী-তত্ত্বেও সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের পক্ষী-পালনের সখ থাকায় পাখীদের জন্য জাল ঘেরিয়া বৃহৎ বাস-ভবন নির্ম্মাণ করানো হইয়াছিল; সেখানে নানা-জাতীয় পক্ষী ছিল। এমন কি যে সব পক্ষী বাস করিত, উড়াইয়া দিলেও তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কাঁধে বা হাতের উপর বসিত। তাহাদের কোমল পালকের স্পর্শ বুলাইয়া মানুষের মতই তাহারা নিজেদের আদর জানাইত। কেনেরী পাখীর খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিলেও সে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিত না, বরং গান গাহিয়া তাহাদেরই মুগ্ধ করিত। দূরে আকাশের গায়ে কৃষ্ণকায় ছোট পাখিটি উড়িয়া গেলেও সে অনায়াসে বলিতে পারিত, সেটি কোন্ জাতীয় পাখী? ঝিলে ডিঙ্গি চড়িয়া কতদিন সে এ-পার ও-পার করিয়াছে; নিজের হাতে দাঁড় টানিতে শিখিয়াছে, সাঁতার কাটিতে শিখিয়াছে। পুস্তকের শিক্ষা অপেক্ষা ইন্দ্রনাথ তাহাকে এই সকল শিক্ষাই অধিক শিখাইয়াছিলেন। তাহার শরীর ও মন এমনি করিয়া তিনি গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই হয়ত সে সাধারণের চেয়ে সাহসী, সত্যবাদী, কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরার্থপর হইবার অবসর পাইয়াছিল। যে বয়সে যে-শিক্ষাটির প্রয়োজন সেই বয়সে তাহা যথাযোগ্য হইলে তাহার ফল ভালই হয়। শিশু বংশ-দণ্ডকে অনায়াসে নোয়াইতে ও ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারিলেও সুপক্ব বংশকে নত করা যায় না। শিশু অবস্থায় মানব-

প্রকৃতি যখন কমনীয় ও নমনীয় থাকে, তখনই তাহাকে বশীভূত করিয়া সুগঠিত করিবার শুভ-যোগ। স্বেচ্ছাচারিতা, জেদ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি আগছা গুল্ম একবার জন্মিবার অবসর পাইলে আগাছার মতই তাহাদের শিকড় বহুদূর-বিস্তৃত হইয়া যায়, তখন আর তাহাদিগকে ইচ্ছামত ফিরানো যায় না। এখানে পাঠ ছাড়া অরুণের কিছুই শিখিবার বা করিবার ছিল না। তা'ই সে তাহার সমস্ত মনটুকুকে পাঠে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টির বাধা না জন্মিত, ততক্ষণ সে একমনে পাঠাভ্যাস করিত। কলিকাতার ন্যায় এখানে গ্যাসের আলো নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বৃক্ষচ্ছায়াময় পল্লীগৃহে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, তৈল পুড়াইবার অর্থাভাব—তা'ই সন্ধ্যার পর প্রায় সে পাঠ বন্ধ রাখিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা করিত। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে তাহার বর্ত্তমান জীবন অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছিল। মানুষ অবস্থার দাস। যখন যেমন, তখন তেমন চলিতে সে বাধ্য, তা'ই সক্ষমও সে। ক্লাস-পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেদিন বাড়ী ফিরিয়া অরুণের চোখের জল আর বন্ধ থাকিতে চাহিতেছিল না। আজ যদি ইন্দ্রনাথ থাকিতেন! এ অশ্রু কে বারণ করিবে? কে আর তেমন করিয়া তাহার সহিত আনন্দের অংশ সমানভাবে ভাগ করিয়া লইবে? এখানেও তাহাকে অনেকে স্নেহ করে, তাহার সাফল্যে বাহবা দেয়। কিন্তু সুখের সুখী, ব্যথার ব্যথী, অন্তরের মধ্যে সে কাহাকেও খুঁজিয়া পায় না। তাই অতীতকে ভুলিতে চাহিলেও সে তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে দেয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দৌত্য

এমনিভাবে যখন দিন কাটিতেছিল, তখন একদিন তাহার বৈচিত্র্য-হীন জীবন-পথে একটু পরিবর্ত্তন আসিয়া নিরানন্দ জীবনটাকে যেন ধীরে ধীরে সহনীয় করিয়া তুলিল। সেদিন অপরাহ্ন-বেলায় স্কুল হইতে ফিরিয়া অরুণ দেখিল, মুক্তা ঠাকুরাণী মজুর লাগাইয়া বাড়ীর আশ-পাশের জঙ্গল সাফ করাইতেছেন। বর্ষায় ঘাস ও আগাছা জন্মিয়া চারিদিক্ অপরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। পুকুর-পাড়েও বিস্তর বন্য ওল ও অপরিচিত অনাবশ্যক বন্য গাছের ভিড়। গৃহকর্ত্রীর অমনোযোগে এতদিন এগুলা সতেজে ও সগর্ব্বে বর্দ্ধিত হইবার অবসর পাইয়াছিল।

অরুণকে আসিতে দেখিয়া ঠাকুরাণী বলিলেন, "আজ হিমুরা এসে পৌঁছিবে, সন্ধ্যের গাড়ীতে। চিঠি দিয়েচে। তুমি একবার ইষ্টিসানে যেয়ো ত বাছা। দালানে লণ্ঠনটা সাফ করিয়ে রেখেচি, হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেয়ো। যে আঁধার রাত!" কথা কয়টি বলিয়াই তিনি ফিরিয়া পুনরায় নিজের তদারক-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন দেখিয়া অরুণ নীরবে স্বীকার-উক্তি জানাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিল, ঘরে ঢুকিয়া তাকের উপর বই কয়খানি রাখিয়া দিয়া সে তাহার মাদুর-পাতা তক্তাপোষের বিছানায় শুইয়া পড়িল। শরীর এমনই ক্লান্ত মনে হইতেছিল যে কোটটি খুলিয়া রাখিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না। অন্যদিন এ সময় সে তাহার সারাদিনের ইতিহাস, স্কুলের পড়া, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে তর্ক, সহপাঠিদের বাক্-

বিতণ্ডা ও সমালোচনা, নূতন শোনা কোন সংবাদ. এই সমস্তই চিন্তা করিত। আজ আর সে-সব কিছু তাহার মনে পড়িল না। এখনি-পাওয়া নূতন অধিকারের চিন্তাই তাহার প্রধান হইয়া উঠিল। প্রথমেই তাহার মনে হইল—কে এই হিমু, আর কি জন্যই বা সে আসিতেছে? ইহাকে যে সে আনিতে যাইবে, তা' চিনিবে কিরূপে! এই হিমু স্ত্রী কি পুরুষ, সে খবরও সে জানে না। যদি স্ত্রীলোক হয়, সধবা কি বিধবা, যুবতী কি বৃদ্ধা, তাহারও স্থিরতা নাই। অরুণ শেষটা স্থির করিল পুরুষ হওয়াই সম্ভব। নহিলে ট্রেনে আসিতে সাহস করিত কি? মুক্তা ঠাকুরাণী আবার বহুবচনান্ত 'হিমুরা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে সে একা আসিতেছে না —সঙ্গে আরো লোক আছে? এই হিমুর চিন্তা তাহার ভাল লাগিতেছিল। যেই আসুক—যাহারাই আসুক, তবু একটু পরিবর্ত্তন ত মিলিবে। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত এই একঘেয়ে ভাব—এ যেন আর সহ্য হয় না!

অরুণ মনে করিল, ষ্টেশনে যাইবার পূর্ব্বে মুক্তা ঠাকুরাণীর নিকট প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ জানিয়া লইবে। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেলে জামা খুলিয়া পুকুর-ঘাটে গিয়া সে মুখ-হাত ধুইয়া আসিল। পুকুর-পাড়ে বড় একটা বেল গাছ থাকায় লোকে তাহাকে "বেল পুকুর" আখ্যা দিয়াছিল। সে পুকুরের জল বড় স্বচ্ছ ও স্বাদু; তা'ই পাড়ার ও দূরের অনেক লোক পানীয় জলের জন্য এই বেল পুকুরের জল লইতে আসিত।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। স্বচ্ছ জলের উপর বাতাসের খেলা বড় মিষ্ট লাগিতেছিল। শরীর যেন জুড়াইয়া যাইতেছিল। কিন্তু অরুণ জানিত, এ সময় পাড়ার মেয়েরা জল লইতে বা গা ধুইতে আসিবে। বিদেশী হইলেও তরুণ বয়স দেখিয়া কেহ তাহাকে লজ্জা করে না, বরং উপযাচিকা হইয়া অনেকে তাহার সহিত কথাও কহিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে সে বিপন্ন হইয়া পড়ে। বাহিরের আঘাত লোকে দেখিতে

পায়—ব্যথা সারিল কি না বুঝিতে পারে, কিন্তু অন্তঃকরণের ক্ষত, এ যে সহজে সারে না,—সে খবর রাখিবার মত দরদীও ত সহজে মেলে না। লোকে তাহাকে তাহার অতীত জীবনের সম্বন্ধে সকৌতূহলে প্রশ্ন করে। কিন্তু সে আলোচনা যে তাহার পক্ষে কি, সে খবর ত কেহ রাখে না! তা'ই কৌতূহল-লেশ-হীন মুক্তা ঠাকুরাণীর আশ্রয়ই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। এখানে তাহাকে অতীত-বর্ত্তমানের কোন জবাবদিহিই করিতে হয় না।

বাড়ী হইতে ষ্টেশন প্রায় দুই মাইল দূরে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—একটু পূর্ব্বে যাওয়াই উচিত ভাবিয়া সে মুক্তা ঠাকুরাণীর উদ্দেশে ঘরের বাহির হইল। দুই বেলা আহারের সময় ছাড়া ঠাকুরাণীর বিনা আহ্বানে সে বড় কখনো ভিতর-বাড়ীতে যাইত না; তা'ই একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সে ঢুকিয়া পড়িল। উঠানের দুই ধারে তিনখানি করিয়া ছয়খানি ঘর; তিনখানি পাকা, তিনখানি কাঁচা। পাকা তিনখানির মধ্যে যেখানির বাহির ভাগে দরজা সেই খানিতে অরুণ থাকে, বাকী দুইখানি ঠাকুরাণীর শয়ন ও উপবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাঁচা মাটীর গোময়-লিপ্ত আলিপনা চিত্রিত দুইখানি ঘর পূজা ও ভাঁড়ারের; অন্যখানি রন্ধনের। এখন সেখানি অনাবশ্যক-বোধে খালি পড়িয়া আছে। এ ছাড়া উঠানের অন্য অংশে কাঠ প্রভৃতি রাখিবার জন্য একখানি দরমা-ঘেরা চালা ঘরও ছিল। গ্রীষ্মের দিনে রন্ধন গৃহের বাহিরে, মাটীর দালানে রান্না হয়।

অরুণ ভিতরে আসিয়া মুক্তা ঠাকুরাণীর উদ্দেশ পাইল না। শুইবার ও ভাঁড়ার ঘরের দরজায় তালা লাগানো। সম্ভবতঃ তিনি পাড়ায় কাহারো বাড়ী বেড়াইতে বা কোন রোগীর খবর লইতে গিয়াছেন। ষ্টেশন দূরে। ট্রেনের খুব বেশী দেরী নাই। বিলম্ব অনুচিত বুঝিয়া সে দালানের সম্মুখে রক্ষিত চৌকা কাঁচের আবরণী-বেষ্টিত পুরাতন দেশী লণ্ঠনটি হাতে ঝুলাইয়া

বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। পকেটে দেশলাই লইল। এখনও কিছু বেলা আছে,—এখন হইতে অনাবশ্যক তৈল পুড়াইবার ইচ্ছা না হওয়ায় লণ্ঠনটা আর জ্বালিয়া লইল না।

ছুটির দিন প্রায়ই সে ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিত। ষ্টেশন-মাষ্টার আশুবাবুর সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল। ষ্টেশনটি খুব ছোট, প্লাট-ফর্মটুকুও তাই। গ্রামের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া তাহা মানাইয়াছিল ভাল। তবু সেই কটা রঙের কাঁকর-বিছানো ক্ষুদ্রকায় প্লাটফর্মের পশ্চাৎভাগে রাঙা রং লাগানো কাঠের বেড়ার গা ঘেঁসিয়া যে সব নিত্য-পরিচিত ফুলের গাছ—ফুলে ও পাতায়—স্থানটিকে সুদৃশ্য করিয়া রাখিয়া ছিল, তাহা অরুণের চোখে বড় সুন্দর বোধ হইত। বেড়ার গায়ে তরুলতার সরু পাতার সহিত রাঙা রাঙা সরু ফুলগুলি কি সুন্দর! দূরে যতদূর দৃষ্টি চলে, দর্শনযোগ্য কিছুই ছিল না। হরিৎ ক্ষেত্রের নয়নলোভন দৃশ্যেরও এখানে অভাব। অসমতল সরু সরু মাটীর রাস্তা, ডোবা, খানা, ঝোপ, জঙ্গল, বাঁশবন, মাঠ ও পচা পুকুর—ইহাই এখানকার দর্শনীয় বস্তু। তবু স্থানাভাবে এইখানেই সে বেড়াইতে আসিত। যাত্রীপূর্ণ ট্রেনগুলি চলিয়া যাইত, সে তা'ই দেখিত। কেহ উঠিত, কেহ নামিত, ডেলি প্যাসেঞ্জার অনেকগুলি থাকিত। তা'ই ষ্টেশনটি ছোট হইলেও লোকের গমনাগমনের কোন বিরাম ছিল না। কাজের অভাবে বসিয়া সে ষ্টেশন-মাষ্টারের কার্য্য দেখিত। আজও সে তাঁহার শরণ লইল। আশুবাবু হাসিয়া আশ্বাস দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ আসিয়া পড়িল। অনেকগুলি ডেলি প্যাসেঞ্জার নামিয়া গেলেন। নিত্য আনাগোনা তাঁহাদের অভ্যাস হইয়া যাওয়ায় মুখে বা চোখে কাহারও কিছুমাত্র ব্যস্ত ভাব ছিল না। অরুণ থার্ড ক্লাশের স্ত্রীলোকদের কামরায় জানালার বাহিরে একখানি মুখ দেখিয়া থমকিয়া

দাঁড়াইল। অনেকগুলি অপরিচিত মুখের মধ্য হইতে সেই মুখখানি বিশেষ করিয়া দর্শকদের চোখে পড়িতেছিল। সে একটি বছর দশেক বয়সের মেয়ের মুখ। মুখখানি বড় সুন্দর। একবার চোখে পড়িলে আবার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহার সুন্দর মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটিয়াছিল।

"ঝাল্‌দা! বলেচি ত আমি। ও মা, নাবো, নাবো, গাড়ী ছেড়ে দিচ্চে যে—বাঃ—" বলিয়া সে একটা মস্ত পুঁটুলি টানিয়া নামাইয়া নিজেও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িল। পরে পুঁটুলি রাখিয়া অবগুণ্ঠনবতী এক বিধবা নারীকে নামাইয়া লইল।

"ট্রেণে জলের কল্‌সী রইল যে—" বলিয়া সে পুনরায় ব্যস্তভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইলে অরুণ তাহাকে থামাইয়া নিজে কল্‌সীটা নামাইয়া দিল। ততক্ষণে ষ্টেশন-মাষ্টারও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অরুণের সহিত তিনিও প্রত্যেক কামরায় দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিতেছিলেন। "মুক্ত ঠাক্‌রুণের বাড়ী কে যাবেন?" বলিয়া তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করিতেছিলেন; অরুণকে ইঁহাদের প্রতি মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুক্তা ঠাকুরাণীর নাম শুনিয়াই মেয়েটির চোখে সাফল্য ও আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল, "আমরা যা'ব।" আশুবাবু অরুণের পানে চাহিয়া, ইংরাজীতে বলিলেন, "You have found them all right—I see" বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতেও একবার পিছন ফিরিয়া মেয়েটির পানে চাহিয়া গেলেন। এমন জায়গায় এমন মুখ সাধারণতঃ ত চোখে পড়ে না, কাজেই একবার চোখে পড়িলে বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হিমানী

ট্রেণ চলিয়া গেলে অরুণের যেন চমক ভাঙ্গিল। সে অপ্রতিভভাবে অগ্রসর হইয়া রমণীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আসুন, আমি আপনাদেরই নিয়ে যেতে এসেচি যে?" "মা শুন্‌চ, দিদিমা আমাদের নিতে লোক পাঠিয়েছেন" বলিয়া মেয়েটি মস্ত পুঁটুলিটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অগ্রসর হইল দেখিয়া মা জলের কলসী লইয়া অনুবর্ত্তিনী হইলেন। অরুণ লণ্ঠন জ্বালিয়া পুঁটুলি লইতে গেলে সে বাধা দিয়া কহিল, "নাও যদি ত কলসীটাই নাও। মা রোগা মানুষ, কষ্ট হচ্চে। তোমাদের অ-গঙ্গার দেশ কি না, তা'ই মা এক ঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে এসেচে" বলিয়া সে মায়ের নিষেধ না মানিয়া কলসীটা তাঁহার কাছ হইতে টানিয়া নামাইয়া অরুণের হাতে পুঁটুলিটা দিয়া নিজেই কলসী লইল। কলসীটি ছোট হইলেও অরুণের পক্ষে তাহা বহন করায় অসুবিধা হইত। হাতে ঝুলাইয়া অত পথ চলা সম্ভব নয়। অন্য উপায়ে লওয়াও তাহার পক্ষে মুস্কিল। তা'ই কৃতজ্ঞ হইয়া মনে মনে সে এই ছোট মেয়েটির বিবেচনা-বুদ্ধির প্রশংসা করিল। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে পথের অন্ধকার খণ্ডিত করিয়া অরুণ আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া পল্লীগ্রামের পথে এখনই বেশ অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছে। আকাশে চাঁদ নাই—এ রাত্রে উঠিবার আশাও ছিল না। নক্ষত্র এখানে-ওখানে দুই-চারিটা সবে ফুটিতে সুরু করিয়াছে। অনভ্যস্ত পথে পশ্চাৎ-বর্ত্তিনীরা অতি-কষ্টে চলিতে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে পায়ে হুঁচট

লাগিয়া মেয়েটি আঃ-উঃ করিতেছিল। মাকে সে যথাসম্ভব সাবধান করিতেছিল। "দেখে চল মা, এ দিক্‌টায় একটা গর্ত্ত আছে। সাম্‌নে উঁচু,—বাঁ দিক ঘেঁষে এসো,—বৃষ্টির জল জমে আছে—" ইত্যাদি সতর্কতা-জ্ঞাপনের সহিত অসন্তোষপূর্ণ মন্তব্য-প্রকাশেও তাহার বিরতি ছিল না। "মাগো, কি দেশ তোমার মামীর! যেমন বন, তেম্‌নি কি পথের ছিরি হ'তে হয়! হাঁ্যাগা, দেশের মানুষেরা কি আলো জালে না? তোমাদের দেশে কোথাও ত এক বিন্দু আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বাঃ! ঐ যে আলো জ্বল্‌চে! দেশে বুঝি ঐ একটি ছাড়া আর মানুষ নেই?" বলিয়া সে অরুণের উদ্দেশে প্রশ্ন করিলে বাধা দিবার ভাবে একটুখানি রুক্ষস্বরে মা কহিলেন, "হিমু,—"! মেয়ে বুঝিল, মা তাহাকে নীরবে পথ চলিতে আদেশ দিতেছেন। তা'ই কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়াই চলিল। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকা তাহার স্বভাব নয়। তা'ছাড়া এই অন্ধকার অপরিচিত পথে শত বাধা বর্ত্তমান। কোথাও পথের ধারে কুকুর "ঘেউ" করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল; বনের ভিতর শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। কাছেই বাঁশবনে বাতাসের আন্দোলনে পাতায় সর্ সর মর্ মর্ ধ্বনি উঠিল। সে চমকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; কহিল, "ওমা, শোন, শোন—রায়পুরের মতন এখানেও আবার শেয়াল ডাকে। হাঁ্যাগা, এখানে বাঘ বেরোয়? কেউ ডাকে?" তাহার স্বরে যথেষ্ট ভয়ের আভাষ পাওয়া যাইতেছিল। অরুণ তাহাকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কিছু না—বাঘ-টাঘ এখানে নেই,—দিনের বেলায় দেখ্‌বে এখন—তেমন বনও এ সব নয়। এই যে এবার আমরা বাড়ীর কাছেই এসে পড়েচি" বলিয়া এবার সে নিজে পিছনে থাকিয়া তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিল। বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরে ঢুকিতে রমণীর যেন পা উঠিতেছিল না। অনেক দিনের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি মনের ভিতর খালি-পাখালি করিতেছিল।

নব বৈধব্যের শোকের তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিতেছিল। তবু ধৈর্য্যশালিনী নারী কোনমতে দেহ খানাকে টানিয়া লইয়াই যেন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অরুণ মাটীর দাওয়ার উপর কাপড়ের পুঁটুলিটি নামাইয়া হিমুর কাঁখের জলের কলসীটি নামাইয়া পাশে রাখিল। দালানের শেষ প্রান্তে কাঠের দেরকোর উপর বাতাসে নিভু-নিভু হইয়াও একটি মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাহারই অল্প দূরে বসিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী হরিনামের ঝুলি হাতে করিয়া মালা জপ করিতে ছিলেন। ইহাদের দেখিয়া জপের মালা মাথায় ঠেকাইয়া সে ছড়া ঝুলির ভিতর রাখিয়া দেয়ালের হুকে টাঙ্গাইয়া উঠানে নামিয়া আসিলে বিধবা নত হইয়া তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিলে দেখাদেখি মেয়েটিও তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিধবার শীর্ণ কম্পিত দেহখানি কাছে টানিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে মারে, কি বেশে তোকে দেখ্‌লুম্ রে—আমার রাণীর গায়ে এমন ছাই কে মাখিয়ে দিলে রে—!"

অরুণ নীরবে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে জানিত, এখন তাহাকে এখানে আর কোন প্রয়োজন হইবে না। নিজের অজ্ঞাতে তাহারও দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে ছিল। দুঃখের জ্বালা যে সে ভালো করিয়াই জানে। তা'ই দুঃখীর দুঃখে তাহার স্মৃতি-সমুদ্রও উথলিয়া উঠিয়া একবৎসরের পুরাতন শোককে আজ যেন আবার নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিল। ইন্দ্রনাথ ও কাত্যায়নী দেবীর স্নেহমাখা মুখ সে কি কখনো ভুলিতে পারিবে? বুকের ক্ষত লোক-চক্ষে অদৃষ্ট থাকিলেও তাহার বেদনা ত ব্যথাতুরের অজ্ঞাত থাকে না! সকল-কিছুর ভিতর দিয়াই বোধ-শক্তি সেইখানেই যে আগে গিয়া পৌঁছায়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিমুর বিদ্যাশিক্ষা

মেয়েটির ভাল নাম হিমানী; কিন্তু লোকে তাহাকে হিমু বলিয়াই ডাকে। হিমু সুন্দরী। তাহার সুগৌর সুশ্রী দেহের মধ্যে সব-চেয়ে সুন্দর ছিল, তাহার চোখদু'টি! ঘন-কৃষ্ণ—ছবিতে আঁকার মত—অতি সূক্ষ্ম ভ্রূর নীচে যে দুটি আলো-করা কালো চোখ ছিল, তেমন চোখ সাধারণতঃ বড় একটা কাহারো চোখে পড়ে না। যদিই বা ভাগ্যক্রমে কাহারও পড়িত, সে আর সেই যাদু-করা চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি হইতে নিজের মুগ্ধ দৃষ্টি সহজে ফিরাইয়া আনিতে পারিত না। হিমু বালিকা; সে তাহার সদা-চঞ্চল সদা-সহাস্য চক্ষে যে কতখানি মদিরতা ও মধুরতা মাখানো আছে, তাহার কোন হিসাব রাখিত না। তা'ই আত্মীয়-অনাত্মীয় যুবা-বৃদ্ধ সকলকার পানেই অসঙ্কোচে অনায়াসে হাসিয়া চাহিতে তাহার এতটুকু কৃপণতা দেখা যাইত না। পুরুষ-মহলে তা'ই তাহার খাতির থাকিলেও মেয়ে-মহলে তেমন সুখ্যাতি-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। গ্রাম্য বালিকাদলে মিশিয়া ইঁচড়ে-পাকা কাঁঠালের মত পাকিয়া উঠিয়া শৈশবেই নিজের স্ত্রীত্ব-বোধের কোন প্রমাণ না দিয়া সে ছেলের দলে মিশিয়া ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি, পুকুরে সাঁতার কাটা এবং সর্ব্বোপরি লজ্জার কথা, গাছে চড়িয়া কোথায় পেয়ারায় রং ধরিল, কোথায় আমের গাছে মুকুল ফুটিয়া ফল দেখা দিল, কা'র বাগানের গোলাপ-জাম ও ফল্‌সা গাছের ফল অধিক মিষ্ট, তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপরতা দেখাইতে সুরু করিল—ইহাতে তাহাকে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না। এই অকুণ্ঠিত নারীত্ব-বোধ-হীন সারল্য ও শ্রীমণ্ডিত মেয়েটির পানে চাহিয়া প্রথম দর্শনেই অরুণের মনে হইয়াছিল, এ মেয়ে দেখিবার মত

ঘটে! অবারিত-গতি বন্য-প্রকৃতি এই মেয়েটির সহিত আলাপ করিতেও তাহাকে এতটুকু ক্লেশ পাইতে হইল না। সে নিজেই উপযাচিকা হইয়া প্রথম দিনেই সাধিয়া ভাব করিয়া ফেলিল। তাহার বিশৃঙ্খল বহিগুলি ও দড়ির আল্‌নার এলোমেলো কাপড়-জামাগুলি হিমু গুছাইয়া রাখিল; ঘরখানির চারিপাশ তক্তাপোষের নীচে পর্য্যন্ত ঝাঁট দিয়া এক রাশ ধূলা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। কুণ্ঠিত লজ্জায় অরুণ তাহার হাত হইতে ঝাঁটা লইতে গেলে হাত দিয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া হাসিয়া সে কহিল, "বা রে! পুরুষমানুষ বুঝি কখনো ঘর ঝাঁট দেয় আবার! সরো গো মশাই, সরো, ভারী ত জানো তুমি! আমি সব ঠিক করে দিচ্চি।"

স্বল্পভাষী লাজুক অরুণ ইহা লইয়া বেশী বাক্‌বিতণ্ডা করিল না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই অরুণ যখন দেখিতে পাইল, পাড়ার একটি সমবয়সী ছেলের সহিত মিশিয়া পদ্মফুলের লোভে বেলপুকুরের গভীর জলে রাজহংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া দুইধারে জল ছড়াইয়া পূর্ণ জলে সূর্য্যালোকের হীরক দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়া সাঁতার কাটিয়া সে-ই চলিয়াছে—তখন জানলার বহির্দ্দেশ হইতে নিজ বিস্মিত উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টি ফিরাইয়া আপনার চির-প্রচলিত নিয়মে পাঠ্য পুস্তকে তাহা সংলগ্ন করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না।

মেয়েটি যখন-তখন ঝড়ের মত তাহার ঘরে অনাহূতভাবেই প্রবেশ করিতে লাগিল; আবার বিনানুমতিতে তেমনি করিয়াই সে বাহির হইয়া যাইত। কখনো উৎপাতে-উপদ্রবে তাহার পাঠের ব্যাঘাত ঘটাইত, অনর্গল অপ্রাসঙ্গিক বাজে কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিয়া দিত; আবার কখনো তাহার বই-খাতা গুছাইয়া ঘর ঝাঁট দিয়া কুঁজায় জল ভরিয়া অরুণের শত নিষেধ-মিনতি উপেক্ষা করিয়া তাহার বিছানা রৌদ্রে দিয়া অনেক প্রকারে তাহাকে সাহায্য ও আন্তরিক স্নেহ প্রদর্শন করিত।

তীব্র রৌদ্রে বুক যখন শুকাইয়া ফাটিয়া ওঠে, তখন দুই-চারি বিন্দু বৃষ্টিধারাকেও সে অল্প বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে না। স্নেহ-হীন পরাশ্রিত অরুণের পক্ষে এই যে অযাচিত অপূর্ব্ব স্নেহ,—তৃষাতুরের পক্ষে অমৃত-বিন্দুর মতই তাহা মোহকর। তাহার উদ্দেশ্য-হীন জীবনে সে যেন আবার উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাইতেছিল। ছুটির পর বাড়ী ফিরিবার পথে এখন মনে পড়ে, তাহার জন্য পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিবারও কেহ আছে। অনেক সময়েই তাহার আশা সফল হইত। হাজার খেলার প্রলোভন উপস্থিত থাকিলেও এ সময়টি হিমু কেবল তাহার জন্যই অপেক্ষা করিয়া থাকিত। বাড়ীর অনতিদূরে রায়েদের আম-বাগানের হেলিয়া-পড়া একটা বৃদ্ধ বটের মোটা গুঁড়ির আসনে বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া মৃদু স্বরে নূতন শেখা "ওরে পাগল বেরুস্‌নে আজ পথে, রাজার রাজা বেরিয়েছেন আজ রথে—" গাহিতে গাহিতে হিমু তাহার কালো চোখের প্রতীক্ষা-ভরা দৃষ্টি পথের পানেই প্রসারিত করিয়া রাখিত। দূর হইতে চোখে চোখে মিলিলে চারি চক্ষে মিষ্ট হাসির আদান-প্রদানের সহিত দুই জনের চক্ষুই যেন বলিয়া উঠিত, "আশা-প্রতীক্ষা পূর্ণ হইয়াছে।" কোনদিন ছুটিয়া গিয়া অরুণের মানা না মানিয়া সে তাহার হাতের বহি-গুলি কাড়িয়া লইয়া লঘু ত্রস্তগতি হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়া যাইত। আবার কোন দিন যেন তাহাকে গ্রাহ্যই নাই, সে যেন কোথাকার কে একজন অপরিচিত পথিক মাত্র, এমনি অনাগ্রহ তাচ্ছীল্যের ভঙ্গীতে উদাস দৃষ্টিতে আনমনে চাহিয়া কষ্টসঞ্চিত এবং বহুক্ষণের যত্ন-রক্ষিত আমড়া ফল গুলির অম্ল রস-গ্রহণে একান্ত মনোযোগী হইয়া থাকার ভাণ করিত। অরুণ স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। অবস্থা তাহাকে আরও সংযত ও কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে সহজে কাহারো সহিত মিশিত না, নিজ হইতে অগ্রসর হইয়া কাহারো সহিত আলাপ করিত না। তবু তাহার বুকে

দেখিয়া তাহাকে কেহ গর্ব্বিত বলিয়া কোনদিন সন্দেহ করিত না। বিনীত শান্ত যুবকের সকরুণ কুণ্ঠা তাহাকে দূরে ঠেলিয়া না ফেলিয়া মানবের অন্তরের দিকেই আকর্ষণ করিত; তবু এই নির্লিপ্ত লাজুক ছেলেটিও অনেক সময় হিমুর নিকট তাহার সংযমের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইত। মন খুলিয়া ইহার সহিত গল্প করিয়া তাহার বুকের বোঝা সে লঘু করিয়া লইত। মনে হইত, জীবনের সার্থকতা আছে। ইহা শুধুই গর্দ্দভের ভার-বহন নহে।

বরাবরই দুই বেলা আহারের সময় ব্যতীত অরুণ কখনো বাড়ীর ভিতর যাইত না—যাইবার প্রয়োজনও হইত না। পূর্ব্বে কলসী হইতে জল গড়াইয়া কুশাসনখানি বিছাইয়া লইয়া সে আপনি আহারের স্থান করিয়া লইত। হিমু আসিবার পর এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল, "বা রে—পুরুষ মানুষ বুঝি নিজে নিজে ঠাঁই করে? সরো, সরো, ভারী ত জানো, অমনি করে বুঝি জল আছড়া দিতে হয়?" ঠাঁই করিয়াই রান্নাঘরে খবর হয়, "অরুণ দা' এসেচে, ভাত বাড়ো।" ভাত গরম থাকিলে পাখা লইয়া অরুণের পাতের সাম্‌নে সে বাতাস করিতে বসিয়া যায়। অরুণের লজ্জারক্ত বিপন্ন মুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া সাহায্য করিতে গিয়া তাহাকে সে বিব্রত করিয়াই তুলিত। নির্ব্বোধ বালিকা অরুণের সহিত নিজের পার্থক্যের কথা বুঝিত না,—তা'ই অনেক সময় অরুণের ব্যবহারের অর্থ না পাইয়া সে ক্ষুন্ন হইত। কখনও রাগ করিত, কখনও অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিত। অরুণ দুঃখিত হইত—কিন্তু সাধিত না। এক বেলা বা এক দিন সহস্র ছুতায়-নাতায় তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, এমনি ভাবে আনাগোনা করিয়াও যখন অরুণের তরফ হইতে মৌন বিষণ্ণ-দৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যাইত না, তখন নিজেই তাহারই সহিত কথা কহিয়া বালিকা আপনার মান রক্ষা করিত।

হাঁড়িকুড়ি বা পুতুল সাজাইয়া মেয়েলি খেলা তাহার ভাল লাগিত না। তদপেক্ষা দাঙ্গাহাঙ্গামায় পৃষ্ঠ দেওয়াই তাহার লাগিত ভাল। অবিরত ঠাকুরমার কাছে উপদেশ, প্রতিবাসিনীদের তীব্র মন্তব্য এবং মায়ের কঠোর তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া অনেক সময় আপনার অব্যাহত গতিকে সে সংযত করিবার চেষ্টা করিত, আবার কখনো বা বিদ্রোহী ভাবে বাঁকিয়া বসিত—বেশ, এখানে সে থাকিবে না। এ ছাইয়ের দেশ—এর চেয়ে আমাদের বাকুল ঢের ভাল, সেখানে মানুষরা মানুষের এত নিন্দা করিয়া বেড়ায় না।

অরুণ একদিন একখানা প্রথম ভাগ কিনিয়া আনিয়া তাহার লেখা-পড়া শিখিবার কথা তুলিলে প্রথমটা মুখে আঁচল চাপা দিয়া সে খুব এক চোট হাসিয়া লইল, তা'র পর গম্ভীর হইয়া কহিল, "লেখা-পড়া—মাগো, মেয়েমানুষে বুঝি আবার লেখা-পড়া শেখে? তা'হ'লে চাক্‌রি কর্‌তে যায়, পাগড়ী বাঁধে, জুতো পরে?"

নারীত্বের সম্বন্ধে এতখানি সজাগ সতর্কতা থাকায় সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহার বিরক্ত বিদ্রোহী চিত্ত বইখানাকে ছুঁড়িয়া ঐ বেলপুকুরের জলে নৌকা ভাসাইতে চাহিত। সে প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিত, "কেন বাবু, আমি পড়্‌ব না, পড়্‌ব না—পড়্‌তে পার্‌ব না, এই রইল তোমার বই" বলিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অরুণ যখন তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া আপনার বই খুলিয়া নোট লিখিতে আরম্ভ করিত, তখন সে একটুখানি অপেক্ষা করিয়া জোর দিয়া পুনরায় বলিত, "শুন্‌চো অরুণ-দা'—আমি পড়্‌ব না!" অরুণ লেখা হইতে চোখ না তুলিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন অনাগ্রহ ভাবে "আচ্ছা" বলিয়া কাজ করিয়া যাইত। অগত্যা আবার তাহাকে বসিতে হইত এবং দুর্বোধ্য স্মরণাতীত নিঠুর অক্ষরগুলার উপর চোখ রাখিয়া তাহাদের দুর্বোধ্য কর্কশ একঘেয়ে শব্দগুলাকেই মুখস্থ করিতে হইত। অরুণ যদি তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিত, জোর করিয়া

বলিত যে, না, তাহাকে পড়িতেই হইবে, তবে সেই দিনই সে পড়ার দফা রফা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারিত। কিন্তু এই যে মৌন আদেশ, নীরব অভিমান,—ইহার উপর জোর চলে না—ইহাকে লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় না, ব্যথা দিতেও পারা যায় না। দেখিয়া অরুণ মনে মনে হাসিলেও প্রকাশ্যে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কহিত, "তা'ইতো মেয়ে মানুষের যে লেখাপড়া শিখ্‌তে নেই, তা' ত আমার জানা ছিল না। তবে আর কি হ'বে? যদু ময়রার মেয়ে কুসিকে সেদিন স্কুলে যাবার সময় প্রথম ভাগ পড়্‌তে দেখেছিলেম, না হয় বিকেল বেলা একবার করে তা'কেই পড়্‌তে শিখিয়ে আস্‌ব—বইখানা কি নষ্ট হ'বে!" হিমু অনাগ্রহভাবে "বেশ ত—" বলিয়া চলিয়া গেলে অরুণ আপনার পাঠ্য-পুস্তক খুলিয়া বসিত।

পরদিন সেই দুই পয়সা দামের বিচিত্র চিত্র-শোভিত বর্ণ-শিক্ষাখানির কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না—দুইদিন উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া ও অরুণের নিকট হইতে সুগভীর মৌনতা ছাড়া ভৎর্সনা বা ক্রোধ কিছুই যখন পাওয়া গেল না—তখন অপরাধিনী তাহার চুরির মাল বাহির করিয়া দিয়া শান্তভাবে জানাইল যে এইবার সে পড়িতে শিখিবে এবং এমন অপরাধ আর কখনও করিবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ সর্ত্তও রহিল যে অরুণ "যা'কে-তা'কে"—অর্থাৎ আর কাহাকেও পড়াইতে পারিবে না। অরুণ হাসিয়া তাহাতেই সম্মতি দিল—শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে আবার সন্ধি স্থাপিত হইল। একান্ত মনোযোগের সহিত অরুণ এই দুর্দ্দান্ত বন্য হরিণীকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফলে অনেকখানি কৃতকার্য্যও হইল। প্রথম প্রথম এই বাঁধা-ধরা নিয়মের ভিতর বদ্ধ থাকা ও দুর্ব্বোধ্য রেখাগুলার চেহারা ও নাম স্মরণ রাখা হিমুর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল—এমন কি, অনেক সময় সেগুলা যেন বিস্মৃত-প্রায় কোন্ সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কাহিনী বলিয়া তাহার মনে হইত। এমনি করিয়া যখন

প্রথম ভাগ সাঙ্গ হইয়া গেল, তখন দ্বিতীয় ভাগ পড়িতে আর সে কোন আপত্তি করিল না। পাঠের রসবোধের সুখ অনুভব করিতে শিখিয়া তাহার মনে পুস্তকের গল্পগুলি যেন অভিনব এক নূতন দেশের নূতন আনন্দ আনিয়া দিতে লাগিল!

মা ও দিদিমার মুখে সে রূপকথার অনেক নায়ক-নায়িকার অদ্ভুত ইতিহাস শুনিয়াছিল। এখন ছাপার অক্ষরেও সেই সব অভিনব গল্পাবলীর অপূর্ব্ব রহস্য-পাঠে সে শুধুই মুগ্ধ নয়, পুলকিতও হইত। কল্পনার সাহায্যে নিজেকে সেই সব রূপকথার রাজকন্যাদের আসনে বসাইয়া হীরা-মণি-মাণিক্যে সাজাইয়া পাতাল-পুরীর মাণিক-জ্বালা কক্ষের সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শায়িতার পানে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিত। কখনো মনে হইত, সে যদি সত্যসত্যই কঙ্কাবতী হইয়া যায়,—আর ঝিনুকের নৌকা চড়িয়া ঐ বেলতলার পুকুরে ভাসিতে থাকে! কেমন মজা হয়! মা আসিয়া ডাকিতে থাকে,—

"কঙ্কাবতী মা আমার, ঘরে ফিরে এসো না।
কাঁদিছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর কোরো না।
ভাত হল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।
কঙ্কাবতী মা আমার সাতদিন উপবাসী।"

কঙ্কাবতী-রূপিনী হিমুও অমনি বলে,—

"বড়ই পিপাসা মা, না পারি সহিতে" ইত্যাদি। কেমন মজা হয়—ভারী চমৎকার খেলা!

আচ্ছা, সে যদি কঙ্কাবতীই হয়, তবে খেতু হইবে কে? ঐ ত মুস্কিল। হিমু ভাবিল, আচ্ছা, অরুণদাদা খেতু হইলে কেমন হয়? দূর! এ মীমাংসা কিন্তু মনঃপূত হইল না। সে কি ভাল হইবে? অরুণদা'র জাম খাইয়াই না তাহার এমন দশা ঘটিয়াছে! তবে থাক্, খেতুকে আর আনিয়া কাজ

নাই। সে তাহার কল্পনার ঝিনুকের নৌকা কূলে ভিড়াইয়া ঝুপ্ করিয়া তীরে নামিয়া পড়াই সদ্যুক্তি স্থির করিল। মায়ের কোল ছাড়িয়া বাঘের পিঠে চড়িয়া পাহাড়ের গুপ্ত গুহায় রাজ-অট্টালিকার লোভ করিয়া তাহার কাজ নাই!

হিমুর এই বিদ্যা-শিক্ষায় আনন্দ-লাভের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত—অরুণ। ক্রমে ঠাকুরমার ঝোলা, বেঙ্গমার দেশ, নেকড়ে বাঘ ও শৃগালের রাজ্য পার হইয়া সে এখন রামায়ণ-মহাভারতে আসিয়া পৌঁছাইল। পরীক্ষা দিয়া অরুণ ফলের মুখ চাহিয়া বসিয়াছিল। এ সময় তাহারও সময়ের অভাব ছিল না। তা'ই পঠন ও পাঠন খুব উৎসাহের সহিতই চলিতেছিল। পাঠে অনুরাগ বাড়িয়াছিল বলিয়া হিমুর যে স্বভাবেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; এই পাঠ লইবার ও দিবার সময় সে অরুণকে সাধাইয়া বিরক্ত করিয়া তুলিত। আবার সে সত্য বিরক্ত হইলে ক্ষমা চাহিত, কাঁদিয়া অনর্থ বাধাইত। এই অত্যন্ত লঘু-প্রকৃতি মেয়েটিকে অরুণ তা'ই কোন-মতেই পর মনে করিতে পারিত না। মেয়ের আব্দার-বায়নার সমাধানে মাকেও অনেক সময় অরুণের প্রতি মনোযোগী হইতে হইত। স্বভাব-গুণে সে সকলেরই স্নেহ আকর্ষণ করিত। তা' ছাড়া জবরদস্তিতেও অনেক সময় তাহার পাওনার বেশী আদায় করিয়া লইত। মুক্তা ঠাকুরাণী "মেয়ে-ছেলের" এত "আহ্লাদেপনা" পছন্দ করিতেন না। তা'ই মালতী দেবীকে সাবধান করিয়া দিতে গিয়া বলিতেন, "রানু, ওর আখের নষ্ট করো না মা—অত আদর দিয়ো না। শেষে পস্তাতে হ'বে।" মালতী দেবী সজল স্নেহ-ভরা চক্ষে মেয়ের পানে চাহিয়া সুধু ম্লান হাসি হাসিতেন। এই একটুখানি আদর-আব্দারের সমাধান করা ছাড়া তাঁহার স্বর্ণ-প্রতিমাকে দিবার মত যে আর কিছুই তাঁহার ছিল না। এটুকুও সে চাহিয়া না পায় কেন? বিধাতা যদি ললাটে উহার দুঃখের ছবিই আঁকিয়া থাকেন, তাহা

হইলে সে ত তোলাই আছে,—যে কয়দিন সেটা চোখে না পড়ে, হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে পায়—সে কয়দিন তবু চোখ বুজিয়া কাটাইয়া দেওয়ায় ক্ষতি কি!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যতের চিন্তা

যথাসময়ে অরুণের পরীক্ষার ফল বাহির হইল। কাগজে দেখা গেল, সে পনেরো টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। গ্রামের পাঠ এইখানে তাহার শেষ হইল। এইবার তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। পাশের খবর শুনিয়া হিমু প্রথমে খুব খুসী হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিল—তুলসী-তলার মাটী খুঁড়িয়া তিন-মাস-পূর্ব্বে-পোঁতা পয়সাটি উদ্ধার করিয়া বাতাসা আনাইয়া হরির লুট দিল, তা'র পর অরুণের বিদেশ-যাত্রার কথা শুনিয়া মুখ ভার করিয়া কথা বন্ধ করিল, আড়ি দিল, পরে "ভাব" স্মরণ করিয়া ভাব করিতেও বিলম্ব হইল না। অনুনয় করিয়া সে কহিল, "কি-ই হ'বে খালি খালি অত পড়ে? তুমি এই খানে পাঠশালাটালা—কিছু করো না বাবু। যেতে হ'বে না তোমায় কোথাও।"

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "পুরুষ মানুষ মূর্খ হয়ে থাক্‌ব? লেখা-পড়া না শিখ্‌লে খাবই বা কি,—তা'ও ত চাই।"

হিমু এবার কল-ঝঙ্কারে কহিল, "বেশ ত বিদ্যে তোমার? লেখাপড়া শেখনি বই কি! অত ত গাদা গাদা শিখেচ। মুখ্যু হ'লেই হোল কি না? না বাবু, তোমাদের এ জঙ্গুলে দেশে আমি কক্ষনো একলা থাক্‌তে পার্‌ব না—তা' তোমায় কিন্তু স্পষ্টই বলে দিচ্চি।"

অরুণ হাসিল, কোন উত্তর দিল না। হিমু যে এতদিন সহরের নিন্দা করিয়া এই "জঙ্গুলে দেশেরই" স্তুতি গাহিয়া আসিয়াছে! এখানকার মেয়েদের স্বাধীনতার অর্থাৎ যথেচ্ছাচার-ভ্রমণের সুযোগের সুখ্যাতি

করিয়াছে! সে সব অতীত কথা স্মরণ করাইয়া অরুণ কিন্তু এতটুকু কলহের সৃ'ি করিল না। অরুণের অভাব-বোধ বালিকাকে কতখানি অসহায় করিয়া তুলিতেছে, এইটুকু বুঝিয়াই সে তাহার বেদনার মধ্যেও একটু বিমল আনন্দ অনুভব করিল। তাহার জন্য ভাবিবার, তাহার অভাব অনুভব করিবারও তবে এ সংসারে কেহ কোথাও রহিল!

হিমুর স্পষ্ট কথা সত্ত্বেও অরুণকে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। তাহার পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইলে আলোকনাথকে অব্যাহতি দিয়া সে তাঁহার সাহায্যগ্রহণ ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে না বলিয়া জানাইয়াছিল। সর্ব্বস্ব যে ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহার আর এ মুষ্টি ভিক্ষার প্রয়োজন কি? বাহিরে রাজধানীর বক্ষে সে কাজ জুটাইয়া লইবে। যেমন করিয়া তাহার ন্যায় দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারও সেইরূপ হইবে। কাজ কি আর পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা!

যাত্রা-কালে সে মুক্তাঠাকুরাণী ও মালতীকে প্রণাম করিলে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে পত্র দিতে অনুরোধ করিলেন। মালতী দেবী তাহাকে ছুটির সময় এখানে আসিবার কথা বলিলে, অরুণের দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল। মুখে সম্মতি জানাইতে না পারিয়া সে তা'ই মাথা হেলাইয়াই স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। হিমু তাহাকে মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "এসো অরুণদা' ছুটি হ'লেই কিন্তু এসো তুমি, একদিনও সেখানে দেরী করতে পা'বে না, তা' কিন্তু ব'লে দিচ্চি। পাশ হয়েছেন বলে বাবুর আর কথা শোনাই হোল না, বলুম, যেয়ো না—তা' হোল না—!" অরুণ হিমুর মাতার উদ্দেশে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিল, "আস্‌ব বই কি হিমু। মাকে বলো,—তাঁ'দের কাছ ছেড়ে ছুটি কাটাবার জায়গাও ত আমার নেই আর কোথাও—।"

আজ প্রথম হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সে তাহার অন্তরের প্রবল দৈন্য বাহিরে

প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে যে কত দীন—সে কথা জগতের কাছে প্রকাশ করিতেও সে অসমর্থ। মানুষের ক্ষত যেখানে গভীর, স্বভাবতঃই সে সেখানে সতর্ক। আপনার অজ্ঞাত জীবন-রহস্যের গভীর বেদনা তা'ই বুকের ক্ষতের মতই সে গোপনে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। সমবেদনার "আহা" টুকু সহিবার শক্তিও যেন তাহার কুলাইত না। সেখানে হিমুরও প্রবেশাধিকার ছিল না। অরুণের বাহিরের সদানন্দ ভাব দেখিয়া সকলেই প্রতারিত হইয়া মনে করিত, বুঝি অতীত জীবনের ন্যায় তাহার চিন্তাকেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। হিমু তাহার অশ্রুবদ্ধ গাঢ়স্বরে ব্যথিত হইল। তা'ছাড়া নিজের চোখের জল সাম্‌লাইতেই সে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অরুণের কথার মর্ম্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিল না, তা'ই সে বিষয়ে কোন তর্কও সে তুলিল না। দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া মালতী দেবীও বারবার আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, যদি উপায় থাকিত! হা ভগবান, এমন জিনিষ, এমন লোভের ধন হাতে পাইয়াও হারাইতে হয়! সমাজ ত ইন্দ্রনাথের দেওয়া ব্রাহ্মণের অধিকার তাহার কাড়িয়া লয় নাই। শুধু গোত্র পদবীর দাবী? সংসারের সেই কি সব! একমাত্র মেয়ের মুখ চাহিয়া এই গোত্রের দাবী তিনিও কি ছাড়িতে পারিবেন না? মালতী দেবীর মাতৃ-স্নেহ কহিল, এখনি তিনি তাহা ছাড়িতে পারেন। কিন্তু হিন্দু কন্যার সংস্কার কহিল—সে হয় না! তা' যদি সম্ভব হইত তবে অরুণ কেন—যে কোন জাতি হইতেই উপযুক্ত পাত্র বাছিয়া লইলে হয়ত অর্থাভাবে তাঁহার সুন্দরী মেয়ের বিবাহের ভাবনা ভাবিতে হইত না। সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার শক্তি তাঁহার ন্যায় অনাথার কি এতটুকুও সম্ভব? না— তা'ই উচিত? অপ্রাপ্য ভাল জিনিষটিতে লোভ করিতে গেলে চলিবে কেন?

নবম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়

জনারণ্য মহানগরীর মাঝখানে পড়িয়া অরুণ প্রথমটা যেন দিশাহারা হইল। এত বড় সহর, এত গাড়ী-ঘোড়া, মোটর-ট্রাম—এ-সব তাহার কল্পনারও অতীত, অভাবনীয় ব্যাপার! এই অট্টালিকা-সমুদ্রের মধ্যে বাসস্থান খুঁজিয়া লওয়া তাহার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে কেমন করিয়া যে সম্ভব হইতে পারে, সে যেন তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না। তাহার স্কুলের সহপাঠী-ইন্দুভূষণের সাহায্যেই সে এখানে অভিজ্ঞতা-লাভের ভরসা রাখিয়াছিল। কার্য্যকালে দেখা গেল, ব্যাপারটা যত কঠিন মনে হইয়াছিল—আসলে সেরূপ নয়। বরং পল্লীগ্রাম অপেক্ষা এ সকল বিষয়ে এখানে সুবিধাই বেশী। কেবল প্রকাণ্ড অসুবিধা একটা ছিল, সেটা পয়সার। এখানে সুবিধায় সবই মেলে তবে বড় বেশী মূল্য দিতে হয়! ভরসার মধ্যে ত তাহার জলপানির পনেরোটি মাত্র টাকা! ইহার উপর নির্ভর করিয়াই সে এই ব্যয়-বহুল উচ্চ শিক্ষালাভের আশায় দেশ ছাড়িয়া অজানিত স্থলে আসিয়াছে। লোকে হয়ত তাহার এই দেশ ছাড়ার কথা শুনিলে হাসিবে! কিন্তু যে দেশে হিমু বাস করে,—যেখানকার পথের ধূলা ইন্দ্রনাথের পদ স্পর্শে পবিত্র হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রতি ভালবাসা যে অরুণের প্রতি শোণিত-বিন্দুর সহিত মিশাইয়া রহিয়াছে! তিনি যদি তাহার জননী জন্মভূমি নাও হ'ন, তবু যে অরুণের জীবনমরুর শান্তি-নিকেতন,—তাহার প্রার্থনার কাম্য ম,—সে ভূ কিথা ত সে অস্বীকার করিতে পারিবে না?

উৎসাহহীন ভবিষ্যতের পানে চাহিয়াও তা'ই সে আনন্দোজ্জ্বল অতীতকেই স্মরণ করিতে থাকে।

ব্যাপারটা সেই চির-পুরাতন। উচ্চ শিক্ষার আশায় পূর্ব্ববর্ত্তী দরিদ্র সন্তানেরাও সকল দুঃখ সহিয়া যে ভাবে দিন কাটাইয়া গিয়াছে, অরুণের জন্য ভাগ্য তাহার কিছু ব্যতিক্রম করে নাই। তবু ইহাতেও বুঝি বিশেষত্ব বা নূতনত্ব কিছু ছিল। যাহারা জীবন-যুদ্ধে জয়লাভের আশায় বিদেশে আসিয়াছে, তাহারা দেশে, আত্মীয়-স্বজন, গৃহ, ভূমি কিছু না কিছু ফেলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অরুণের পিছনে তাকাইবারও কিছুই নাই!

কলিকাতার একটি ছাত্রাবাসের অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের একতলার একখানি ঘরে সে তাহার নূতন জীবন প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাতে বৈচিত্র্য ছিল না, আনন্দ ছিল না। তবু সে তাহার ধ্রুব লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য পূরা মাত্রায় পালন করিতে প্রস্তুত হইল। সময় সময় মনে হইত, পরীক্ষা-সাগর পার হইয়া সে তাহার জীবন-তরণীখানি কোন অনির্দ্দেশ উপকূলে ভিড়াইবে? আবার ভাবিতে বসিলে ভাবনার কূল ও পাওয়া যাইত না। তা'ই এ অনির্দ্দেশের ভাবনাকে সে বিভিন্ন চিন্তায় ডুবাইয়া রাখিত। ঘরখানি একতলায়—বায়ু ও আলোর অভাব সেখানে অনুমিত হইত—প্রচুর। স্যাঁৎ-সেঁতে মেঝে। তবু ইহার ভাড়া কম ও একটিমাত্র "সিট্" বলিয়া নির্জ্জনতাপ্রিয় অরুণ এই ঘরখানিই পছন্দ করিয়াছিল। পুরাতন তক্তাপোষের উপর সে তাহার কম্বল ও চাদরখানি বিছাইয়া পরিচ্ছন্ন শয্যাটি বিছাইয়া অনেক সময় তাহার উপর চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, আর বর্ত্তমানের ভাবনা ভাবিত।

আজও সে সেই কথাই ভাবিতেছিল। ঘরের ভাড়া, খাবার খরচ, কলেজের বেতন জমা দিয়া কেমন করিয়া যে সে তাহার প্রয়োজনীয় বইগুলির জোগাড় করিবে, তাহাই সে ভাবিতেছিল! আসিবার সময়

মুক্তাঠাকুরাণী তাহাকে বই কিনিবার জন্য কুড়িটি টাকা দিয়াছিলেন। তাহাতে কতটুকু অভাবই বা মিটিবে? তবু স্নেহময়ীর স্নেহের দানটি সে নিতান্ত অনিচ্ছায় কুণ্ঠিত হস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সত্যই যে তাহার বড় অভাব! আর এও যে তাহার প্রতি অযাচিত করুণা, ইহার কোনটাই ত এমন অবস্থায় তাহার ত্যজ্য নহে!

তখন ভরসার মধ্যে ইন্দ্রনাথের দেওয়া তাহার পৈতার সময়ের মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী আর তাহার জন্ম রহস্যের শেষ নিদর্শন একখানি স্বর্ণ পদক। এ ছাড়া নিজের বলিতে এমন কিছুই ছিল না, যাহা বিক্রয় করিয়া উপস্থিত অভাবের কথঞ্চিৎ দায়ও সে মিটাইতে পারে! হীরকাঙ্গুরীর মূল্য সে জানে না, হয়ত বেচিতে গিয়া ঠকিয়া আসিবে। অথবা চোরাই মাল বলিয়া পুলিসের হাতে ধরা পড়িবে—দুইটাই ঘটা সম্ভব! এখানকার অবস্থা-ব্যবস্থা কিছুই ত তাহার জানা নাই। অরুণ দেখিয়াছে, প্রাইভেট টিউসনী করিয়া অনেক ছেলেই নিজের বাসা-খরচ চালাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার জন্যও সুপারিশ চাই। কে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া গৃহ-শিক্ষকের পদ দিবে! তাহার পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু কেহই নাই। ইন্দুভূষণ নিজেই একজন উমেদার,—তাহার নিকট সাহায্য পাইবারই বা আশা কোথায়? কেমন করিয়া যে সে তাহার দারুণ অভাবের বোঝা কোথায় নামাইবে বিষণ্ণ চিত্তে তাহাই ভাবিতে ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্ধু লাভ

ক্লাশে একটি ছেলের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল। ছেলেটির নাম জলদকান্তি। নামের সহিত তাহার চেহারার কোন সামঞ্জস্যই ছিল না। ছিপ্‌ছিপে একহারা গঠনের স্নিগ্ধ গৌর-কান্তি নাতিদীর্ঘ ছেলেটিকে দেখিলে ঘনঘোর বর্ষা-মেঘের পরিবর্ত্তে সকাল বেলার কৌতুক-হাস্যোজ্জ্বল নর্ত্তনশীল রৌদ্র-রেখাটিকেই যেন বেশী করিয়া মনে পড়ে। ছেলেটি গায়ে পড়িয়া সাধিয়া আপনি আলাপ করিয়াছিল। অরুণ যে মেসে বাসা লইয়াছিল, সে তাহার খান তিন-চার বাড়ীর পরে থাকিত। ক্লাশে অনেকের সঙ্গেই তাহার আলাপ ছিল। আলাপ করিবার শক্তি তাহার যেমন অসাধারণ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার ক্ষমতাও তেমনি তাহার অনায়াস-লভ্য। তাহার ঠাট্টাবিদ্রূপে ছেলেদের কাছে সে এমনি সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল যে এখন আর সে সব ব্যঙ্গবিদ্রূপে কেহই রাগ করিতে পারে না, করেও না। এই নূতন বন্ধুটিকে অরুণের বড় ভাল লাগিয়াছিল। তবু নিজের সঙ্কোচপূর্ণ স্বভাবের জন্য অল্পদিনের বন্ধুত্বে সে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বন্ধুর হাতে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে নাই। তাহার মনের অভাব যত বড়ই হউক্, বাহিরের অভাবও যে কতখানি সে কথাও সে লজ্জায় কাহাকেও জানাইতে পারিতেছিল না। অথচ কোন একটা উপায় না করিলেও নয়। বিছানায় পড়িয়া সে এই নূতন বন্ধুটির কথাই তখন ভাবিতেছিল। মনে হইল, জলদকে সে তাহার অভাবের কথা জানাইয়া কোন একটা ছেলে পড়ানোর কাজ যদি যোগাড় করিয়া লইতে পারে,

তবেই সুবিধা হয়। সঙ্কোচ কিন্তু মাথা নাড়িয়া বাধা দিল—না, কাজ নাই! কি জানি, বন্ধু যদি মনে করেন, বন্ধুত্বের ভাণ কেবল স্বার্থলাভের পন্থা! সেই বা তাহাকে কতটুকু চিনিয়াছে? আরও একটি ছেলের সহিত অরুণের আলাপ হইয়াছিল,—এ ছেলেটির নাম প্রফুল্ল। ক্লাশে খুব ভাল ছেলে বলিয়া ইহার সুনাম ছিল। হিন্দুস্কুল হইতে কম্পিট করিয়া, স্কলারশীপ লইয়া সে গত বৎসর পাশ করিয়াছে। প্রফুল্লর বন্ধুত্ব অনেকেই কামনা করিত। কিন্তু সে নিজে স্বেচ্ছায় কাহারও সহিত মিশিতে চাহিত না। তাহার তরুণ মুখে গাম্ভীর্য্যের ছাপ পড়িয়াছিল। কথাও সে সাধারণতঃ খুব অল্পই কহিত। যেখানে 'হাঁ', বা 'না' বলিলে চলিত, সেখানে সে দ্বিতীয় কথা ব্যবহার করিত না। সর্ব্বদা যে লেখাপড়া লইয়াই সে থাকিত, এমন নয়। তবু সকলের সহিত একত্র থাকিয়াও সে যেন সকলের কাছ হইতে দূরে থাকিত। ছেলেরা তাহাকে ভাল বাসিত, ভয়ও করিত। পড়াশুনার জন্য কেহ তাহার সাহায্য চাহিলে সে খুসী হইয়াই তাহাকে পড়া বলিয়া দিত। ব্যস! তা'রপর আর কোন সংস্রব সে রাখিত না। প্রফুল্লকে শিক্ষকেরাও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। পরচ্ছিদ্রান্বেষী দুষ্ট বালকেরা ইচ্ছা থাকিলেও তাহার সহিত শত্রুতা করিতে পারিত না। তবু এই ছেলেটিকে উপলক্ষ্য করিয়া দুইটি দল গঠিত হইয়াছিল। এক দল তাহার স্বপক্ষে—অন্য দলটি বিপক্ষে। যাহাকে লইয়া দল,—সে কিন্তু কোন দলেই যোগ দিত না; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজের কার্য্য করিত, অল্প সল্প সকলের সহিতই মিশিত। নিজের চারি ধারে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের গণ্ডী রচনা করিয়া সে বাস করিত, যেখানে তাহার মনের নাগাল কেহই পাইত না। অরুণের সে এক ক্লাশ উপরে পড়ে, বয়সেও কিছু বড়।

এই ছেলেটিকে প্রথম দর্শনেই অরুণের বড় ভাল লাগিয়াছিল। সে

তা'ই সকলের দিক হইতে চোক ফিরাইয়া লইয়া বার বার ইহারই পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। দু'এক বার দুইজনের দৃষ্টি-বিনিময়ও হইল। অরুণ নিজের দৈন্য স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আলাপ করিতে সাহসী হইল না, চোখ নামাইয়া লইল। কিন্তু সুযোগ আপনা হইতেই সুলভ হইয়া দেখা দিল।

সেদিন কি-একটা ব্যাপার উপলক্ষে ছেলের দল ক্লাশের বাহির হইয়া কেহ বেড়াইতে ছিল, কেহ গল্প করিতেছিল। আবার ফার্ষ্ট ইয়ারের কতকগুলি গুণ্ডা ছেলে পরস্পরের সহিত কলহ বাধাইয়া তামাসা দেখিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। নবাগত অরুণ এ সমস্ত দলের কোনটিতেই যোগ না দিয়া বাহিরে একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া নিজ পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া পড়িতেছিল। তাহার হাত কয়েক দূরে কতকগুলি আমোদ-প্রয়াসী ছেলে একটি নূতন ছেলেকে লইয়া তখন গম্ভীর ভাবে রহস্য চালাইতেছিল। নূতন ছেলেটির বাড়ী বীরভূম। তাহার ভাষায় যথেষ্ট জড়তা ছিল, ইহাই তাহার অপরাধ। প্রথমটা সহপাঠিদের দুষ্ট মতলব সেও বুঝিতে পারে নাই, তা'ই সরলভাবে তাহাদের কথার উত্তর দিতেছিল; এবং ছেলের দল তাহার কথার সুরের উপর জোর দিয়া তাহাকে সমর্থন করার ভঙ্গীতে পরস্পরের পানে চাহিয়া হাসিয়া কৌতুকের ইঙ্গিত করিতেছিল। যেন এমন বেকুব তাহারা জন্মে আর কখনো দেখে নাই! এ বড় একটা মজার জানোয়ার! ছেলেটির নাম জগন্নাথ, পদবী নন্দন। এ তত্ত্ব পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়া রসিক কমলা লেবুর খোসা ছাড়াইতে গিয়া তাহাকে শুনাইয়া অথচ তাহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া কহিল, "হ্যাঁ হে ধীরু, জগন্নাথের নন্দনটি কে, বল্ দেখি ভাই? পুরাণ টুরাণে ত কই এঁর কোন খোঁজ-পাত্তা পাওয়া যায়নি। হঠাৎ ভুঁইফোড় রূপে এঁর আবির্ভাব দেখি যে!"

ধীরু ওরফে ধীরেন্দ্র নামোচিত ধীরতা রক্ষা করিয়া মিহি সুরে জবাব

দিল, "মা—যা-ছিলেন, মা যা-হয়েচেন—মা যা-হবেন। নন্দনটি এখনো জন্মায় নি, মনে হচ্চে।" সতীশ পরমভক্তির অভিনয়ে মাথা নোয়াইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিল, "বাবা জগড়নাথ চড়নে গড় হঁউচি।"

ছেলের দলে একটা হো হো হাসির কলরব উঠিল। সত্যব্রত জমীদারের ছেলে। মনে তাহার ধন-গর্ব্বও বিলক্ষণ ছিল। সে সাধারণ দলে না মিশিয়া একটু তফাতে থাকিত। শান্তিপুরে ধুতির উপর ঢাকাই মস্‌লিনের চুড়িদার পাঞ্জাবী ঝুলাইয়া সর্ব্বদাই ফিট্‌ফাট হইয়া আসিত। মাথায় সিঁথি, বাঁ হাতে সোনা-বাঁধান রিষ্ট ওয়াচ। চোখে সোনার চশমা। চেহারাটিও সুশ্রী—রোগাটে লম্বা গড়ন, ফর্‌শা। চুলগুলি পাতলা ও ধূসর রঙের হইলেও নরম—ঢেউ খেলানো থাকায় মুখখানি মানাইত বেশ। সে এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া আড় চোখে চাহিয়া বেচারী নন্দনের দুরবস্থা দেখিতেছিল ও মনে মনে হাসিতেছিল। এই ছেলেটির গর্ব্বিত ভাব ও গম্ভীর মুখ সহপাঠি-দলের চক্ষুশূল হইলেও এই পরম ধৈর্য্যশালী মানুষটিকে কেহ কখন রাগাইতে বা তাহার গাম্ভীর্য্যের একচুল বাহিরে আনিতে পারিত না। আজ এমন একটা সরস আয়োজনে যোগ না দিয়া সে নিজ স্বাতন্ত্র রক্ষা করায় রসিক মনে মনে ভারি চটিয়া গেল। নন্দনকে কাঁদ-কাঁদ দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া সত্যব্রতর প্রতি মনোযোগী হইল, কহিল, "ও মশাই, এদিকে আসুন।" ডাক শুনিয়া সত্যব্রত গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে দলের কাছে আগাইয়া আসিল। সত্যব্রত রসিকের মেসের ত্রিতলের বাসিন্দা। মেসের সব কিছু লইয়া রাতদিন খুঁত খুঁত করা তাহার স্বভাব, রসিক তাহা জানিত। সে কহিল, "আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনার এ কলেজের মেসটা অত্যন্ত সাদাসিদে নয়!" কণ্ঠস্বরে তাহাকে অনুকরণ করিয়া তেমনিই অলস ভঙ্গীতে সতীশ কহিল, "ভারী সাদাসিদে আর নোংরার এক শেষ।" সত্যব্রত পরিহাস না বুঝিয়া কহিল, "ছেলেদের জন্য একটা

চাহিয়া হাসিতে লাগিল। লজ্জিত ও অপ্রতিভ হওয়ায় অরুণের মুখখানা সকালবেলাকার অরুণের মতই লাল হইয়া উঠিল। ছেলেরা যে তাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে ইহা বুঝিয়া সে ব্যথিতও হইল—মনে হইল, গরীব বলিয়াই তাহার প্রতি এ আক্রমণ। সত্যব্রতের ক্ষণঃপূর্ব্বেকার দুরবস্থা সে লক্ষ্যও করে নাই, করিলে এ ভ্রম তাহার জন্মিত না।

এমন সময় প্রফুল্ল আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার কয়েকখানি এক্সার্‌সাইজবুক। সে বোধ হয় খাতা কিনিতেই বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় সপ্তরথী-বেষ্টিত বিপন্ন বিব্রত অভিমন্যুর অবস্থাপন্ন অরুণকে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ ব্যাপার বুঝিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

এক একটা মানুষের মধ্যে কেমন এক প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য থাকে, যাহাতে অনিচ্ছাতেও লোকে তাহাকে ভয় করে। প্রফুল্ল ছেলেটিকে সহপাঠিদলে মনে মনে একটুখানি যে ভয় করিত—সে কথা আগেই বলিয়াছি। তাহার আবির্ভাবে ছেলেদের দল নিমেষে ভাল মানুষের মত যে যাহার কাজে ব্যস্ত হওয়ায়—অরুণ কৃতজ্ঞ চোখে পরিত্রাতার পানে চাহিয়া দেখিল। তাহার ভয় হইতেছিল—এখনি যদি উহারা তাহার বংশের বিবরণ শুনিতে চায়। আত্ম-পরিচয় দেওয়াই যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ।

প্রথম আলাপেই প্রফুল্ল এমন সহজ ও সঙ্কোচহীন ভাবে তাহাকে কহিল, "আসুন, ক্লাশে গিয়েই একটু গল্পস্বল্প করা যাক্—" যে অরুণ এতটুকু দ্বিধা না করিয়া খুসী-মনেই তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

সেদিন ক্লাশের ঘণ্টা পড়িবার পূর্ব্বেই প্রফুল্লর সহিত পড়াশোনা সম্বন্ধেই অরুণের অনেক কথা হইয়া গেল। অরুণ দেখিল, প্রফুল্লর পাণ্ডিত্য, তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, বহিঃ-সংসারের জ্ঞান তাহার চেয়ে অনেক বেশী। সে বিস্তর বই পড়িয়াছে। সম্প্রতি সে জার্ম্মান্ শিখিতেছে।

ফ্রেঞ্চ লাটিন প্রভৃতি আরও কিছু কিছু শিখিবার তাহার ইচ্ছা আছে। এ সব তত্ত্ব অবশ্য একদিনেই অরুণের আয়ত্ত হয় নাই, ক্রমে হইয়াছিল। তবে সেই দিনই প্রফুল্ল অরুণকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

ক্লাশে ধীরেন্দ্রকে একটা ধাক্কা দিয়া রসিক হাসিয়া কহিল, "বেড়া নীচু দেখ্‌লেই মানুষের ডিঙুতে সাধ যায়। প্রভুত্বের নেশা এমনি!" বলিয়া সে পর পর প্রফুল্ল ও অরুণের পানে চাহিয়া রসিকতার ভাবে মুচ্‌কিয়া হাসিল। তাহাদের দলের মধ্যেও একটা চাপা হাসির হিল্লোল অর্দ্ধব্যক্ত-রূপে বহিয়া গেল। প্রফুল্ল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও অরুণের চোখে তাহা এড়াইয়া গেল না। লজ্জায় ও সঙ্কোচে তাহার মুখ আবার রাঙা হইয়া উঠিল।

কিশোরী বিনয়ের পানে চাহিয়া অরুণকে শুনাইয়া মৃদু-কণ্ঠে সুর করিয়া আবৃত্তি করিল,

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা—
একান্ত সঙ্কোচভরে, একধারে আছে সরে,
ছুঁয়ো না উহারে কেহ—রাখ মোর কথা।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

মাষ্টারি

প্রফুল্ল মেসের দোতলার ঘরে থাকে। লোকের সহিত মেলা-মেশা তাহার খুবই কম। অরুণের সঙ্গেও তাহার সর্ব্বদা দেখা হইত না। কলেজেও সে ভিন্ন-ক্লাশের ছাত্র। তা'ই "ইচ্ছা-সত্ত্বেও অরুণ তাহাকে বড় বেশী কাছে পাইত না; তবু যেটুকু পাইত, সেই সময়টুকুর জন্যই সে উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিত। প্রফুল্লর গম্ভীর দূরত্ব-ভাব যাহা সাধারণের নিকট হইতে তাহাকে তফাতে রাখিত—অরুণের কাছে তাহাই যেন সমধিক আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জলদকে সে যেমন সম্পূর্ণ কাছে পাইয়াছিল, প্রফুল্লকে তেমন পায় নাই। আবার পায় নাই বলিয়াই যেন তাহার আকর্ষণও তাহার কাছে এত অধিক মিষ্ট লাগিত। জলদকে সে শুধু ভালবাসিত; প্রফুল্লকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত, আবার ভয়ও করিত। কোন কিছু অন্যায় কাজ করিতে লোকে অভিভাবককে যেমন ভয় করে, নিজের সামান্য কোন ত্রুটি বা পড়ার কোন ভুল প্রমাণ হইলে অরুণ প্রফুল্লর কাছে তেমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। সে বুঝিত, প্রফুল্লও তাহাকে ভাল বাসিতে সুরু করিয়াছে। তবু দুইজনের মাঝখানে কি-একটা ব্যবধানের দেওয়াল যেন সর্ব্বদাই মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কেহ কাহারো মনের নাগাল সম্পূর্ণরূপে পাইত না।

অরুণ ইহাতে দুঃখ পাইত, কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ও খুঁজিয়া পাইত না। সে মনে করিত, তাহার দুর্ভাগ্য জীবনই এ বৈষম্যের মূল।

প্রফুল্ল আপনা হইতে কোনদিন তাহার বাড়ীর খবর কিছুই জানিতে চাহে নাই। অরুণও কৌতূহল চাপিয়া রাখিয়া এ বিষয়ে বন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিত। প্রফুল্লকে এখন সে 'দাদা' বলিতে সুরু করিয়াছে। দাদা বলিয়া ডাকিয়া সে তৃপ্তি পাইত। আগা-গোড়া সারা জীবনটাই যে তাহার 'পাতানো' সম্পর্ক লইয়াই গঠিত! তবে দাদা ডাকের ক্ষোভটুকুই বা থাকিয়া যায় কেন! প্রফুল্লও যে ইহাতে খুসী হইয়াছিল, সেটা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত। অরুণকে সে যথার্থই ভাইয়ের মত স্নেহ করিত। তাহার পাঠের উন্নতির জন্য যত্ন লইত; বাছিয়া বাছিয়া নিজের দুই-একখানি ভাল বইও পড়িতে দিত। দুইটি অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়া অরুণের বর্ত্তমান জীবন বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে সে ভয় পাইয়াছিল, কেমন করিয়া নীরস কর্ম্মক্ষেত্রে দিন কাটাইবে—সেজন্য ভাবনাও হইয়াছিল। জলদ ও প্রফুল্লর বন্ধুত্বে তাহার উদাসীন চিত্ত ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল। প্রফুল্ল বলিয়াছিল, সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন জ্ঞানানুশীলনেই কাটাইবে। সংসারী সাজিয়া সংসার-ধর্ম্ম করা তাহার আদর্শ নয়!

কথাগুলি অরুণের ভাল লাগিয়াছিল। সে যেন তাহার কুহেলিকা-চ্ছন্ন জীবনের গতি খুঁজিয়া পাইল! সেও কেন এই আদর্শই গ্রহণ করুক না! সংসারের সহিত দেনা-পাওনা না রাখিয়া সন্ন্যাসীর কঠোরতা না সহিয়াও যদি আনন্দময় জীবন-যাত্রার পথ পাওয়া যায় ত তাহাতে ক্ষতি কি? এই ত ভাল। অরুণ মনে মনে সেই দিনই প্রফুল্লকে গুরু-পদে বরণ করিয়া লইল।

ঘরের দরজা আধখানা ভেজানো ছিল। বাকী অংশ দিয়া বাহিরের কতকটা দৃশ্য অরুণের চোখে আসিয়া পড়িতেছিল। সিঁড়ি দিয়া কত লোক উঠা-নামা করিতেছে; কেহ-বা তাহার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়াও

যাইতেছিল। অরুণের ইচ্ছা হইতেছিল, উঠিয়া দোরটা ভেজাইয়া দেয়। কিন্তু আলস্যবশতঃ তাহা আর ঘটিয়া উঠিতে ছিল না।

ঘরখানির দেওয়াল হইতে ভাঙ্গা ডেস্কটি পর্য্যন্ত এ গৃহের পূর্ব্বাধিকারীর স্থপতি-বিদ্যার প্রতি ভগীর অনুরাগের যতই পরিচায়ক হউক, পরিচ্ছন্নতার প্রতি যে তাহার তিলার্দ্ধ অনুরাগ ছিল না, তাহা ঘরের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইত। দেওয়ালের গায়ে পানের পিক্। চারিদিকে পেরেক পুঁতিয়া আবার তাহা তুলিয়া লওয়ায় বহুস্থলে গর্ত্ত হইয়াছে—টেবিলের উপর কালিঢালার চিহ্ন বিদ্যমান। উপস্থিত উত্তরাধিকার-সূত্রে অরুণ যে কব্জা-ভাঙ্গা বার্ণিশচটা কাঠের ডেস্কটি পাইয়াছে, তাহার ভিতর হইতেও আবর্জ্জনার রাশি সলজ্জে বাহিরে উঁকি দিয়া উহার সত্ত্বাধিকারীর অমনোযোগিতার প্রমাণ দিতেছিল। ডেস্কটির ভিতর এখনও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা কোন কলেজে-পড়া জেণ্টল্‌ম্যানের ডেস্কের ভিতর থাকা উচিত ছিল না। পূর্ব্বাধিকারী দেওয়ালে কত অসংখ্য কীট-পতঙ্গ সরীসৃপ লতা-পুষ্প দেব-দেবীর নাম, কবিতার অর্দ্ধচরণ, আরও কত কি যে আঁকিয়া ও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে—তাহার আর সংখ্যা নাই! টেবিলে ছুরি দিয়া খুদিয়া নিজের নাম-ঠিকানা অধিষ্ঠান ও তিরোধানের সাল-তারিখটি পর্য্যন্ত লেখা থাকায় দেওয়ালে চূণ ফিরাইলেও যে পরবর্ত্তী অধিবাসীকে তাহাকে স্মরণে রাখিতেই হইবে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল।

এই বিচিত্র গৃহসজ্জার পানে চাহিয়া অরুণ নিজের ভাগ্য চিন্তা করিতেছিল। দরজার বাহিরে জুতার শব্দের সহিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "অরুণবাবু জেগে না ঘুমিয়ে? আস্‌তে পারি?"

স্বর শুনিয়াই অরুণ বুঝিল, আগন্তুক জলদ। "এস" বলিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। জলদ ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই গলির দিকের

জানালাটি খুলিয়া দিল। অল্প-পরিসর স্থান, তবু কাঠের তক্তা-মারা ছোট জানালাটি খুলিয়া দিতেই ঘরের মধ্যে একটু আলো ও বাতাস প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ চাহিয়া দেওয়ালের হুকে টাঙ্গানো তালপাতার ছোট পাখাখানি পাড়িয়া আনিয়া এইবার সে তক্তাপোষের উপর অরুণের পাশেই কায়েমিভাবে স্থান গ্রহণ করিল। বার-কতক পাখা নাড়িয়া হাওয়া খাইয়া জলদ কহিল, "আঃ, বাঁচা গেল। আচ্ছা অরুণবাবু, এমন সময় জানালা এঁটে ঘরে শুয়ে যে! অসুখ-বিসুখ করেনি ত কিছু?"

অরুণ কহিল, "এইবার উঠ্‌ব-উঠ্‌ব ভাব্‌ছিলুম। জানালাটা—ওটা বন্ধই ছিল কি না, আর খোলা হয়ে ওঠেনি—"

জলদ কহিল, "দেখ, তোমার কাছে আমি একটা দরকারেই এসেচি। মনে করেছিলুম, হয়ত তুমি এতক্ষণে বেরিয়ে গেছ, বাসায় এখন তোমায় পা'ব না, আবার সন্ধ্যার পর আস্‌তে হ'বে, কিন্তু তোমায় অনেক ধন্যবাদ যে এই দুর্জ্জয় গরমে বাহিরে না গিয়ে, বন্ধ ঘরে শুয়ে থেকে আমার পরিশ্রমটি তুমি বাঁচিয়ে দিয়েচ!" বলিয়া সে মৃদু হাসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে পুনরায় কহিল, "যদি কিছু মনে না কর, তা'হলে একটা কথা বলি।" তাহার সঙ্কোচপূর্ণ ভাব দেখিয়া অরুণ বিস্মিত হইল। এমন কি কথা, যাহা বলিতে এতটা সঙ্কোচ আসে? জলদ তাহার কাছে টাকা ধার চায় না কি? অরুণের ত এই দুটি সঙ্কোচের হেতুই জানা আছে—এক, বংশের পরিচয় লওয়া; আর এক—অর্থ প্রার্থনা করা! তবে অরুণের মত দুর্ভাগা কিছু জগতে অনেক নাই! টাকা ধার চাহিতে, প্রয়োজন হয়ত ভিক্ষা করিতেও অনেককেই হয়। কিন্তু পিতৃ-পরিচয় জানে না—এমন হতভাগার সংখ্যা অল্পই। মনের চিন্তা মনে চাপিয়া সে কহিল, "বল।"

জলদ কহিল, "কথা এমন কিছু নয়—পিশে মশাই আমায় ভারী মুস্কিলে ফেলেচেন। তাঁর ছোট দুটি নাতি-নাত্‌নীকে পড়াবার জন্যে

একজন মাষ্টার চাই। বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক জোগাড় করা তাঁর পছন্দ নয়। অথচ জানা-শোনা লোক চাই। আমার উপর পড়েছে খুঁজে দেবার ভার। এক মাস ধরে ভাই, তাঁকে ত স্তোক দিয়ে রেখেচি, খুঁজ্চি-খুঁজ্চি করে—কিন্তু আজ একেবারে তিনি নাছোড়বন্দা, আর কোন কথাই শুনবেন না। তাঁর নাতি-ন'ত্নী ভারী বে-শায়েস্তা হয়ে উঠ্চে। একে ত ঠাকুমার আদর, তার উপর পড়া-শোনা মোটে নেই। একেবারে বনমানুষ হয়ে যাচ্চে। হাস্চ যে—তাঁর ব্যাখ্যা-মতই আমি বল্চি। তুমি যদি দিন-কতকের জন্যও অন্ততঃ তাদের গুরুগিরি করে দেখ, তাহলে সময় পেলে আমি খুঁজে পেতে তখন অন্য কাকেও দেখ্তে পারি। বুনোছুটো আমায় যে একটুও মানে না, নৈলে আমিই না হয় কিছু দিন চালিয়ে নিতুম।—অসুবিধে হবে কি বেশী—?" বলিয়া জলদ উত্তরের আশায় অরুণের মুখের পানে চাহিল।

বন্ধুর এই অযাচিত অনুগ্রহে তাহার সহৃদয়তারই প্রমাণ পাইয়া কৃতজ্ঞতায় অরুণের চোখে জল আসিল। আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া মৃদু-স্বরে সে কহিল, "মনে মনে কাজ ত আমি খুঁজ্ছিলুম। অসুবিধা বোধ কল্লে চল্বে কেন? বরং তোমার নিজের হতে—"

জলদ বাধা দিয়া কহিল, "শুভস্য শীঘ্রম্! উঠে পড় তাহলে, আজই ও হাঙ্গামাটা মিটিয়ে দিয়ে আসা যাক্।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রিয়নাথ বাবু

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া অরুণের মনটি বেশ প্রফুল্ল হইয়া রহিল। কাল সন্ধ্যায় সে জলদের সহিত গিয়া নূতন কার্য্যে বাহাল হইয়া আসিয়াছে। কাজটি তাহার বেশ পছন্দও হইয়াছিল। বাড়ীর কর্ত্তা প্রিয়নাথ বাবু মানুষটিকে ভাল লোক বলিয়াই অরুণের ধারণা হইয়াছিল। তাহার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর হওয়াই সম্ভব। কাঁচা-পাকা চুল। গোঁফেও পাক ধরিয়াছে। দাড়ি কামানো। রংটি কাঁচা সোনার মত। গঠন দোহারা,—কোমলতাময়। মুখে গুড়গুড়ির নলের সহিত হাসিটি সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। মন খোলা, সদানন্দ পুরুষ—পূর্ব্বে ডেপুটি ছিলেন, বছর খানেক হইল পেন্‌সন লইয়া বাড়ী আসিয়া বসিয়াছেন। গৃহে স্ত্রী ও দুটি পৌত্র-পৌত্রী! পুত্র পাবনার মুন্‌সেফ। তাঁহারা নাতি-নাত্‌নীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াও বটে, তা ছাড়া বাহিরে বাপের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইলে পড়াশোনার ক্ষতি হয় এ কারণেও, বড় ছেলে-মেয়ে দুটি পিতামহের কাছে ও ছোট দুটি বাপ্-মার কাছে থাকিত। অরুণ এই ছেলে-মেয়ে-দুটির গৃহ-শিক্ষকের অধিকার পাইল।

ছেলেটির বয়স ছয় বৎসর; মেয়েটির বয়স আন্দাজ বারো হইবে। মেয়েটির নাম বরুণা। উপন্যাসের নায়িকার ন্যায় অনুপমা সুন্দরী না হইলেও সুশ্রী বলা চলে। বসন্তের কচি পাতার মত কোমল শ্যামল লাবণ্

শ্রী মণ্ডিত। বালিকার সুগঠিত ক্ষীণ তনুখানি দেখিলে কালিদাস-বর্ণিত সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার কথাই মনে পড়ে। ইহাকে প্রথম দর্শনে অরুণ একটু কুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের আলাপেই বুঝিল, কুণ্ঠার কোন কারণই বর্ত্তমান নাই। মেয়েটি দেখিতে একটু বাড়ন্ত হইলেও আসলে একটি পাঁচ বছরের মেয়ের মতই মনটি তাহার সরলতায় ভরা। ছাত্র প্রদ্যুম্ন হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ, সদা-চঞ্চল সদা-সহাস্য মুখ। এক ঘণ্টার মধ্যেই সে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত প্রগাঢ় সখ্য করিয়া ফেলিল। দাদামহাশয়কে জানাইয়া আসিল, এবারকার মাষ্টার মহাশয় খুব ভাল। ইঁহার সহিত সে খুব শিষ্ট ব্যবহার করিবে; এবং পূজার পূর্ব্বে লেখাপড়ায় দিদিকে ছাড়াইয়া গিয়া বাবা আসিলে তাঁহাকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিবে।

মাষ্টারের বয়স এত অল্প দেখিয়া গৃহিণী মহেশ্বরী দেবী কেবল একটুখানি অপ্রসন্ন হইয়া আপত্তি তুলিয়াছিলেন। মেয়ে 'ডাগর' হইতে চলিয়াছে—এখন কি আর এমন ছেলে ছোক্‌রা মাষ্টার রাখা ভাল? যদি মেয়েকে "নিলেবতী" করিবারই এত সখ, তবে দেখিয়া শুনিয়া একটি বুড়া সুড়া-গোছ পণ্ডিত রাখিলেই ত ভাল হইত! জলদের কাছে তাড়া খাইয়া শেষে তাঁহাকে চুপ করিতে হইল। প্রিয়নাথ বাবু গুড়গুড়ির নল হইতে মুখ সরাইয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "খুকীর জন্য ভাব্‌চ! রামঃ! ও ত বাচ্ছা! আহা, ছেলেটিকে দেখেই কিন্তু কেমন মায়া হচ্চে—থাক্! জলদ বল্‌ছিল, ওর অভাব নাকি বড্ড।" ইহার পর গৃহিণীও আর কোন আপত্তি তুলিলেন না।

পরের সপ্তাহে জলদ পিশিমার মুখে শুনিল, মাষ্টারটি ভাল। মুখ দেখিলেই মায়া হয়।

জলদ দুষ্টামি করিয়া বুড়া পণ্ডিত মহাশয়কে আনিয়া দিতে চাহিলে গৃহিণী কহিলেন, "বাপ্‌রে, তা কি হয়! বিনি-অপরাধে এক জনের অন্নে

হস্তারক হতে আছে কি? ও যদি নিজে থেকে যেতে না চায় ত আমার খোকা-খুকীদেরই সামিল হয়ে থাক্‌বে।"

জলদ পিশিমাকে চিনিত। এ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হিমুর কথা

অরুণ চলিয়া গেলে হিমুর প্রথমটা ভারী কান্না পাইতেছিল। মা-দিদিমার চোখ এড়াইয়া সে তা'ই ঘুরিয়া আসিয়া অরুণের পরিত্যক্ত বাহিরের ঘরখানির শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। আজ সে ঘরে খালি তক্তাপোষ ছাড়া আর কোন-কিছুই ছিল না। তক্তাপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রথমে সে খুব খানিকটা কাঁদিয়া লইল; কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে অরুণের উপর অনেক রকম করিয়া রাগ করিল। ছুটিতে সে বাড়ী আসিলে কি উপায়ে তাহার সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাহার মনে আঘাত দিয়া তাহাকে জব্দ করিবে, তাহারও একটা 'খস্ড়া' তৈয়ার করিয়া ফেলিল। তা'রপর উঠিয়া চোখ মুছিয়া সে ঘরের বাহির হইল। ছেলেমানুষের মনের বেদনা যেমন গভীর, তেমনি ক্ষণস্থায়ী! শীঘ্রই তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া সে যখন কেবল অরুণের স্মৃতি-চিহ্নই দেখিতে লাগিল, তখন মনে হইল, 'আড়ি' না দিয়া অরুণ ফিরিয়া আসিলে এবারকার মত না হয় 'ভাব'ই বজায় রাখিবে। উপস্থিত কাল সকালে ঝি যখন বাজারে যাইবে সে তাহাকে একখানি পোষ্টকার্ড কিনিয়া আনিতে বলিবে; এবং তাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসার জন্য অরুণকে লিখিয়াও দিবে। মা গো, এমন বুনো দেশে কি একা-একা মানুষ কখনো থাকৃতে পারে? মা বলেন, "পাড়ায় কি আর ছেলে-মেয়ে নাই? সঙ্গীর অভাব কি!" তারা ত সব সঙ্গী! উহারা কি অরুণের মত ভাল! না,

শুধু উহাদের সহিত রাতদিন খেলিতেই কাহারো ভাল লাগে? আর সে কি এখন বড় হইতেছে না, যে এখনো রাতদিন কেবলই খেলিয়া বেড়াইবে? লেখাপড়া না করিলে মানুষ মূর্খ হইয়া থাকে, পৃথিবীর কোন কিছু ভাল জিনিষই জানিতে বা শিখিতে পারে না। অবশেষে তাহাকেও সেই মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে? কেই বা আর তাহাকে পড়া বলিয়া দিবে, কেই বা লেখা শুধ্‌রাইবে? মা ত এ-সব কিছুই বোঝে না। কিছুদিন মনের বৈরাগ্যে সে খেলাধূলা ছাড়িয়া খুব মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিল। অরুণকে এবার চমৎকৃত করিয়া দিতে হইবে। তাহার হাতের অক্ষর দেখিয়া অরুণ যেন মনে করিতে পারে যে—হাঁ, হিমুরও মাথা আছে, বুদ্ধি আছে, সেও বোকা নয়।

অরুণকে সে প্রথম যেদিন চিঠি লিখিল, সেদিন সারা সকাল বেলাটাই তাহার ঐ একখানি পোষ্টকার্ড লিখিতেই কাটিয়া গেল। তবু অনেক যত্নে লেখা অক্ষরগুলি ঠিক মনের মতও হইল না। চিঠিতে কথা বড় বেশী কিছু ছিল না; অক্ষরগুলির ছাঁদ হিমুর যত মনের মতই হউক, আকারগুলা মোটেই তাহার পছন্দ হইল না। হিমুর মনের সব কথাই তাই অপ্রকাশিত রহিয়া গেল। শুধু ছুটি হইলেই অরুণ যেন চলিয়া আসে, এই একটিমাত্র অনুরোধই করা হইল—দুই-তিন দফায়।

সময়ে চিঠির জবাব আসিল। অরুণ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে; এবং ছেলে পড়াইবার কাজ পাইয়াছে। পূজার ছুটির আর তিনমাস দেরী—এই তিনটি মাস কাটিয়া গেলেই সে বাড়ী আসিবে।

চিঠি পাইয়া হিমুর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার বয়সে এই প্রথম সে অপরের কাছ হইতে চিঠি পাইয়াছে। ঠিকানার উপর আবার তাহারই নাম প্রথমেই লেখা! চিঠিখানি অনেকবার পড়িয়া পড়িয়া সে যখন তৃপ্ত হইল, তখন মা-দিদিমাকে দেখাইবার জন্য বাড়ীর ভিতর

গেল। সেদিন অপরাহ্নের মধ্যে হিমুর এই পত্র-প্রাপ্তি-সংবাদ জানিতে পাড়ার কোন ছেলে-মেয়েরই বাকী রহিল না।

ক্রমে অভ্যাসে অরুণের বিচ্ছেদ-দুঃখ কমিয়া আসিলে সে আবার নূতন বন্ধু-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল; ঘোষেদের পঙ্কজিনীর সহিত সই, শৈবালের সহিত মকর ইত্যাদি পাতাইয়া খেলার মজলিস্ বেশ জাঁকাইয়া তুলিল। তবুও খেলাধূলার মধ্যেও অরুণকে সে প্রায়ই চিঠি লিখিত। তাহার নূতন বন্ধুদের কথা, ভট্টাচার্য্যদের বাতাবি লেবুর গাছে কিরূপ ফল ধরিয়াছে, মিনুদের বিড়ালের যে তিনটি বাচ্চা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয়টি সাদা ও কয়টি ভিন্ন রঙের—এ সব কথারই উল্লেখ থাকিত। এবার সে আর একটি নূতন খবর লিখিয়াছিল—মুখুয্যেদের ভুবন এখন তাহাদের খেলার সঙ্গী।

হিমুর খেলার সাথী ভুবনকে অরুণ চিনিত। সম্প্রতি তাহার বাবা মারা গিয়াছেন লিখিয়া হিমু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। পিতৃহীনা বালিকা এ দুঃখটি ভাল করিয়াই বুঝিত। তা'ই সহানুভূতির অশ্রু নিজে মুছিয়াই শান্ত হইতে পারিল না। ব্যথার ব্যথী অরুণকেও সে-দুঃখের অংশ সে বণ্টন করিয়া দিল। ছুটিতে অরুণ আসিলে সেখানকার সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইয়া হিমু কহিল, "অরুণদা, বরুণদার কথা তুমি ত আমায় কিছুই লেখনি—তার কথা সব বলনা ভাই।"

"তার কি কথা?" বলিয়া অরুণ হাসিয়া হিমুর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল।

"এই সব—সে কেমন দেখ্‌তে? কত বড়? আচ্ছা অরুণদা, সে তোমায় অরুণদা বলে ডাকে ত?"

"না—স্যার বলে।"

"সে কাকে বলে অরুণদা? আমি ত কারুকেই ও কথা বলি না।

সে বুঝি ইংরিজী কথা ?" বলিয়া বিপুল বিস্ময়মাখা চোখদুটি সে অরুণের মুখের উপর ন্যস্ত করিল। অরুণ কহিল, "তাই—তুমি ত বাংলার গণ্ডী পেরুবে না। যদি ইংরিজি শিখ্‌তে, আরও কত জান্‌তে, বুঝ্‌তে পার্‌তে। বরুণা এই ক'মাসেই থাসা কথা বল্‌তে পারে ইংরিজিতে।"

"তোমার সঙ্গে বলে ? তার হাসি পায় না ইংরিজিতে কথা বল্‌তে ?" বলিয়া হিমু নিজেই মুখে কাপড় চাপিয়া খিল খিল করিয়া একচোট হাসিয়া লইল। কিন্তু সে হাসিতে অরুণ ত যোগ দিলই না ; বরং গম্ভীর মুখে রহিল দেখিয়া হাসি থামাইয়া চোখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিয়া সে কহিল, "আচ্ছা গো, আচ্ছা, পড়াও না—কে বারণ করেচে ? জানি আমি, সে যখন জানে তখন আমায় জান্‌তেই হবে। তোমার হুকুম ত আর না হবে না। কিন্তু কেন বল ত—?" বলিয়া সে বিরক্তমুখে উঠিয়া গেল।

এ কেনর উত্তর অরুণও দিল না, সেও যথার্থ ভাবে চাহিল না। পরদিন যথাকালে দেখা গেল, শিক্ষক ও ছাত্রী বিপুল মনোযোগে নূতন ভাষার চর্চ্চায় ব্যাপৃত। ছুটির অর্দ্ধেক কাল বন্ধু-গৃহের পূজা-উৎসবে কাটাইয়া আসায় শীঘ্রই অরুণের ফিরিবার সময় হইল। ফার্ষ্ট বুকের অর্থ-পুস্তক ও বাংলা হাতের লেখায় হিমুর বুঝিবার পক্ষে সহজ সঙ্কেতে যথাসাধ্য বুঝাইবার প্রয়াস নিজে নিজে পাঠাভ্যাসের জন্য হিমুকে প্রস্তুত করিয়া দিয়া অরুণ বিদায় লইল। পরের বার ছুটিতে আসিয়া সে আশ্চর্য্য হইল, মেধাবিনী বালিকা অর্থ-পুস্তকের সাহায্যে ফার্ষ্ট বুক শেষ করিয়া সেকেণ্ড বুক আরম্ভ করিয়াছে। আনন্দপূর্ণ-কণ্ঠে অরুণ কহিল, "তুমি যে খুব ভাল তা আমি জান্‌তুম। কিন্তু খুবটা যে কত বড়, তাই কেবল জান্‌তুম না।" অরুণের প্রশংসায় হিমুর শ্রম সার্থক মনে হইলেও স্বভাব-বশে সে কহিল, "ভারী ত—বরুণার চেয়ে ত আর আমি ভাল নই।"

"নয় বই কি ! বরুণার কি ভাল ? তাকে চিরকাল ধরে চেষ্টা করে

লোকে শেখাচ্চে তাই সে শিখেচে। পাখীকে কথা বল্‌তে শেখালে সেও কথা বলে। ওর বাহাদুরীটা কোন্‌খানে? যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও শিখ্‌তে পারে, সেই ত বাহাদুর; আশা করি, বাংলা দেশ একদিন হিমানী দেবীর লেখা দেখে অবাক্ হয়ে যাবে।"

হিমু মনে মনে অত্যধিক খুসী হইলেও মুখে কহিল, "তোমার কল্পনা কল্পনাই থেকে যাবে অরুণদা—"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জলদের নিমন্ত্রণ

পূজার ছুটি কাছে আসিয়া পড়ায় দেশ জুড়িয়া একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। অফিসের চাকুরে হইতে স্কুল-কলেজের ছাত্রদলেও এ ব্যস্ততার লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। অরুণদের মেসও এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিল না। বাড়ী যাইবার আগ্রহে অনেকেই আগে হইতে জিনিষ-পত্র কেনা ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাশুনা বিদায়-পর্ব্ব সারিয়া লইতেছিল। লম্বা ফর্দ্দ লইয়া বাড়ীর চিঠিও সকলের ঘন ঘন আসিতেছিল।

সারা মেসখানার মধ্যে কেবল দুইটি মানুষের মানসিক বিপ্লবের কোন সংবাদই বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেখা গেল না। প্রফুল্লের মানসিক উচ্ছ্বাস কোন-কিছুতেই বাহিরে কখনো প্রকাশ পাইত না, তা'ই ইহাতে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলেও অরুণের প্রতি কাহারো কাহারো চোখ্ পড়িতেছিল। যাহাদের পড়িতেছিল, তন্মধ্যে জলদই প্রধান।

কয়েকদিনের দ্বিধা কাটাইয়া একদিন সে কহিল, "অরুণবাবু ছুটিতে আপনি বাড়ী যাবেন ত ?"

অরুণ একটু হাসিয়া একটু কাশিয়া সংক্ষেপে কহিল, "যাব।"

"কবে যাচ্ছেন ? ছুটির গোড়ায় ?" বলিয়া সে উৎসুক দৃষ্টিতে অরুণের মুখের ভাব বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতেছিল।

"দেখি—" বলিয়া অরুণ এবারও এড়াইয়া উত্তর দিল। জলদ বুঝিল, বাড়ী যাইবার জন্য বন্ধুর খুব বেশী ত্বরা নাই। তা'ই খুসী হইয়া সে কহিল, "আমাদের বাড়ী পূজো হয়। এ বছর কাকারা সকলেই

দেশে আস্‌বেন। একটু বিশেষ রকম ধূমধামও হবে শুন্‌চি। আপনিও চলুন না—সেখানে পূজোটা খুব আমোদে কাটবে তা হলে। লক্ষ্মীপূজোর আগেই না হয় ফির্‌বেন। সুনীতিও আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েচে"। সুনীতি জলদের স্ত্রী!

বন্ধুর আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিতে অরুণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিল না। মনটি তাহার তখন ঝালদার পথেই অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। হিমু লিখিয়াছে, "আর কত দেরি কর্‌বে অরুণদা? ছুটি কি তোমার হবে না?" এ অনুরোধের পর কি আর দেরি করা যায়? তবু অরুণের আট-ঘাট-বাঁধা সতর্ক মন এমন অবস্থাতেও নিজ-অধিকারের সীমা বিস্মৃত হইল না। হিমু ছেলেমানুষ, সে নিজে খেয়াল-মতই না হয় ত্বরা দিয়াছে, কিন্তু তাহার মা দিদিমার ত্বরা কতটুকু, তাহা ত অরুণের বিশেষরূপে জানা নাই। তা'ই মনে কুণ্ঠা জাগিতেছিল,—পাছে মালতী দেবী কিছু মনে করেন! মুক্তা ঠাকুরাণী বিরক্ত হন! উঁহাদের না দেখিয়া সেও যে থাকিতে পারিবে না। তবু দীর্ঘ ছুটিটায় নিজের সমস্ত ব্যয়-ভার সেই দুইটি অনাথা বিধবার স্কন্ধেই বা সে চাপাইবে কোন্ সাহসে? সেখানে তাহার কতটুকুই বা দাবী! কিসেরই বা দাবী!

ছুটিতে মেসের ঠাকুর-চাকর কেহ থাকিবে না, থাকিলে সে এখানেই কিছুকাল থাকিয়া দিন সংক্ষেপ করিয়া লইত। জলদের প্রশ্নের উত্তরে এই সব বিষয় তাহাকে মনে মনে আরও একবার ভাবিয়া লইতে হইল, তাহার উত্তরে নিজের সম্মতি জানাইতে তাহার একটু বিলম্ব হইল। এখানেও যে সঙ্কোচে বাধিতে ছিল না, তাহা নহে; তবু বন্ধুর সে আগ্রহ ব্যাকুল আহ্বান সে ফিরাইতে পারিল না। সে বুঝিত,—জলদ তাহাকে ভালবাসে। সেও যে ভালবাসারই কাঙাল। তা'ই মন তাহার ভিন্ন পথে

ছুটিতে চাহিলেও বন্ধুর অযাচিত স্নেহের আহ্বানটিকে সে ব্যথা দিয়া ফিরাইতে পারিল না।

এবারকার ছুটিটি যে কেমন আনন্দ-উৎসবে কাটিবে, তাহারই একটি সরস তালিকা মুখে মুখে বানাইয়া লইয়া জলদ যখন এ সম্বন্ধে অরুণের নিরুৎসুক মনটিকেও একটুখানি প্রলুব্ধ করিয়া ফিরিয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অরুণের স্বল্পালোক ঘরখানির মধ্যে অন্ধকার তখন পূর্ণাধিকারেই নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অরুণ প্রসন্ন মনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে বেড়াইয়া আসিবার জন্য দড়ির আলনা হইতে থাকি রংয়ের সার্টটি পাড়িয়া গায়ে দিয়া সে ধীর পদে বাহির হইয়া পড়িল।

ছুটির আগের দিন প্রফুল্লকে বাক্স গুছাইতে ব্যস্ত দেখিয়া অরুণ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, যদি সে কোন কাজে লাগিতে পারে! প্রফুল্ল মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "কি অরুণ, বাড়ী যাচ্চ নাকি?"

অরুণ কহিল, "জলদ নেমন্তন্ন কল্লে, তাই আগে ওর ওখানেই যাব?"

"নেমন্তন্ন পেয়েচ—বাঃ! তা'হলে ছুটিটা কাট্‌বে ভাল—বল?" বলিয়া সে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিল। অরুণ চুপ করিয়া তাহার পাশে বসিয়া কাজ দেখিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। এ নীরবতা অরুণের ভাল লাগিতেছিল না; তা'ই প্রথমে সেই কথা কহিল, বলিল, "প্রফুল্লদা বাড়ী যাচ্চ ত?"

প্রফুল্লের আদেশমত অরুণ এখন তাহাকে আপনি ছাড়িয়া তুমি বলিতে ধরিয়াছে। প্রফুল্ল মুখ না তুলিয়াই কহিল, "না।"

"তবে—কোথায় যাবে প্রফুল্লদা?" অরুণের প্রশ্নে বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হইল। প্রফুল্ল তাহা লক্ষ্য করিল। কাজে চোখ রাখিয়া অনাগ্রহভাবে সে কহিল, "বাইরে একটু ঘুরে আসা যাবে।"

অরুণ কহিল, "বাড়ী থেকে মত আনিয়ে নিয়েচ ত প্রফুল্লদা? তাঁরা হয়ত দুঃখিত হবেন কত—না যাওয়ায়।"

"হতে পারেন। না অরুণ—মত চাইলে ত তাঁরা দিতেন না, বিশেষ করে ঠাকুমা। কাকাবাবুও রাজী হতেন না। কিন্তু না চাইলেও বিদ্রোহ করবেন না, এও আমি জানি" বলিয়া সে কাজ শেষ হওয়ায় বাক্স বন্ধ করিয়া এইবার ফিরিয়া বসিল; এবং ছুটিতে অরুণের পড়াশুনার কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত তাহারই আলোচনা করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাহাকে আর পূর্ব্বকথার পুনরাবৃত্তির অবকাশ দিল না। অরুণ মনে করিয়াছিল, এই অবসরে সে প্রফুল্লদা'র পারিবারিক জীবনের একটু খবর জানিয়া লইবে। কিন্তু প্রফুল্লের ভাবে তাহাকে এ সম্বন্ধে অনিচ্ছুক বুঝিয়া এ আলোচনাও সে আর তুলিতে পারিল না। তাহার কথায় যে দুইজনের উল্লেখ সে করিয়াছিল তাহাতে অরুণ বুঝিল, আপত্তি করিতে ঠাকুরমাতা ও কাকাবাবু। তবে কি প্রফুল্লদা'ও তাহারই মত ভাগ্যহীন—পিতৃ-মাতৃহীন অভাগা?

চিন্তার সঙ্গেই তাহার হাসি আসিল। নিজের সহিত সে আবার অন্যের তুলনা করিতে চাহে! হউক পিতৃ-মাতৃহীন, তবু উহার ঠাকুরমা' আছেন, কাকাবাবু আছেন।' নিজের বলিতে গৃহ-ভূমি—আত্মীয়-স্বজন সবই আছে,—তবু যেন, কেন কে জানে, অরুণের মনে হয়—প্রফুল্লদা'র মনেও যেন তাহারই মত একটা অভাবের ঝড় দিবারাত্রিই হাহাকার তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ওই মানুষটির পরমসহিষ্ণু সংযত মুখে, আবেগ-বর্জ্জিত ব্যবহারে, সকলের প্রতি ভালবাসায়—উহার মনের যে নিরুপদ্রব ছবিটি প্রকাশ পায়, আসলে কিন্তু তা' নয়। হইতে পারে—ইহা ভ্রম। অরুণ হয়ত ঠিক্ মত তাহাকে বুঝিতে পারে নাই। ইহা অমূলক হওয়াই তাহার একান্ত প্রার্থনীয়। তবু স্নেহ-দুর্ব্বল চিত্তের সংশয় যেন কাটিতে চায় না।

প্রফুল্ল নিজেকে বুঝিতে দেয় না, নিজে হইতে অগ্রসর হইয়া বুঝিবার সাহসও অরুণের হয় না। বন্ধুর এই আত্মগোপন-চেষ্টায় অভিমানে অনেক সময় তাহার চোখে জল ভরিয়া আসে—মনে হয় প্রফুল্লদা' এখনও তাহাকে পর মনে করে, তা'ই কিছু বলে না। বন্ধু কি শুধু সুখের সাথী—দুঃখের অংশীদারও কি নয়? অরুণের যে সংসারে বলিবার কথা কিছু নাই, তা'ই সে নির্ব্বাক! কিন্তু যাহার আছে, সে কেন ব'লে না?

সে দিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রফুল্লের একটি কথা বার বার তাহার মনে উঠিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিয়াছিল, "মত চাইলে তাঁরা দেবেন না। কিন্তু না চাইলেও বিদ্রোহ করবেন না।"

কেন তা' করবেন না? প্রফুল্লের পারিবারিক জীবন কি তবে শান্তিপূর্ণ নয়? তাহার আত্মীয়েরা কি তাহার জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা অনুভব করেন না? খুব সম্ভব—তা'ই। সেই জন্যই প্রফুল্লদা' বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হ'ন না। অরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল, কে জানে, দুঃখী কে? যাহার নাই? অথবা যাহার থাকিয়াও নাই? জগতে দুঃখ বুঝি স্বাভাবিক—তা' সে যাহার পাশে যেরূপেই দেখা দিক্!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জমিদারবাড়ী

জমিদার ইন্দ্রনাথের বাড়ীখানা প্রভু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া লোকের চোখে বিপুল বিস্ময় জাগাইয়া তুলিল। সাদা-সিধা ছাঁদের চক্‌মিলানো চির-পরিচিত বাড়ীখানা মাস-কয়েকের মধ্যে বর্ণে ও গঠনে সকল রকমেই যেন আশ্চর্য্যরূপে বদলাইয়া গিয়াছিল। বাড়ীখানায় নূতন করিয়া বালি ধরাইয়া রঙ লাগানো হইয়াছিল, জানালায় খড়খড়িতেও রঙের বাহার খুলিয়াছিল। কলিকাতা হইতে মিস্ত্রী-মজুর আসিয়া উপরে নীচে সমস্ত ঘরগুলিতে ঘরের রঙের সহিত মিল রাখিয়া ফুল-পাতার নক্‌সা আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে। বাহিরের দিকে কাজ করা লোহার রেলিঙে ঘেরা বারান্দা তৈয়ার করাইয়া সেখানে বিচিত্র চীনা মাটীর টবে কৃত্রিম উদ্যানের শোভা সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাগানে ফোয়ারা, মর্ম্মর বাঁধানো চত্বর এবং চারিদিকে লাল সুরকির সরু পথ। পথগুলির আরম্ভ ভাগে লতা-পাতার একটি করিয়া তোরণ-দ্বার। অধিকাংশ তোরণ দ্বারগুলিতেই প্রস্ফুটিত ঝুমকালতা, মাধবী, মালতী ও তরুলতার বিচিত্র শোভা। পথগুলির দুইধারে স্থানে স্থানে জাপানী ছবি আঁকা চীনা মাটীর তৈয়ারি আসন উদ্যান-স্বামীর শ্রমাপনোদনের জন্য গ্রথিত। বাগানে বেশীর ভাগই বিলাতী ফুলের গাছ। পপি, জিনিয়া, য়্যাষ্টার, প্যান্‌সী, ক্যামেলিয়া, ম্যাজেলিয়া, বিচিত্র বর্ণের নানা প্রকারের লিলি প্রভৃতি ফুলের ও পাতা-বাহার ক্রোটন পাম্ ও নানা জাতীয় গাছের বাহার; কোথাও সারি দিয়া, কোথাও ত্রিকোনাকারে, কোনস্থলে বা

গোলাকারভাবে সজ্জিত। উদ্যান-প্রাচীরের ধারে ধারে সবুজ গাছের ফাঁকে-ফাঁকে এতদিনের যে রক্ত জবা পথের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, পুরাতন স্মৃতি রক্ষা করিয়া, কেন, কে জানে তাহারাই কেবল এখনো বিতাড়িত হয় নাই!

বৈঠকখানা হইতে বেতে ছাওয়া কাষ্ঠাসনগুলি দূরীভূত হইয়াছে; সেখানে এখন মখমল-মণ্ডিত পুঁতির ঝালর লাগানো স্প্রিংয়ের সৌখীন কৌচ সোফা শোভা পাইতেছে। বৈদ্যুতিক পাখা চালাইবার উপায় না থাকায় সেকালের টানাপাখা এখনও স্থানচ্যুত হয় নাই বটে, তবে তাহার মোটা পরিচ্ছদ খুলিয়া তাহাকে সৌখীন-পোষাক পরানো হইয়াছে। মোটা দেশী ছিটের ও সতরঞ্চির পর্দাগুলির জায়গায় এখন বাহিরের কক্ষগুলিতে সূক্ষ্ম কারু শিল্পের লেশ নেট ও সিল্কের পর্দা সব রঙীন ফিতা বাঁধিয়া অর্দ্ধাবরিত ভাবে অবস্থিত। বসিবার ঘরে যে সকল নারীচিত্র বিলম্বিত হইয়াছিল, তাহা সৌন্দর্য্য ও আর্টের দৃষ্টান্ত হইতে পারে, তবে সেগুলিকে সুরুচির পরিচায়ক বলা যায় না। বাঁয়া, তব্‌লা, এসরাজ, হারমোনিয়ম, পিয়ানো প্রভৃতিতে গৃহস্বামীর সঙ্গীতানুরাগ প্রকাশ পাইতেছে। সঙ্গীত-বিদ্যায় আলোকনাথের খ্যাতি ছিল; সম্প্রতি বাদ্যশিক্ষাতেও তিনি মন দিয়াছেন। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা জমিদার বাবুর প্রিয়পাত্র হইবার আশায় প্রতি সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় মজলিস্ করিতে আসিতেন।

আলোকনাথের বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। দেহখানি লম্বার চেয়ে চওড়ায় বেশী। মুখ গোল ভাবের, চোখদুটি বড় বড়। বুদ্ধির দীপ্তি নাই থাক্, চোখে উজ্জ্বলতা আছে। মাথার পশ্চাদ্‌ভাগের চুলগুলি ঘন, সম্মুখ ভাগের চুল পাতলা। সেই পাতলা চুলে বহু নৈপুণ্যে টেড়ী কাটিয়া আলোকনাথ ত্রুটি ঢাকিবার চেষ্টা করিত।

বাগান-বাড়ীতে প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে 'গহর বিবির' আগমন

হয়। আলো, আনন্দ ও মধুর নারীকণ্ঠের সুর-তরঙ্গে সে রাত্রে পল্লী-বাসীরা চমৎকৃত হইয়া উঠে, পথিকেরাও মুগ্ধ পুলকিত চিত্তে সেখানটায় কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া যায়। আলোকনাথের স্বপক্ষদল বলে, "ভগবান্ ইঁহাকে শুধু ধন দিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, তাহা ভোগের শক্তিও যথেষ্ট দিয়াছেন। 'যখের ধন' রহিল কি না রহিল, সে একই কথা।" আবার বিপক্ষ দল বলে, "এত দিনের জমিদার-বংশ—এইবার বিলাসের স্রোতে ভাসিয়াই বা যায়!" সংসারে ভালমন্দ দুই শ্রেণীরই লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ পরের সৌভাগ্যে সুখী, কেহ বা ঈর্ষান্বিত!

বৈঠকখানায় ও বাগান বাড়ীতে যাহাই ঘটুক, অন্দরে কিন্তু এ সব সৌখীন ব্যাপারের কোন পরিচয়ই পাওয়া যাইত না। আলোকনাথের মা বাঁচিয়া আছেন; নিজের শুচিতা ও গৃহকার্য্যের তদারকেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। স্ত্রী রুগ্না ও বন্ধ্যা, তা'ই সুখ যোল কলায় পূর্ণ হইলেও সংসারে প্রকৃত মনের সুখ কাহারও ছিল না। আলোকনাথের জ্যেষ্ঠ মৃত। তাঁহার বিধবা স্ত্রী পিত্রালয়ে। জ্যেষ্ঠের একমাত্র পুত্রটি কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল। আলোকনাথ ও তাঁহার জননীর ইচ্ছা ছিল না যে একমাত্র বংশধরকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে দেন। কিন্তু জেদী ছেলে কাহারও নিষেধ কানে তুলিল না। শাসন, আদর, অনুনয়—কিছুতেই সে দৃক্‌পাত করিল না। অগত্যা অনিচ্ছাতেই আলোকনাথকে তাহার মতানুবর্ত্তী হইতে হইল। তা'ই কি জমিদার বংশের বংশধররূপে উপযুক্ত দাস-দাসী লইয়া সে বাসা করিয়া রহিল? 'খামখেয়ালি' ছেলে সাধারণের সহিত একটা সাধারণ মেসে সামান্যভাবেই দিন যাপন করিতেছে! বংশের কলঙ্ক,—যেমন ক্ষেত্রে জন্ম, তেমনি ত মতি-গতি হইবে! স্বাধীনচিত্তা মায়ের ছেলে গুরুজনের বশ্যতা মানিবে কেন?

আলোকনাথ এ জন্য পারিষদ-মহলে সর্ব্বদাই দুঃখ করিত। প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর দল খুল্লতাতের স্নেহশীলতার প্রভূত প্রশংসা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নিন্দা করিত। তত্ত্বদর্শীরা বলিত, "ভোগ মানুষের কর্ম্ম-ফল। ভগবান্ হাতে তুলিয়া দিলেই কি মানুষ ভোগ করিতে পারে? যার যেমন পাওনা!" এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সহিত একটা নূতন তথ্যের আলোচনাও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। কোন কোন শুভানুধ্যায়ী আলোকনাথকে পুনরায় দার-পরিগ্রহে অনুরোধ করিতেছিলেন। রুগ্না ও বন্ধ্যা স্ত্রী শাস্ত্রানুসারে বর্জ্জনীয়। সুতরাং ধর্ম্মতঃ এজন্য তাঁহাকে অপরাধীও হইতে হইবে না। সেই একটা 'অর্দ্ধ-উদাসীন' 'কেতাব-কীট' বালকের মুখ চাহিয়া কেনই বা তিনি বসিয়া থাকিবেন? জমিদারী-রক্ষার উপযোগী বিষয়-বুদ্ধি কি আর তাহার ঘটে কখনো আসিবে? ভবিষ্যৎদর্শীরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "তাহা কখনই সম্ভব নয়।" কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ক্রমে আলোকনাথের কাণেও বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছিল; এবং শুনিতেও মন্দ লাগিতেছিল না। আলোকনাথ যে স্ত্রীকে কখনো ভালবাসিত না, এমন নয়। সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে যেমন সকল স্বামী নিজ-নিজ স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে, সেও এক সময় স্ত্রীকে তেমনি বাসিত। হেমলতা মেয়েটিও অত্যন্ত সাধারণ। তাহার রূপের আলোয় ঘর আলো হইত না; গুণেরও কোন বাড়াবাড়ি পরিচয় ছিল না। স্বামীকে সে হিন্দুনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত। কিন্তু সে ভালবাসা প্রকাশের জন্য কোন সাড়ম্বর উচ্ছ্বাস বা বাহিক অনুষ্ঠান দেখা যাইত না। লেখাপড়া যৎসামান্য যাহা সে শিখিয়াছিল, তাহাতে বাংলা মাসিক পত্র হইতে রামায়ণ, মহাভারত পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে পড়া চলে। চিঠি লিখিবার তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল না। থাকিলে বোধ করি বাঙ্গালীর ঘরের অন্যান্য মেয়েদের মতই সে কার্য্যও সে অনায়াসে চালাইতে

পারিত। রান্না-বান্না, সাংসারিক কাজ সে সবই শিখিয়াছিল, কিন্তু বছর দুই আগে নিউমোনিয়া হইয়া দীর্ঘকাল রোগভোগান্তে যখন সে পুনরায় চলা-ফেরা সুরু করিল, তখন দেখা গেল, পূর্ব্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইবার নহে। বুকে একটা যন্ত্রণা সর্ব্বদাই রহিয়া গেল। আরও আনুসঙ্গিক অনেক রোগই ভগ্ন দেহে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। এই সময় ভাগ্য সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া ইন্দ্রনাথের বিপুল বিষয়ের অধিকার আলোকনাথের আয়ত্তে আসিল।

বধূর বন্ধ্যাত্ব-অপরাধের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন ক্ষতিই হয় নাই, কিন্তু এখন ভাগ্যচক্র-পরিবর্ত্তনের সহিত শাশুড়ীর মনে ক্রমেই অভাবের ক্ষোভ জাগিয়া উঠিতেছিল। এত বড় বাড়ী, এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে শুধু বালকণ্ঠের হাসি-কান্নারই শব্দটুকু নাই! এত বড় জমিদার বংশের নাম ও মান রক্ষা করিতে সেই একটা পিতৃহীন অভাগা ছেলে! তা'ই বা তাহার উপর ভরসা কিসের? কাণ্ডজ্ঞান-হীন বালক—বিপদ লইয়াই যাহার খেলা—তাহার কাছে সংসারের দাবী কোথায়? কোথায় দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলিতে হইবে, কোথায় জল-প্লাবনে গৃহ-হীনদের সাহায্যের জন্য পৃষ্ঠে খাদ্য-স্তূপ বাঁধিয়া নদীর জলে সাঁতার দিতে হইবে, আবার কোথাও রাজনৈতিক আন্দোলনে সভাসমিতিতে যোগ দিতে হইবে বা পুলিশের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে হইবে—এ সকল কার্য্যেই সে অগ্রণী! মৃত্যু ত তাহার পায় পায় ফিরিতেছে। সাপের মুখে বাঘের মুখে যাইতেও সে ভয় করে না; অসমসাহসিক—সেবার যুদ্ধে যাইবার জন্যই ত প্রস্তুত হইয়াছিল। কেবল পিতৃ-পিতামহের পুণ্যবলে ও আলোকনাথের গোপন চেষ্টা ও বিপুল অর্থ-ব্যয়ে ডাক্তারী রিপোর্টে ফিরাইয়া দিয়াছিল না? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পিতামহী তাহার ভরসা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছেন। মানুষের স্বভাব, সে এক হাতে ছাড়ে, অন্য হাতে ধরে; নহিলে সে বাঁচিতে পারে না। তা'ই

তরুণ পৌত্রের উপর হইতে মন ফিরাইতে গিয়াই তাঁহার মনে হইল, এখনও এ ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া যায়। ছেলের তাঁহার এমনই বা কি বয়স যে পুনরায় বিবাহ দেওয়া চলে না? বংশ-রক্ষার জন্য কত ষাট সত্তর বৎসরের বুড়াও যে দ্বিতীয় বার দার গ্রহণ করিতেছে। উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যুতে—ভগবানের সহিত রেষারেষি করিয়া কত বুড়া বাপ যে পুনরায় বিবাহ করিয়া বংশ-রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এ ক্ষেত্রে তেমন কোন বিসদৃশ ব্যাপারও ত ঘটিতেছে না। এত বড় জমিদার-বংশের মান ও নাম যে বন্ধ্যা ও রুগ্না বধূ রক্ষণে সমর্থ হইল না—শুধু তাহার তরফ হইতেই দেখিলেই ত চলিবে না! হেমলতাকে শুনাইয়া শুনাইয়াই আজ-কাল এ-সব কথা ওঠে, তা'ই আলোকনাথের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে হেমলতার মনে সুখ ও শান্তি ছিল না। যে অনর্থকর অর্থ হইতে সে স্বামী ও সৌভাগ্য দুই হারাইতে বসিয়াছে, কেমন করিয়াই বা সে অর্থকে সে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিবে? অদৃষ্টের যে এ নির্ম্মম পরিহাস! অবসর পাইলেই সে তা'ই নির্জ্জনে চোখের জল মুছিয়া মনে মনে নিজের মৃত্যু কামনা করে।

সে একজন সাধারণ নারী, স্বামীর সখের বা শ্বশুর-বংশের মান-রক্ষার জন্য আত্মবলি দিবার মত মানসিক বল তাহার ছিল না। সে বুঝিতেছিল, স্বামীর মনেও এ দ্বন্দ্ব পৌঁছিয়াছে। এতদিন স্ত্রীর রূপ লইয়া আলোক-নাথের মনে কোন ক্ষোভের অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। এখন 'গহরের' রূপে মুগ্ধ-চক্ষু স্বামী-স্ত্রীর পুরাতন মুখে কোন আকর্ষণ আর দেখিতে পায় না। বিদ্যা বুদ্ধি আচার অনুষ্ঠানের লক্ষ ত্রুটি তা'ই অহরহ আবিষ্কৃত হইতেছিল। অথচ বছর কয়েক পূর্ব্বে ইহারই বুদ্ধি-বিবেচনা ভক্তি-ভাল-বাসায় মুগ্ধ তৃপ্ত স্বামী মনে করিয়াছিল, জগতে এমনটি আর হয় নাই, হইবেও না। কাল ও অবস্থা মানুষের মনে কত পরিবর্ত্তন আনিতে পারে—মানুষ তাহার হিসাব জানে না বলিয়াই দুঃখ পায়!

মায়ের মনের ইচ্ছা যখন মুখেও প্রকাশ হইতে শুনা গেল, তখন প্রথমটা আলোকনাথ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াছিল। এও কি একটা কথা না কি! এই শারীরিক অসুস্থতার উপর উহাকে আবার মনের এত বড় ব্যথা দেওয়া কথনো সম্ভব? বংশ-রক্ষার জন্য ভাবনা কি? দাদার ছেলে বাঁচিয়া থাক্! সেই ত এ বংশের বংশধর, এমন কথা শুধু মুখে নয়, মনেও যে সে অনুমোদন করিয়াছে? ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বেচ্ছাচারিতা অনেক সময় বিরক্তি আনিলেও ভালবাসার হ্রাস হয় নাই। মাতৃ-পরিত্যক্ত এই ছেলেটিকে শিশুকাল হইতেই যে সে সন্তান-বাৎসল্যে মানুষ করিয়া আসিয়াছে!

পনেরো বৎসর পূর্ব্বে যেদিন দেবর ও শাশুড়ীর সহিত কলহ করিয়া বিধবা বধূ চিরদিনের শপথ লইয়া স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যা'ন, সেদিন আলোকনাথও ভাবিয়াছিল, তাহাদের সকল সংস্রব ছাড়িয়া দিবে। মায়ের কাছে তর্জ্জন-গর্জ্জনে ভ্রাতৃজায়ার স্বেচ্ছাচারিতার দণ্ডস্বরূপ মাতাপুত্রে ইহজন্মে আর তাহাদের মুখ দর্শন করিবেন না, এমন প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন। তাহার পর যে দুইটা রাত্রি কাটিয়াছিল—হেমলতা সারা-রাত শুধু স্বামীকে এ-পাশ ও-পাশ করিতে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেই শুনিয়াছে। সাহস করিয়া সে কিছু বলিতে পারে নাই। স্বামীও একটি কথাও বলেন নাই।

তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে আলোকনাথকে বাড়ীতে দেখা গেল না এবং তিন দিনের পর সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সে আর একা নয়—সঙ্গে তাহার ভাইপো' প্রফুল্ল। অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াও যখন ভ্রাতৃজায়ার প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারিল না, তখন আলোকনাথ ভাবিয়াছিল, এই সহজ উপায়ে ছেলে আটক করিয়া তাহাকে বাধ্য করিবে। প্রফুল্লের মাতামহী ও মাতুল আলোকনাথের জেদে ছেলে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু মেয়ের অনিচ্ছায় মেয়ের মা মেয়ে পাঠাইতে রাজী হইলেন না। তখন

ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিল না। শান্ত পল্লী-জীবনে সন্তানহীন আলোকনাথ-দম্পতী গভীর স্নেহে এই পিতৃহীন মাতৃ-পরিত্যক্ত ছেলেটিকে ভালবাসিয়া সঙ্গ দিয়া তাহার মনের ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিত, ও নিজেরাও তৃপ্ত হইত। সে দিনের এখন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ছেলে এখন নিজের ইচ্ছায় চলিতে শিখিয়াছে। তাহারও শান্ত নিরুপদ্রব মনের নদীতে অসময়ে প্লাবন আসিয়াছে। তবু সেই অতীত দিনের অভ্যাসের বশে পূর্ব্ব স্নেহ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। লুপ্ত না হউক, তাহার যে স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সংশয় ছিল না!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রলোভন

হিমুর বয়স বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া তেরোয় পড়িল। ভয়ে ভাবনায় হিমুর মার বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছিল, গলায় জল নামিতে চাহে না! কেমন করিয়া সহায়-সম্পত্তিহীনা বিধবা মনের মত পাত্রে কন্যাদান করিবেন? গ্রামে বিবাহার্থী যুবকের অভাব ছিল না। হিমুকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতে কেহ অসম্মত নহেন। তা'ই বলিয়া গরীব বিধবার পুরুষ-প্রকৃতির এই দুরন্ত মেয়েটিকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা কাহারও মনে মুহূর্তের জন্যও উদয় হয় নাই। যদি বা কাহারও ইচ্ছা হইত, সে পাত্র হিমুর মার পছন্দ হইত না। তাঁহার স্বর্ণলতা অবশেষে কি সেয়াকুলের কাঁটায় তিনি জড়াইয়া দিবেন!

মামিমা কহিলেন, "কি করবি বাছা, যেমন ওর কপাল, তেমনি না হবে! হিঁদুর ঘরে অত বড় মেয়ে আর ত থুবড়ো রাখা যায় না। মুখুজ্জেদের গোবর্দ্ধনের সঙ্গেই দিয়ে দাও—ছেলে এমনই বা মন্দ কি! বিয়ে হলে আবার রীত-চরিত্তির ভাল হয়ে যাবে। এমন আক্ছারই ত কত হচ্চে। যে তোমার পল্টন মেয়ে—সব ঠিক্ করে নেবে।"

মালতী অশ্রু মুছিয়া মনে মনে স্বামীকে স্মরণ করিতেন,—"তুমি বলিয়া দাও, তোমার স্নেহের ধন হিমুকে আমি কেমন করিয়া জলে ভাসাইয়া দিব! ওগো আমি কি করি,—তুমি উপায় করিয়া দাও।"

এমনি করিয়া ভাবনায় দিন কাটিতেছিল। যাহার জন্য এত ভাবনা, সে কিন্তু বেশ নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে পথে পথে ছেলের দলে মিশিয়া খেলিয়া

বেড়াইতেছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত শাসন তাড়না সহিয়া সহিয়া আজকাল তাহার চঞ্চল গতি অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছিল; তবে একেবারে সে টুকু সে ছাড়িতেও পারে নাই।

মা কহিলেন, "হিমু, এত করে তোকে বলি রাস্তাঘাটে খেলিস্ নে, তা কি কোন মতেই তুই শুনবি না?"

একখানা ছোট কুশের ডালায় কতকগুলি কাঁচা পাকা করমচা লইয়া হিমু তাহার খেলার সাথীদের উদ্দেশে বাহির হইতেছিল—ফিরিয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, "শুনি ত মা—আর কৈ খেলি? গাছে উঠে ও পেয়ারা পাড়ি না,—দত্তদের গাছে এত পেয়ারা হয়েছে মা, যেমন মিষ্টি তেমনই শাঁসালো—খোলা এত পাতলা আর ভেতরটা ঠিক যেন গোলাপফুলের রং! অরুণদা বলে, পরের জিনিষ নিলে চুরি করা হয়—হ্যাঁ মা, গাছ থেকে পেড়ে নিলেও কি চুরি করা হয়?"

"তা হয়!—হিমু, লক্ষ্মী মা আমার, ঘরে বসে খেলা কর্। রাস্তা ঘাটে যাস্নি বাছা। লোকে নিন্দে করবে—বিয়ে হওয়া দায় হয়েছে যে—" বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "আয়, তোর চুল বেঁধে দি।"

চুল বাঁধিতে বাঁধিতে মা কহিলেন, "মামিমা মাহেশে রথ দেখ্তে যাবেন, তুই যাবি হিমু?"

হিমু আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, "মাহেশ! সে কোথায় মা?"

"সে এক জায়গায়! ওঁর কে বোন্ঝির ছেলে আছেন, তাঁরা খুব বড় মানুষ, মস্ত বাড়ী—আগে সেখানে দু'চার দিন থেকে তবে মাহেশে যাবেন। যাবি সেখানে?"

হিমু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল, "খুব, খুব। দেখ মা, সে দিন তোমায় বল্লাম, নীলাম্বরী সাড়ীটা আমায় পরতে দিয়ো না,—তুমি শুনলে

না ত? যেমন কুশীদের বাড়ী গেছি, অমনি ওদের রান্না ঘরের পেরেকে না কিসে আটুকে গিয়েছিল না! যেমন টান দিয়েচি, অমা ফর্দ্দাফাঁই" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। তবু হাসির সঙ্গে একটুখানি ভয়ের আভাষও ছিল। সে জানিত, এই একমাত্র পোষাকী সাড়ীখানির দুরবস্থায় মা ত খুসী হইবেনই না, বরং বিরক্ত হইবেন। সেদিন ভয়ে বলিতে না পারিলেও এইবার যে তাহা প্রকাশের কাল আসিয়াছে তাহা সে মনে মনে বুঝিয়াছে—কারণ এই নীলাম্বরীখানি ছাড়া ত' বাহিরে যাইবার মত আর কোন সৌখীন দ্বিতীয় বস্ত্র তাহার ছিল না! খবর শুনিয়া মা কেবল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কোন অনুযোগ করিলেন না দেখিয়া হিমু খুসী হইয়া কহিল, "কবে যাবে মা সেখানে?"

মা কহিলেন, "আমি ত যাব না। তুই যাস্ মামির সঙ্গে। উনি ওঁর কটুম-বাড়ী যাবেন, তাঁরা বড় লোক, আমার কি সেখানে যেতে আছে—পাগল!"

"তবে আমিই বা কেন যাব, ওঁর কুটুম বাড়ী? আমিও যাব না" বলিয়া হিমু অপ্রসন্ন মুখে চুল বাঁধার বিলম্বে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে লাগিল। মা তাঁহার একগুঁয়ে মেয়েটিকে ভালই চিনিতেন। জোর করিয়া যে ইহাকে বশে আনা চলিবে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ বোঝেন। অথচ তাঁহার যে কি বিষম দায়, তাহা তিনিই কেবল জানেন। মামি আশা দিয়াছেন, তাঁহার বোন্‌ঝীর একটি পিতৃহীন পৌত্র আছে, ছেলেটি বড় সৎ। দুইটা না তিনটা পাশও নাকি করিয়াছে সে। মেয়ে দেখাইয়া তাহার মাতাকে যদি প্রসন্ন করাইতে পারা যায়, হয়ত অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যাইতে পারে। মাতা-পুত্র দু'জনেই বড় ভাল। মামির বোনঝী তাঁহার সহোদরা নহেন—দূর সম্পর্কিয়া; তবু সেখানে গেলে গরিব বলিয়া কেহ অনাদর করিবে না। তাঁহার কথার মান্যও তাঁহারা রাখিয়া থাকেন।

বেড়াইতেছি। বিধবা এই গোপন আশার কুহকেই মুগ্ধ হইয়া মেয়ের মন আগ্লাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। নহিলে চোখের বাহিরে তাহাকে পাঠাইয়া তিনিই কি স্বস্তিতে থাকিতে পারিবেন! মার আগ্রহ ও প্রলোভনে হিমু শেষে দিদিমার সহিত মেলা দেখিতে যাইতে স্বীকার হইলে, মা তাহাকে সেদিনের মত বাহিরে খেলিতে যাইবার অনুমতি দিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন—এমন কাণ্ড আর কখনো চলিবে না। সে এখন বড় হইয়াছে! এইবার গৃহ-কার্য্যে না থাকিলেও চুপ্‌চাপ ঘরে বসিয়াও তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে। মায়ের মুখের গাম্ভীর্য্যে ও কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় হিমু বুঝিয়াছিল, এ আদেশ তাহাকে মান্য করিতেই হইবে। এবারকার বারণ অন্য বারের মত ফাঁকা আওয়াজ নয় বুঝিয়া সেদিনের অযাচিত পাওয়া স্বাধীনতাটুকু সে আর তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। সংসারের সহিত যতই সে পরিচিত হইতেছিল, ততই বুঝিতেছিল, এখানে মনে দ্বিভাব রাখিয়া চলার নামই শিক্ষা ও ভদ্রতা। বয়সের সহিত এমনি ধারা একটি নূতন ভাব ধীরে ধীরে তাহার মনে অস্পষ্টরূপে আকারপ্রাপ্ত হইতেছিল। তা'ই এখন সে অসঙ্কোচে সকল কথা সবার কাছে বলে না—যাহা বলে, তাহারও পরিণাম-চিন্তা মনে উদয় হয়। সরলা হিমু এইবার জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইতে সুরু করিয়াছে,—ভয় হয়, আর হয়ত তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সঙ্গ-মোহ

দিদিমার বোনঝীর বাড়ী-ঘর সুখ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিমু মুগ্ধ হইল। গরিবের ঘরের মেয়ে সে—এমন সব বিলাস-ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর কখনো চোখে ত দেখেই নাই, কানেও বড় শোনে নাই। অরুণের মুখে বরুণাদের বাড়ীর যে-সব বর্ণনা খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছিল, তাহাই ছিল তাহার ধনী-গৃহের আদর্শ। তা'রপর জলদ বাবুর বাড়ীর বর্ণনা ও দুর্গোৎসবের বিবরণ শুনিয়া হিমু ভাবিয়াছিল, তাহারা উঁহাদের কাছে কিছুই নন্। দুইদিন ত শুধু এখানকার বাড়ীখানার ঘর কয়টা প্রদক্ষিণ ও পর্য্য-বেক্ষণ করিতেই কাটিয়া গেল; তা'রপর বাগান। এত বড় বাগান, এত রং-বেরঙের ফুল, এত বিচিত্র পাতা-গাছ,—কোন গাছের পাতার রং সিঁদুরের মত রাঙ্গা, কোন গাছের পাতা বা গুটাইয়া চক্রাকার ধরিয়াছে, কোন গাছের পাতায় ঘুঙুরগাঁথা মলের মত বাজনা বাজে। এ সব গাছ পাতা ও ফুলের অর্দ্ধেকের নাম ত হিমু জানেই না, চোখেও কখনো এ-সব দেখে নাই। চিড়িয়াখানায় কত বাহারে পাখী—ময়ূর, পায়রা, হরিণ, খরগোস গিনিপিগ্, সাদা ইঁদুর, আরো কত-কি। এ-সব দেখিয়া হিমুর আনন্দ হইত, আব: দুঃখও হইত। মনে হইত, অরুণ যদি সঙ্গে থাকিত! ভাল জিনিষটি প্রিয়জনকে না দেখাইতে পারিলে মানুষের যথার্থ সুখ হয় না। তা' ছাড়া এই বৃহৎ অপরিচিত রাজ্যে আনাড়ির মত শুধু হাতড়াইয়া বেড়াইতে তাহার ভাল লাগিতেছিল না। গৃহকর্ত্রীকর্ত্তার-মা, দিদিমার বোন্‌ঝী—প্রায় তাহার সমবয়সী। অনেক দিনের পর দেখাশুনা হওয়ায় ও নিরন্তর কর্তব্যান

সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দরিদ্র আত্মীয়কে দেখাইতে পাওয়ায় খুসী মনেই তাঁহাদের তিনি গ্রহণ করিলেন। হেমলতাও এই আনন্দময়ী সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়াই স্নেহমুগ্ধ হইল, শাশুড়ীকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, "মা এটিকে আমাদের বৌ করে ঘরে নিলে হয় না? কি সুন্দর রূপ, দেখেছ! সব-চেয়ে সুন্দর চোখ দুটি!"

মা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তেম্‌নি আমার কপাল কি না! সে ছেলে বিয়ে করে বৌ আন্‌বে, তবে আর ভাবনা ছিল কি? হাঁ বৌমা, ফুলু না আস্‌বে, লিখেছিল? তা এল কৈ?"

হেমলতা মৃদুস্বরে কহিল, "যখন বলেচে তখন আস্‌বেই। হয়ত আবার কিসের কাজে আট্‌কে গেছে।"

"বাবা, আচ্ছা মা খুড়ী পেয়েছিল যাহোক্। বংশের মধ্যে একটা ছেলে, তবু সব এত অগোয়াজ্জি! বিদ্বান মা ছেলেকে দিলেন দেশের কাজে উচ্ছুগ্‌গু করে! দেব্‌তার কাজে লোক মোষ-পাঁঠাই উচ্ছুগ্‌গু করে—জানি। ছেলে বলি দিতে দেয়, এ ত কখনো শুনিনি। মায়ের এত দম্ভ—ভগবানও তা'ই নিচ্ছিলেন—ভাগ্যে কাকা ছিল তা'ই সে যাত্রা তরে এলো। আবার শুনলুম, ছেলে স্বদেশী হয়েছে—কোম্পানি থেকে পুলিশ আস্‌বে ধর্‌তে! পুলিশে চোর-ডাকাতই ধরে নে যায়, তাই জানি,—এ কিরে বাবা?" বলিয়া গৃহিণী বিরক্ত মুখে বধূর পানে চাহিয়া দেখিলেন। যেন ইহার মূলে অনেকখানি বধূরই অপরাধ!

তা' সে কথা তিনি মনে করিতেও পারেন। শুধু তিনি কেন, বাড়ীর সকলেই জানিত যে সেই অশান্ত যুবককে শাসন করিবার কিছুমাত্র শক্তি যদি এ-বাড়ীতে কাহারও থাকে ত সে তাহার খুড়িমারই ছিল। হেমলতার কথার উপর সে কখনও না বলিতে পারিত না। ছোটবেলায় কতদিন তাহাকে দুঃখ দিয়া সে নিজেই কাঁদিয়া হাট বসাইত। শেষ খুড়িমা

আসিয়াই তাহাকে শান্ত করিতেন। তা'ই অভিমানে পূর্ণ হইয়া ঠাকু'মা ভাবিতেন—বাহিরের লোক খুড়ী হইল আপন, আর হাতে করিয়া মানুষ করিয়া তিনি হইলেন পর! ইহাতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইত। অথচ কেহ ভাবিয়া দেখিত না যে কতখানি সহিয়া কতদূর সাবধানে চলিয়া তবে হেমলতাকে এই অসাধ্য সাধন করিতে হইত।

প্রথম দেখাতেই হিমু হেমলতাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিল। হেম হাসিয়া কহিল, "আমি তোমার দিদি হই না, বৌদি হই।"

হিমু একটুখানি ঠোঁট কুঁচ্‌কাইয়া তাচ্ছীল্যের সুরে কহিল, "উহু, তুমিই দিদি।"

আলোকনাথকে সে যে ভ্রাতৃ-সম্বোধনে সম্মত নয়, কথার ভাবে যেন উহাই বুঝাইল। হেম হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া স্নেহ-মাখা কণ্ঠে কহিল, "সেই বেশ। আমি দিদি, আর উনি বোনাই। কেমন?"

হিমু বুদ্ধিমতী, কিন্তু সংসারিক অনেক জ্ঞানেই অনভিজ্ঞা। বিস্মিত হইয়া সে কহিল, "উনি?"

"হ্যাঁ গো, আমার স্বামী! আমি দিদি হলে তিনি তোমার ভগ্নীপতি হলেন না?"

হিমু অনাগ্রহিতভাবে কহিল, "হলেন ত।"

এই মেয়েটিকে পাইয়া হেমও যেমন খুসী হইয়াছিল—হেমলতাকে দিদি বলিয়া হিমুরও তেমনি আনন্দ হইয়াছিল। ইহাকে না পাইলে এত বড় জাঁক-জমকের মধ্যে কেমন করিয়াই বা হিমুর দিন কাটিত! হিমু ছোট বেলায় একবার থিয়েটার দেখিয়াছিল, কি আশ্চর্য্য সাজ-সজ্জা—জরির পোষাক-পরা মুক্তার মালা গলায় দোলানো সব রাজা আর রাণী। আসন গ্রহণ করিয়া হিমুর ভাবনা হইয়াছিল, এমন দৃশ্য কতক্ষণই বা আর দেখিতে পাইবে? যদি সারারাত্রি ধরিয়া চলিত, তবু হয়ত কতকটা ক্ষোভ মিটিত

পারিত। কিন্তু সে ভুল তাহার কত শীঘ্রই না ভাঙিয়া গিয়াছিল! চঞ্চলা হিমু অভিনয়ের অর্দ্ধাংশ না হইতেই বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভাবিয়াছিল—এত দীর্ঘ কাল কি ঐ একঘেয়ে রাজা-রাণী ও রাজ-ঐশ্বর্য্য ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিতে পারা যায়? সে তখন লেখাপড়া জানিত না। গল্পের বিষয় কিছুই বুঝিতেছিল না, শুধু দর্শক মাত্র। মনে হইল, অরুণের কাছে সে আজ কত ঋণী। নহিলে সে দিনের সহিত এ দিনের আজ কোন তফাৎ থাকিত না। আলোকনাথের সুসজ্জিত লাইব্রেরি-কক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে তাহার জ্ঞান-দাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। এ ঘরে বাংলা বইয়ের চেয়ে ইংরাজী বই-ই অধিক। বরুণা ইংরাজী জানে শুনিয়া বছর খানেক হইতে সে যে ইংরাজী শিখিতে সুরু করিয়া ছিল, তাহা আজ সার্থক বলিয়া মনে হইল। শিক্ষকের অভাবে কায দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে নাই; ছুটিতে অরুণের কাছেই যেটুকু যা' পড়া হয়, তা'রপর কোন দিক হইতে কোন সাহায্যই আর পায় না। দুই-চারিটা শক্ত কথা বা বিশেষ কোন কঠিন মীমাংসা-স্থল চিঠিতে লিখিয়া সে অরুণের কাছে জানিয়া লয়। মেয়ের আগ্রহে মালতী দেবীর একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাড়ার স্কুল-মাষ্টারকে ধরিয়া যদি এ বিষয়ে কোন সাহায্য পান্! কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী দশনে অধর কাটিয়া বলিয়াছিলেন,—"ক্ষমা দাও রাণু, শেষ কি মেয়ের সখের জন্যে কলঙ্ক কিন্‌বে! একেই ত পাড়ার লোকে নিন্দে করে, এত-বড় থুবড়ো মেয়ে দেখে।"

মালতী দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন—থাক্, কাজ নাই গরীবের মেয়ের এত সখে!

এখানে সঙ্গী-অভাবে প্রথম দুই চারিদিন হিমুর একটু কষ্ট বোধ হইয়াছিল। হেমলতা বিছানা ছাড়িয়া বড় একটা উঠিতে পারে না। তাহার

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন সংবাদ

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অন্ধকারে হিমুকে একটু কাছে টা… ঠাকুরাণী গানের সুরে কহিলেন, "তোরা উলুধ্বনি দে। বিরহিণীর কপাল ফিরেচে। বলি, হ্যাঁলা হিমি, বর মনে ধরেচে লা'

অন্ধকারে দিদিমার মুখ দেখা গেল না। সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয় বিস্মিতভাবে কহিল, "বর! কার বর, দিদিমা—?"

দিদিমা রসিকতা করিয়া কহিলেন,, "যার বিয়ে তার মনে পাড়া-পড়্‌শীর ঘুম নেই! নাত্‌নি লো, এবার আইবুড়ো নাম ঘুচ্‌ল বর তোর, আবার কার!"

হিমু দিদিমার আর একটু কোল ঘেঁসিয়া সকৌতুকে কলি, দিদিমা, আমি ত দেখেনি।"

"না, তা কি আর দেখেচ ভাই! বর যে এখনই পায়ে পায়ে গাছের ফুলটি ফলটি নিজের হাতে পেড়ে দিচ্চে। অত সব দামী সাড়ী আনিয়ে দিলে—কেন বল্ দেখি? সুধু তোমার চাঁদপানা মুখ বুঝি— ভেবে রেখেচ? না গো, তা নয়। বাবু বলেচেন, বংশ-রক্ষে বিয়ে যখন কর্‌তেই হবে, তখন তোমায় পেলেই কর্‌বেন, নইলে নয়'

হিমু ঘোর অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল, "তবে ত সব বয়েই গেল? বৌ বেঁচে রয়েচে।"

দিদিমা কহিলেন, "সে ত মিথ্যে মানুষ,—ভাঙ্গা বাসন। তা কি সংসার-ধর্ম্ম বজায় থাকে! এত বড় সংসার—একটা ছো…

বে নেই—জল-পিণ্ডি চাই ত? আর তাও বলি
পারিত। কিন্তু ড়বে, সে অনেক কল্প তপস্যা করচে।"
হিমু অভিনয় করিয়া হাসিয়া কহিল, "দিদিমা, লোভে পাপ, পাপে
ভাবিয়াছিলন। ঐ বুড়োকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে যারা অনেক কল্প
ধৈর্য্য ; তাদের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে, চল, আমরা বাড়ী ফিরে যাই।
কিন্তু তা ত আর হবে না—আমার মার জন্যে মন কেমন কচ্চে।"
...ার ভাব—ভাষার উষ্ণতাতেই প্রকাশ পাইতেছিল। এই স্বাধীন-
আদুরে মেয়েটিকে তিনি বেশ ভাল করিয়াই চিনিতেন, তবু আশা
পারিলেন না। অনাথার কন্যা বিনা পণে যুবা-বরে যদি নাই
বুড়ায় ক্ষতি কি? অর্থ-কষ্ট, অন্ন-কষ্ট ত কখনো পাইবে না।
আছে—তা' থাক্! কিছুদিন পূর্ব্বে এ ব্যাপার ত ঘরে-ঘরেই ছিল।
...ের অনভ্যাসে মেয়েদের অত অসহিষ্ণু হইলেই বা চলিবে কেন?
তুই। হইলেই মন ভরিয়া যাইবে। সব দিকের সব সুবিধাই কি
পায়? মনের বিরক্তি দমন করিয়া শান্তভাবে মুক্তা ঠাকুরাণী কহিলেন,
খুঁদনি তা বলে—ওর আর বয়স কত? চুলও পাকেনি,
পড়েনি। বুড়ো দেখ্‌লি কোনখানটায়? তুইই বা কি খুকী,

দিদিমার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া স্নেহপূর্ণ মৃদুস্বরে কহিল,
...াত্‌নী হতে পারি তবু। তুমি বাপু গঙ্গাজোলেদের ভাব্‌না ছেড়ে
...িয়ে পড় দেখি। সকাল হলেই উঠে ওর জিনিষ-পত্র সব ফিরিয়ে
...। কে জানে বাপু, এ-সব আবার ঘুষ! আমি ত ভেবেছিলুম,
...দের কায়দা—বাড়ীতে যে আসে, তাকেই বুঝি এম্‌নি সব দিতে
...াম:, ও-সব আর আমি ছোঁব কি না?"
...র পর প্রবল প্রতাপান্বিত মুক্তাঠাকুরাণী আর দ্বিতীয় কথা

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সঙ্গ হিমুর মত চঞ্চল প্রকৃতি মেয়ের কতক্ষণই বা মিষ্ট লা... ফল যাহা জিনিষ এত আছে যে দেখিয়া শেষ করা দায়—কিন্তু বিনা শান্তি চোখের দেখায় তুষ্ট হওয়া তাহার স্বভাব নয়। এই অভাবটা পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছিল, এমন সময় সহসা অতর্কিত বন্ধু-লাভ... সে দিন সকাল বেলা ভিজা ঘাসের জলে পা দুটি ভিজাইয়া হিমু... ভরিয়া ফুল তুলিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, পথে উদ্যান-বায়ু-সে... আলোকনাথের সহিত দেখা হইল। হিমুর আঁচল-ভরা ফুলের রা... ইঁহারই বাগানের ফুল—হয়ত এত ফুল নষ্ট করায় বাবু বিরক্ত হইবে... তাই একটু কুণ্ঠিতভাবে সে পথের ধারে সরিয়া দাঁড়াইল। মুখে সুধু ... লজ্জা-জড়িত কুণ্ঠিত হাসি! আলোকনাথ কাছে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে ক... "এত ভোরে ফুল তুল্‌তে এসেছ? আর ফুল চাই না কি? দাঁড়াও, ... তুলে দিচ্ছি।"

হিমু অবাক হইয়া গেল,—বকুনি ত খাইলই না, তাহার উপ... আবার ফুল তুলিয়া দিতে চান! হিমু আলোকনাথের প্রতি কৃতজ্ঞ... কহিল, "বড় একটা রাঙ্গা গোলাপ হলে মন্দ হোত না—মালায় ... দিতুম।"

"মালা গাঁথ্‌বে? এসো, আমি গোলাপ তুলে দিচ্চি। তা গো... তুমি তোলোনি কেন?"

হিমু কহিল, "বড় মালী বল্‌ছিল, ও-সব গাছে হাত দিয়ো না—"

"ওঃ!" বলিয়া আলোকনাথ অগ্রসর হইলে হিমু ফিরিল। মা... ব্যস্ত হইয়া ফুল তুলিয়া দিতে আসিয়া ধমক খাইয়া সরিয়া গেল; হিমুর সাক্ষাতেই বাবুর আদেশ প্রচারিত হইল—অতঃপর যে-কোন গ... ফুল তোলায় কেহ যেন তাহাকে বাধা না দেয়।

ইহার পর প্রায়ই আলোকনাথ ও হিমুকে বাগানে দেখা

প্রত্যাবর্ত্তন

ান্ পাখীটার কি নাম, কোন পায়রাটা কেমন করিয়া পারি নতে শিখিল, ময়নাটাকে কে এত কথা শিখাইয়াছে—এই সকল হি ইহার সত্য-মিথ্যা উত্তর-প্রত্যুত্তরে এই তরুণী মেয়েটি ও প্রৌঢ় কর্ত্তার সকাল-সন্ধ্যা বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। মানুষ যা পায়—তা তেই যদি তুষ্ট হইতে জানিত, তবে সংসারে অনেক দুঃখ-অশান্তি ক মিয়া যাইত। কিন্তু মানুষের স্বভাব ঠিক ইহার বিপরীত! আলোকনাথও ভগবানের অনেক করুণাই অযাচিতরূপে পাইয়াছিল। অবিমিশ্র সুখলাভ বের আয়ত্তের বাহিরে। যে অভাব ছিল, যাহা এতদিন অভাব-রূপে াকে পীড়িত করিতে পারে নাই, আজ এই সুন্দর মেয়েটির সঙ্গ-মোহে অভাব-দুঃখই তাহার সকল সুখের মাত্রা ছাপাইয়া উঠিল। মনে হল, জীবনের তিনভাগ সময় বৃথাই ব্যয়িত হইয়াছে, দাম্পত্য জীবনের কান সুখই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। মানুষ যখন অভাব অনুভব করে, খন তাহা পূরণের ইচ্ছাও মনে উঠে। আলোকনাথের মনে হইল, হিমুকে পাইলে তাহার জীবনের সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হইবে। মা ত াভাষে ইহাই জানাইতেছেন। হিমুও তাহাকে অপছন্দ করে না। বহুকাল তাহার মুখ চাহিয়া সে সময় নষ্ট করিয়াছে—চিরদিনই বা রিবে কেন?

কহিলেন না। তিনি জানিতেন, ইহার পর বাদ-প্রতিবাদের ফল যাহা ঘটিবে, তাহা উভয় পক্ষেরই সুখকর হইবে না। হয়ত অপরেরও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে।

দিদিমার অনুনয়-বিনয় ও উপদেশের মাত্রা ও বাড়ীর লোকদের আদর-যত্ন যতই অধিক হইতেছিল, হিমুরও সেই পরিমাণে এখান হইতে পলাইয়া যাইবার ইচ্ছায় মনটা ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

এ বাড়ীতে আর এক-মুহূর্ত্ত বাস করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না! আলোকনাথের সহিত বিবাহের কথা ওঠায় বাড়ীর সকলকার কাছেই সে এখন নিজেকে অপরাধিনী বলিয়া মনে করে। যে রুগ্না দিদি যথার্থ ভগ্নী-স্নেহে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছিল, সাপের মত তাহারই রোগজীর্ণ বক্ষে সেই কি না শেষ ছোবল মারিল! ছি—ছি কি ঘৃনা! কেমন করিয়া হিমু আর তাঁহার কাছে নিজে পোড়ার মুখ বাহির করিবে? তা'ই এ বাড়ীর একমাত্র আকর্ষণীয় মানুষটির সঙ্গ সে ইচ্ছা করিয়াই ত্যাগ করিয়াছে। প্রথম দুই তিনদিন হিমু মনে করিয়াছিল, হেমলতা হয়ত তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে। যদি ডাকে, সে কেমন করিয়া যাইবে? তবু এই ডাকের প্রতীক্ষাতেই সে উন্মনা হইয়া বসিয়া থাকিত। ক্রমে সে আশাও ফুরাইল, সেখান হইতে ডাক আসিল না। এ চিন্তায় হিমুর ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যথিত হইলেও প্রতিকারের পথ দেখিতে পাইল না। সে কি নিজ হইতে দিদির পায়ে পড়িয়া বলিবে, "আমার কোন দোষ নেই—ও-সব ছাইয়ের কথা আমার একটুও ভাল লাগে না। তুমি কর্ত্তাবাবুকে বারণ কর দিদি, ও-সব বল্‌তে!—বাঃ তাও কি কখনো হয়? ছি! এ সব ভারী লজ্জা—ভারী বিশ্রী!"

হিমু এই চিন্তাটিকে চাপা দিবারই চেষ্টা করিল। দিদির সঙ্গ ছাড়া আর একটি লোভের জিনিষও ছিল, বাগানে ফুল তুলিয়া বেড়ানো। এ

লোভও তাহাকে দমন করিতে হইয়াছিল। আজকাল হিমু বাগানে নামিলেই আলোকনাথের বায়ু-সেবনেচ্ছা বর্দ্ধিত হয়। প্রথম প্রথম না জানিয়া সে যখন ইঁহার সাহায্য লইয়াছিল—তখন খুসী হইয়াই লইয়াছিল। সরলা হিমু ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বুঝিত না। বাবুর এ অযাচিত অনুগ্রেহরও তা'ই সে কারণ-অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয় নাই। এই সব নূতন নূতন পাখী—হিমু ইহাদের নামও জানে না—গুণাবলী ত জানেই না। এত রকম যে ফুল,—ইহাদের সম্বন্ধেও তাহার অজ্ঞতার সীমা নাই। অরুণের কাছে এ সকলের গল্প করিবার সময় শুধু পরিপূর্ণ আনন্দোজ্জ্বল মনটুকু ছাড়া তাহার তহবিলে সঞ্চয় কিছুই হইত না। এমন সময় বাবু যখন অযাচিতভাবে তাহাকে সঙ্গ দিয়া সকল সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন স্বতঃই কৃতজ্ঞতায় তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাবু তাহার দিদির স্বামী—তাঁহারই বাড়ীতে ইহারা অতিথি—তা' ছাড়া সম্বন্ধ যখন হইল ভগ্নীপতি—তখন ইহার সঙ্গ খুসী হইয়াই বা সে গ্রহণ না করিবে কেন মনে ইঁহার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধাই জাগিল। এমনি করিয়া ঘনিষ্ঠতা যখন বর্দ্ধিত হইল, তখন সে দিদিমার মুখে শুনিল, বাবু তাহাকে বিবাহ করিতে চহিয়াছেন। দিদিমাকে ধমক দিয়া থামাইয়া দিলেও বাড়ীর গৃহিণী কর্ত্তা-মা হইতে সকলকার মুখেই ঐ একই কথা। এ বাড়ীর কর্ত্রীর আসন খালি নাই, অর্দ্ধমৃতা এখনও সেখানে সে পড়িয়া আছে যে! ধিক্কারে হিমুর আপাদ-মস্তক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। না জানিয়া, না বুঝিয়া সে এ কি কাণ্ড করিয়াছে? কাহাকে সঙ্গ দিয়া কাহার সঙ্গ লইয়া সে আজ লোক-চক্ষে নিজেকে এত অবহেলার পাত্র করিয়া বসিল! দিদিমা রথ না দেখিয়া কোন মতেই বাড়ী ফিরিবেন না। তাহারও এখনো কয়দিন দেরী রহিয়াছে। কিন্তু হিমু যে এখানকার বাতাসে আর স্বচ্ছন্দে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না! হরিণীকে বেড়া-জালে আবদ্ধ করিলে তাহার যেমন

অবস্থা হয়, হিমুরও নিজেকে তেমনি অসহায় মনে হইতেছিল। আলোকনাথের মা এখন তাহাকে অধিক যত্ন দেখান, স্নানাহারের তদারকে ব্যস্ত হ'ন, দাসী-চাকরেরা সম্ভ্রম করিয়া চলে। তাহার নিজের জন্য সুসজ্জিত কক্ষ, ভাল ভাল কাপড়-চোপড়,—মুক্তা ঠাকুরাণীরও আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হইতেছিল না! তাঁহার মুখে প্রসন্নতার ছায়াই দেখা যাইত। তবু মুক্ত আকাশের পাখী সোনার পিঞ্জরের ভয়ে আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। কতক্ষণে এ রাজ-প্রাসাদের রাজ-ভোগ ছাড়িয়া সে তাহার কুটির-বাসিনী মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইবে, ইহাই ছিল তা'র প্রতি-মুহূর্ত্তের কামনা। ইহারই মধ্যে নিজের জন্য হিমু একটুখানি নিরাপদ আশ্রয় আবিষ্কার করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের লাইব্রেরী কক্ষ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে তাহার সব দুঃখ ভুলাইয়া দিত। সে জানিত, বাড়ীর অনেক কক্ষেই বাবুর শুভাগমন-সম্ভাবনা, কিন্তু এদিকটায় না'ই। চাকরেরা সকাল বেলা ঘরে ঝাঁট দিয়া ঝাড়া-মোছার কাজ সারিয়া চলিয়া যায়। তাহার পর এ অংশের সহিত বাড়ীর লোকের আর কোন সংস্রব থাকে না। বাবুর ভাইপোর কড়া হুকুম, তাই, নইলে বাড়ীর অন্য কাহারও সহানুভূতি এখানে বর্ত্তমান ছিল না। দিন-যাপনের জন্য হিমু এই নির্জ্জন স্থানটিকেই নিজের জন্য বাছিয়া লইল। বাবু যে আজকাল অনেক সময় অকারণে বাড়ীর ভিতর আসিয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া যান, সকালে সন্ধ্যায় কোন বন-দেবীর আবির্ভাব-আশায় উন্মনা হইয়া বাগানে পদচারণ করিয়া ফিরেন, মুক্তা ঠাকুরাণীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহা এড়াইয়া যায় না। কিন্তু তিনি আর করিবেন কি? বিধাতা যে এখানে সমানে সমান মিলাইয়াছেন। নাতিনীটি ত বিক্রমে তাঁহার নীচে নয়,—শাসনে বাধ্য হইবে, সে পাত্রীও সে নয়। অগত্যা মনের ক্ষোভ মনে রাখিয়া তাঁহাকে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইতেছিল। মায়ের মত হউক, দেখিয়া লইবেন—সে কত বড় জেদী

মেয়ে—আর তিনিও 'মুক্তা বাম্‌নি' কেও-কেটা ন'ন ! তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূরদর্শিনী ঠাকুরাণীটি জানিতেন যে দুইটা প্রবল গ্রহের ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে সহিয়া থাকাই ভাল। সবুরেই মেওয়া ফলে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

উপহারের পরিণাম

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। লাইব্রেরী ঘরের জানালা-দরজা-গুলার অধিকাংশই বন্ধ রহিয়াছে। জানালার শিরোভাগের রঙ্গিন কাচা-বরণের মধ্য দিয়া নীল লাল সবুজ রঙের আলোক-রশ্মি ঘরের দেওয়ালে ও স্থানে স্থানে রেখাপাত করিতেছিল। দক্ষিণের বড় দরজাটা খুলিয়া দিয়া তাহারই একদিকে পিঠ রাখিয়া অপর ভাগে পা বাড়াইয়া বসিয়া হিমু একখানি কাব্য-গ্রন্থ পড়িতেছিল। খোলা দরজাটার বাহিরে মার্ব্বেল-মণ্ডিত লম্বা দালান, তাহার শেষ অংশে চিত্র-করা লোহার রেলিং-ঘেরা—তাহার নীচেই বাগান। এ দিকটা বাড়ীর পিছন্ দিক। বাগানটি ফুলের নয়—ফলের। বড় বড় আম জাম কাঁঠাল জামরুল গোলাপজাম পিচ্ বাতাবি লেবু ফল্‌সা নারিকেল তাল আরও কত গাছ-পালা। বাগানের মাঝখানে পুকুর। তাহার বাঁধান চাতালের চারিপাশে সুপারি গাছের সারি। এ বাগানে হিমু বড় যাইত না। তাহার ভয়-ভয় করিত। বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা নির্জ্জন বীথি—বাতাসের গাছের পাতা দুলাইয়া হা-হা রব! সঙ্গী থাকিলে তাহাকে ভয় না দেখাইয়া প্রলোভনে হয়ত ফেলিত। গাছে উঠিবার বিদ্যাটা এখানে প্রকাশের ইচ্ছা না থাকিলেও তলায় কুড়াইলেই যথেষ্ট; কিন্তু উপস্থিত মনোভাবে অথবা রাজভোগে পরিতুষ্ট রসনা এদিকে প্রলুব্ধ হয় নাই।

জামরুল গাছে বসিয়া একটা কালো কোকিল অনেকক্ষণ হইতেই হিমুর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার প্রয়াসেই বুঝি থাকিয়া থাকিয়া 'কুহু

কুহু' করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। কাব্য-রসাস্বাদিনীর সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। ভিতরের দিকের খোলা দরজা দিয়া বলাইয়ের মা ঝী একখানি রূপার পাত্রে অনেকগুলি বাছাই করা ভাল ভাল ফুল ও একটি সুন্দর তোড়া সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে কহিল, "এই যে দিদিমণি, তুমি এখানে—তোমার জন্যে আমি সারা বড়ীখান্ তল্লাস করে বেড়াচ্চি।"

হিমু মুখ তুলিয়া চাহিতেই ফুলের উপর চোক পড়িল। সে বুঝিল এ উপহার ঝীয়ের নয়। গভীর বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল; সে কহিল, "এত খোঁজাখুঁজির দরকার? আমি ত তোমাদের কিছু চুরি করে পালাইনি?" কথা-শেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টি পুনরায় বইয়ের অক্ষরে নামাইল।

বলাইয়ের মার বয়স কম—এখনও যৌবনের সবুজ হাওয়া তাহার শরীরের মধ্যে নাচিয়া ফিরে। সে বিধবা, তবু পাড়ওয়ালা সাড়ী পরে, হাতে তিনগাছি করিয়া কাচের চুড়ি, উপর হাতে সোনার তাগা, এবং সাড়ীর নীচে রূপার বিছা। ভাল করিয়া চুণ দিয়া পান সাজিয়া পাত্‌লা ঠোঁট রাঙা করিয়া রাখে, সুবিধা পাইলে ছড়া কাটে, গুণ গুণ করিয়া গান গায়, বধূ-ঠাকুরাণীর সহিত সময় বুঝিয়া একটা-আধটা রসিকতাও করিয়া থাকে। এ-ছাড়া তাহার আর কোন অপবাদ ছিল না। সে অল্প বয়সে বলাইকে কোলে লইয়া বিধবা হয়, সেই পর্য্যন্ত এই আশ্রয়েই কাটাইতেছে। হেমলতা তাহাকে ভালবাসিত। সাধারণ দাসীদের চেয়ে সে উচ্চশ্রেণীর। সে হেমলতার পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া দিত, দুপুরবেলার তাসখেলার সঙ্গী হইত; গৃহিণীর পাকা চুল তুলিত। সংসারের ছোট কাজ তাহাকে কিছু করিতে হইত না। এখন—বিধান সবই বদল হইয়া গিয়াছে। হেমলতা আর চুল বাঁধে না, তাস খেলে না, রসালাপ করে না, সে নিজের রোগ-

শুশ্রূষাতেই কাতর—বলাইয়ের মার মন যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের ভার আর বিষণ্ণ মুখ—এ যেন সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। হিমু আসায় দিনকতক মন্দ কাটে নাই। আনন্দময়ী মেয়েটি নিজের আনন্দের আলো চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া কলকণ্ঠের হাস্যোচ্ছ্বাসে নিরানন্দ পুরীতে অমৃতের নির্ঝর বহাইয়া গৃহবাসীদের পাষাণ মনে যেন সোনার কাঠি বুলাইয়া ধীরে ধীরে আবার চেতনা ফিরাইয়া আনিতেছিল। মেয়েটির আত্ম-পর বিচার নাই, আব্দার-বায়নারও অন্ত নাই। এ বাড়ীতে যে এই জিনিষটিরই একান্ত অভাব। তা'ই মরা গাঙ্গে আবার জোয়ারের উচ্ছ্বাস সূচিত হওয়ায় বাড়ীর সব লোকই একটু তাজা হইয়া উঠিতেছিল। হেমলতার শীর্ণ অধরে হাসির রেখা প্রায়ই মিলাইবার অবকাশ পাইতেছিল না। মরণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া আরও যেন কিছু পাইবার আছে, এমনি একটা ভাবের উচ্ছ্বাসে রোগের গতিও দিনকতক একটু মন্থর হইয়া পড়িতেছিল। স্বামীকে আজকাল আর কাছে পায় না—দিন-রাত একঘেয়ে রোগের ইতিহাসে বিরক্ত হইয়া অনেকদিন হইতেই স্বামী নিজের পথ বাছিয়া লইয়া ছিলেন। তবু অনেকদিনের অভ্যাসদোষেও, হয়ত কতকটা আকর্ষণও ইহার মধ্যে ছিল, প্রত্যহ বাড়ীর ভিতর খাইতে আসিয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। এমনি একদিন অতর্কিত অবস্থায় এলোকেশী রূপের ডালি প্রস্ফুট-যৌবনা তন্বঙ্গী তরুণীকে দেখিয়া আলোকনাথের দৃষ্টি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেল। সংসারে ভোগের জিনিষ অনেক পাইলেও তাঁহার মনে হইল, জীবনে এমনটি যে না পাইল, তাহার জন্মই বৃথা! অবশ্য সেই প্রথম দিনের প্রথম দর্শনেই এমন ভাব কিছু তাঁহার মনে আসে নাই। তখন কেবল সৌন্দর্য্যের আকর্ষণেই সে মেয়েটির পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল। ক্রমে দর্শনের আকর্ষণ যতই বাড়িতে লাগিল, দ্রষ্টব্য যতই সুলভ হইয়া দেখা দিল, ততই মানুষের

আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ দুর্ব্বল মন প্রিয়পাত্রকে কাছে পাইবার জন্যই অধীর হইতে লাগিল। মায়ের কাছে নির্জ্জনে অনুকূল প্রার্থনাই শুনিতে পাইল—"গরিবের মেয়ে পার হচ্ছে না—তোর নাম করে মাসী এখানে এসেচে। দে বাবা, ওর দায় উদ্ধার করে। খাসা মেয়ে—এমনিটিই রাজার ঘরে মানায়। আমার কি তেমন বরাত যে কথা দেব? সে ছোঁড়া নাই করুক্, তুই ওর দায় উদ্ধার কর্ত্তে পারিস্।"

সাগর-সেঁচা মাণিক এত সহজে বিকায়? আলোকনাথ লজ্জিত মুখে কহিল, "বুড়োকে অমন মেয়ে দিতে ওঁরাই বা রাজী হবেন কেন? বিশেষ সতীনে।"

"রাজী হবে না! শোনো কথা! তুই হলি বুড়ো! বেটা ছেলের কি বয়সের বিচার থাকে না কি? শোনো মাসী,—ছেলের কথা শুনে যাও। উনি বল্‌চেন, বুড়োকে তোমরা মেয়ে দেবে না—।"

মুক্তা ঠাকুরাণী বাহির দালানে বসিয়া দাইলের খুদ ঝাড়িতেছিলেন। গৃহিণীর আহ্বানে ললাট-ঢাকা ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন "ওঁর তপিস্তে থাকে, তবে ত হবে। মা দুঃখী রাঁড়ী—উপায় নেই বলেই না পার হচ্ছে না। আর হোক না হোক, সত্যি কথা বল্‌ব বাছা, পুরুষ মানুষের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর কি আবার বয়স? এখনকার ছেলেরা সব পাশ করে চাক্‌রি করে যে বিয়ে কর্‌চে, তাদেরই কি আর বিয়ের বয়েস থাক্‌চে? সে সব ছিল সেকালে বটে। ছেলে-মেয়ে সবারই ছোট বেলায় বিয়ে হোত। এখন আর ও-সব নেই।" ইহার পর হেমলতার অনুমতি না লইয়াই—আলোকনাথ নিজ বিবাহে যে সম্মতি জানাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আলোকনাথ পাত্রীর সহিত আলাপ করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দেখিয়াছে, সেও তাঁহাকে অপছন্দ করে না। হেম? তাহার অনুমতি আশা করাই ভুল।

সে যদি সন্তান দিয়া স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিত, তবে এ-সব ঝঞ্ঝাটের প্রয়োজনই বা কি ছিল? লোকে যা'ই বলুক সত্যই ত, সে কচি ছেলেটি নয়। বোঝে সবই—কিন্তু সবের উপর পিতৃ-ঋণ! আলোকনাথ পণ্ডিতের কাছে এই শ্লোকাংশটি শিখিয়া লইয়াছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনং।" সকল সমস্যার মীমাংসা ত এইখানেই হইয়া গেল।

দাসী হাসিমুখে কহিল, "দিদিমণি চোখ নামালে যে? ফুল নাও। বাবু হাতে বেছে বেছে তুলে দিয়েচে গো! চেয়ে দেখ—

হিমু অপাঙ্গে তাহার হাস্যময় মুখের পানে চাহিয়া বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া কহিল, "দিদির ঘরে দিয়ে এস। বাবুর তোলা ফুল—তিনি খুসী হবেন। আমার দরকার নেই।"

দাসী বুঝিল, হিমানী রাগিয়াছে। তবু এ রাগটা যে কোন্ দিক হইতে জন্মিল, তাহার সূত্র খুঁজিয়া না পাইয়া সে কহিল, "তাঁর ঘরে মালীরা রোজই ফুল পাঠায়, আজও পাঠিয়েচে—এ তোমার জন্যে গো, নাও, ধর।"

হিমু ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "তবে তাঁকে ফিরিয়ে দাওগে—।"

"ওরে বাস্‌রে—তবেই হয়েচে আর কি! নাও বাপু, এই রইল তোমার ফুল, ফিরে দিতে হয়, তুমিই দিও—তোমাদের ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে পড়ে গরিব কি শেষে মারা যাব?"

হিমু মুখ তুলিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "বাবু আমায় ফুল পাঠান কেন? তাঁর বাড়ীতে যে-কেউ অতিথ আসে, তাকেই কি তিনি এমনি করেন?"

দাসী তাহার উত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া থ' হইয়া গিয়াছিল, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, "সবাই—সে আর কথা! বাবু তোমায় ভালবেসে দিয়েচেন, দিদিমণি—"

বাধা দিয়া সবেগে হিমু কহিল, "ভালবেসে তাঁর স্ত্রীকে দিন গে—সে মরচে ও দিকে—আর বুড়োর খেলা পড়ে গেল!"

হিমু মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল দেখিয়া বলাইয়ের মা সহানুভূতির স্বরে কহিল, "যা বলেচো দিদিমণি—পুরুষ-মানুষদের দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেল—নৈলে ঐ বৌঠাকৃরুণেরই কি এক দিন কম আদর ছিল? বাবু ত চোখে হারাত! যেন জোড়া পায়রা দুটি—এক দণ্ড কাছ ছাড়াছাড়ি ছিল না! তার জন্যে বৌঠাকৃরুণকেই উল্টে মাঠাকৃরুণের কাছে কত ফৈজত শুনতে হোত! বাবু রাস্তায় বেরুত যদি, বৌঠাকৃরুণ জান্‌লায় দাঁড়িয়ে থাক্‌ত—এই বলাইয়ের মা অনেকই ত দেখ্‌লে দিদি, এখন কালে-ভদ্রে খবর নিতে যান। তাও বিয়ের কথা উঠে অব্‌ধি ও রাস্তা আর মাড়াননি। যতই হোক, সোয়ামী ত, এত তাচ্ছিল্যি কি সহ্য হয় গা? বৌঠাকৃরুণ যাই মাটীর মানুষ, তাই মুখটি বুজে সব সইচেন! তোমরা আমরা হলে কক্ষনো এ পারতুম না বাপু, তা হক্‌ কথা বল্‌ব!"

অতীতের আন্দোলনে সহানুভূতিতে বলাইয়ের মার চোখের পাতায় জলের আভাষ ফুটিয়াছিল। হিমুরও অন্যমনস্কে ক্রোধের তাপটা একটুখানি কমিয়া আসিয়াছিল। তাহার মনে পড়িল, সে পুস্তকে পড়িয়াছে, "দূত অবধ্য।" সত্যই ত, ইহারা বেতন লয়, মনিবের আদেশ-পালনে বাধা—ইহার প্রতি ক্রোধ-প্রকাশে ফলই বা কি? আহা, দুঃখিনী দিদিকে এখনও ত ভালবাসে।

হাত বাড়াইয়া ফুলের পাত্রখানা টানিয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইলে, বলাইয়ের মা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, যতই হোক্‌, ছেলে মানুষ ত—এরি মধ্যে ফুল দেখিয়া রাগ ভুলিয়া গেল। কিন্তু এ চিন্তা শুধু মুহূর্ত্তের জন্য! বলাইয়ের মার নিষেধের পূর্ব্বেই হিমু উঠিয়া বারান্দার রেলিংয়ের বাহিরে অন্ধকার বাগানের জঙ্গলময় অংশের দিকে ফুলগুলি

উজাড় করিয়া ফেলিয়া দিয়া পাত্রখানা দাসীর হাতে ফিরাইয়া দিল। অল্পক্ষণের এই পরিচয়টুকুতে বলাইয়ের মা হিমুকে যতটুকু চিনিয়াছিল—তাহাতে ফুলগুলির পরিণাম সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া শুধু মৃদুস্বরে সে কহিল, "মুস্কিল কল্লে দিদিমণি! বাবু যদি কিছু সুধোয়—কি যে জবাব দেব?"

তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া প্রশান্ত স্বরে হিমু কহিল, "সত্যি কথাই বল্‌বে—তাঁরও ফুল তোল্‌বার সখ্ মিট্‌বে, আমারও তোমাদের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে হবে না।"

"মিথ্যে বলনি দিদি ঠাক্‌রুণ। তুমি একেবারে কেল্লার গোরা—বাবুর দেখ্‌ছি, বরাতে অনেক দুঃখু লেখা আছে—" বলিয়া দাসী এতক্ষণের বাক্‌বিতণ্ডার পর একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

হিমু বইখানা মুড়িয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। রৌদ্রালোক ম্লান হইয়া সন্ধ্যার সূচনা জানাইতেছিল। গাছ-পালার ছায়ায় এ দিক্‌টা ইহারই মধ্যে বেশ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। মুক্ত আকাশে কদাচিৎ দুই-একটি পাখী উড়িয়া যাইতেছে। চিম্‌নীর পথ দিয়া কখনও পাখীর ডাক কানে আসিয়া বাজিতেছিল। বাহিরে প্রচুর স্বাধীনতা! তবু কি অসহায় সে! পৃথিবীটার এ-সব অংশের সহিত তাহার যে পরিচয় নাই। মনে সে কখনো এমন সব বিষয়ের কল্পনা জাগায় নাই! এখানে একমাত্র আশ্রয় দিদিমা—তিনিও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছেন! তবে কে তাহাকে এ বিপদে রক্ষা করিবে—? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে জুতার আওয়াজ শোনা গেল। হিমু মুখ ফিরাইয়া লইল। মনে হইল, বাবু এইবার সশরীরে তাহার অবাধ্যতার দণ্ড বিধান করিতে আসিতেছেন। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া সে তাহার তীক্ষ্ণ-ধার রসনাকে সংযত করিল। ছি—উহারই বাড়ীতে বসিয়া উহার সহিত কি কোমর বাঁধিয়া মেছুনীদের মত ঝগড়া

বাধাইবে সে ? বাড়ী ছাড়িয়া একবার যাইতে পারিলে তখন কেই বা আর তা'র নাগাল পাইবে ? হিমু ভাবিতেছিল, মার কোলে মুখ লুকাইলে কেহ আর তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল—খুব বেশী সময় নয়। তবু চুপ করিয়া কৌতূহল সহ্য করা হিমুর স্বভাব-বিরুদ্ধ। রাগের মূর্ত্তীভূত ফুলগুলা এখনও ময়লা গাদার পাশে পড়িয়া আছে—সুতরাং অন্তরে তাহার কৌতুক-হাস্যেরও একটি সুর বাজিতেছিল। সে মুখ ফিরাইয়া অপমানিতের রোষ-দীপ্ত মুখের পানে চাহিতে গিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। যে আসিতেছিল, সে একজন যুবাপুরুষ। হিমু তাহাকে এ-বাড়ীতে আর কখনও দেখে নাই—বাহিরের আমলা-কর্ম্মচারীরা, বাবুর মোসাহেববৃন্দ সকলেই যে তাহার পরিচিত, তাহা নয়—তবু অন্দরে যাহাদের যাতায়াত চলে, তাহাদের সকলকেই হিমু চিনে। ঘরে কেদারা, কৌচ, সোফার বাহুল্য-সত্ত্বেও কেহ যে সাধ করিয়া মাটীতে বসিয়া পুস্তকাধ্যয়ন করিতে পারে, সম্ভবতঃ আগন্তুকের তাহা খেয়ালে আসে নাই। বাহিরের অন্ধকার দালান হইতে ঘরে ঢুকিয়া প্রথমটা সে ঘরের দিকেই চাহিয়াছিল। পরে যখন হিমুর উপর দৃষ্টি পড়িল—হিমুর বিস্মিত দৃষ্টি তখন তাহারই উপর ন্যস্ত।

"আমি বুঝ্‌তে পারিনি, ঘরে কেউ আছেন!—" নিজের অনুচিত আগমনের স্বপক্ষে এই একটিমাত্র কৈফিয়ৎ দিয়াই আগন্তুক কুণ্ঠিত ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া গেলে হিমু তাহার চলিয়া যাওয়া পথের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জলদের চাকরি

সুপারিশের জোরে বি-এ পাশ করিয়াই জলদ ডেপুটি হইয়া চট্টগ্রামে আসিল। সঙ্গে স্ত্রী ও মা আসিবেন বলিয়া স্থির ছিল, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিল না। জলদের মেজ বোন ঊষাঙ্গিনীর ছেলের অন্ন-প্রাশনের আর সতেরো দিন দেরী। সে প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে পাঁচ-ছয়খানি চিঠিতে মা ও ভাজেদের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছে—খোকার ভাতে সকলকে যাইতে হইবে। বড়মানুষ কুটুম! তাহাতে আবার অত্যন্ত অমায়িক। বাড়ীর ছেলো-বুড়ো সকলেই মাটীর মানুষ। প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন। ঘটাও খুব হইবে। যাত্রা, থিয়েটার, রামকমলের কথকতা, বায়স্কোপ, আরও কত-কি আয়োজন হইবে! তালিকা পাইয়া ছেলেমেয়ে ও বধূদের দলে উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল। কর্ত্তা-গৃহিণী বুড়ো বয়সে সখ মানায়না ভাবিয়া যেন অনিচ্ছাতেও বাধ্য হইয়া ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছায় ও কুটুম্বের আগ্রহে সম্মতি দিলেন। কেবল খুসী হইল না জলদের স্ত্রী সুনীতি। স্বামীকে ছাড়িয়া তাহাকে থাকিতে হইল ত বটেই, তা' ছাড়া উপস্থিত সুযোগ হারাইলে আবার যে কবে সুযোগ মিলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? বড় সংসারে অসুখ-বিসুখ, তা'ছাড়া নিত্যই কত অন্তরায় লাগিয়া আছে! সকল দিকে সুযোগ ঘটিলে তবে ত বাহির হওয়া যাইবে? এই প্রথম সে বাসায় যাইবে। শাশুড়ী সঙ্গে গিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া না আসিলে চলিবে না। বড় খোকা আবার ঠাকু'মার খুবই স্যাওটা। তাঁহাকে

ছাড়িয়া এক রাত্রিও সে কোথাও থাকিতে পারে না। সঙ্গে সুনীতির যাওয়া ঘটিল না বলিয়া জলদও ক্ষুণ্ণ হইল। তবু সে স্ত্রীকে উৎসাহ দিয়া কহিল,—"মাসখানেক দেরী হবে, তার আর কি করা যাবে? এক্ রকম করে কেটে যাবে। তোমার কি বল—কেমন মজা করে নিমন্ত্রণ খাবে, থিয়েটার, নাচ-তামাসা দেখ্‌বে, আমি বেচারাই কড়িকাঠ গুণে দিন কাটাব। চিঠিতে একটু-আধটু আমাকেও ভাগ দিও, যদি ভুলে না যাও। শুনেও তবু পেট ভরান যাবে। খোস-খবরের ঝুটোও ভাল।"

সুনীতি উদ্গত অশ্রু রুদ্ধ করিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—"ছাই আমোদ! আমার যদি একটুও ভাল লাগ্‌চে! তুমি হাস্‌চ! তোমার আমোদ হয়েছে খুব, আমার যাওয়া হলোনা বলে, না? বেশ, যাও, তুমি একলাই যাও! আমি ত যেতে চাইব না আর-কখনও, ফিরে এসেও না। ...কোগে না তুমি একলা গিয়ে! কে চায় তোমার কাছে থাক্‌তে?"

ষোল বছরের ছেলে জলদের সহিত যখন দশ বছরের মেয়ে সুনীতির বিবাহ হয়, তখন অনেকেই পুতুল-খেলার সহিত এ বিবাহের উপমা দিয়াছিল। অবশ্য বিশ বছর আগে হইলে এ কথা উঠিতও না। বরং ইহার ব্যতিক্রমে লোকে নিন্দাই করিত। কিন্তু এখন মেয়েদের দশ বছরে বিবাহের কল্পনাও বড় কেহ করেন না। ছেলেদেরও উপার্জ্জনক্ষম হইবার আশায় অনেকে অপেক্ষা করেন।

জলদের বাপ-মার একটি ছোট মেয়ে আনিয়া পুতুল-খেলার সখ খুব না থাকিলেও ছোট মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ও তাহার ভালবাসা পাইয়া ইচ্ছানুরূপ তাহাকে গড়িয়া লইবার সাধটাই হইয়াছিল বেশী। বয়স্কা বধূ আনিয়া কৃতী পুত্রের সংসার গড়িয়া দেওয়া চলিতে পারে, তাহাকে লইয়া পাঁচজনের সংসারে মিলাইয়া পরিবারবর্গের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী করিয়া গড়িয়া তোলা বড় কঠিন। মাটী নরম থাকিলে গড়ার সুবিধা যতটা হয়, কঠিন

হইয়া গেলে তেমন আর হয়না। সুনীতি মেয়েটীও বড় নমনীয়। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে মা-বাপের মতই ভালবাসিয়া একান্ত মনে তাঁহাদেরই হইয়া গেল। দেওর-ননদ অনেকগুলি; শাশুড়ী ইহাদের আদর-যত্নের ভার সুনীতির হাতেই ছাড়িয়া দিলেন। কোন জিনিষটি দিতে হইলে—"তুমি পছন্দ করে ওদের দাও"—এই কথাই বলিতেন। কাজেই নিজের জন্ম ভালটি রাখিয়া মন্দটি অপরকে দেওয়া চলিবে না; ইহাতে পরার্থপরতায় মন আপনিই টলে। সমবয়সীদের সঙ্গে সময়-সময় ঝগড়া-বিদ্রোহ ঘটিলেও ভালবাসারও অভাব ছিল না। স্বামীকে বন্ধু-রূপে পাইয়া তাহার ক্ষুদ্র মন আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। বছর না ফিরিতেই তাহারা পরস্পরকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়া ফেলিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলদ কলিকাতায় গেল—কলেজে পড়িতে। একটা শনিবার বাদ দিয়া সে বাড়ী আসিবার হুকুম পাইয়াছিল। ইহার মধ্যে সে স্ত্রীকে তিন-চারিখানি করিয়া চিঠি লিখিত, এবং যথা-কালে সে সব চিঠির জবাবও পাইত। লেখিকা সম্বন্ধে জলদের মনে কোন সংশয় না থাকায় হাতের লেখা সুনীতির হইলেও, রচনাটা ভগ্নী শৈলাঙ্গিনীর, বা শ্যালিকা তরলিকার, সে বিচারের প্রয়োজন তাহার হইত না। জলদ তাহার বিবাহিত বন্ধুদের অনুকরণে চিঠির ভিতর নানা গ্রন্থ হইত গান ও কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইত—এগুলি রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিদের রচনা হইতেই সে সংগ্রহ করিত। কিন্তু চিঠিতে সে কথার স্বীকার-উক্তি না থাকায় সুনীতি আশ্চর্য্য হইয়া স্বামীর অসাধারণ কবিত্বশক্তির কথা ভাবিত। ক্রমে বয়সের সহিত সে নিজে বসিয়া চিঠি লিখিতে ও 'কোটেশন' করিতে গুরুর বিদ্যাকেও ছাপাইয়া উঠিল।

অতি-সুখেই তাহাদের জীবনের দিনগুলি জল-স্রোতের মত অনায়াসে বহিয়া যাইতে ছিল। সুনীতির মনে হইত, তাহার অত শিব পূজা সার্থক

হইয়াছে। এমন স্নেহময় প্রেমময় উদার উন্নত-হৃদয় স্বামী কয়জন নারীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে! বড় খোকার জন্মের পর এ সুখ ষোল কলায় পূর্ণ হইল। তরুণ দম্পতী পিতা-মাতার স্থান গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে যেন আরও নিবিড় বেষ্টনে বদ্ধ বলিয়া মনে করিল। খোকার হাসিটি কাহার মত? জলদ বলিত, ঠিক সুনীতির। সুনীতি তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিত। সে বড় হইলে কাহার মত দেখিতে হইবে? জলদ বলিত, সে ঠিক্ মার মত হইবে। সুনীতি আপত্তি তুলিত—তবে ত রূপ ধরিবে না! না—ও তোমার মত হইবে। স্বামীর সহিত তর্কে হারিলে সুনীতি শাশুড়ীকে মধ্যস্থ মানিত। মা পাগলী মেয়ের মন বুঝিয়া তাহার ইচ্ছানুরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন! জলদ কৃত্রিম কোপে মাকে শাসাইয়া বলিত, "তুমি একচোখো, তাই বৌয়ের হয়ে বল্‌চ। বেশ, বেশ, ঐ তোমার সব, আমি কেউ নই।" মা হাসিতেন। এমনি আনন্দ ও উৎসাহের মধ্য দিয়া শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইয়া এবার সে কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল।

বিদেশে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন জলদের একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিলেও শীঘ্রই সে ভাব কাটিয়া গেল। নিজে সে আনন্দময়—কাজেই কোথাও তাহার সঙ্গীর অভাব ঘটিত না। এখানেও অনেকের সহিত আলাপ হইল। বৈকালে কোনদিন বা উকিল তারিণীবাবুর বাসায়, কোনদিন বা ডেপুটি মহেন্দ্রবাবুর বাসায় ছোট-খাট সভা বসিত। অনেক পদস্থ কর্ম্মচারী একত্র মিলিয়া তাস-পাশা গল্প-গুজবে তামাক টানিয়া সন্ধ্যা কাটাইয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিত। বাড়ী হইতে অনেকেরই চাকর লণ্ঠন লইয়া আসিয়া বাবুর প্রতীক্ষায় চাকর বা সহিসদের আড্ডায় বসিয়া বাবুদের কাজেরই ছোটখাট অনুকরণ করিত। জলদও প্রথম প্রথম সে সভায় যোগ দিত। মহেন্দ্রবাবু জলদকে একটু বিশেষ স্নেহ করিতেন। জলদ তাঁহার বড় ছেলে অমূল্যের সহপাঠী-বন্ধু। জলদ এখানে আসিয়াছে শুনিয়া অমূল্য খুব

আনন্দ প্রকাশ করিয়া বাপকে লিখিয়াছিল, তাহার বন্ধুর যেন সেখানে যথোচিত আদর-যত্ন হয়। অমূল্য আইন পড়িতেছিল। মধ্যে কি একটা ছুটি-উপলক্ষে সে বাড়ী আসিল। জলদ এবার মহেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা ছাড়াইয়া দোতালায় উঠিল। অমূল্যর মা ও মেজ বোন কিরণবালাও ক্রমে তাহার সম্মুখে বাহির হইতে ও কথা কহিতে সুরু করিলেন। অমূল্যের ছুটি ফুরাইলেও জলদের আর সেখান হইতে ছুটি মিলিল না। তাহার সরল 'মিশুক' স্বভাব, সদানন্দ ভাব, গল্প করিবার ক্ষমতা—এই সব গুণে ছেলে-মেয়েদের দলে তাহার খাতির ও আদরের অন্ত ছিল না। মহেন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত সাদাসিধা মানুষ। ছেলের বন্ধুকে তাঁহারা ছেলের মতই যত্ন করিতেন। বিদেশে এমন অযাচিত পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-লাভে জলদের আত্মীয়-বিচ্ছেদ-ক্ষুব্ধ চিত্ত পরম পরিতোষ লাভ করিল। কিরণবালা অমূল্যের মেজ বোন, ম্যাট্রিক্ দিয়া স্কুল ছাড়িয়াছে। এইবার বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। মহেন্দ্রবাবুর মনে যতখানি ত্বরা আসিয়াছিল—বাহিরে তাহার দুই আনাও প্রকাশ পাইত না, তা'ই এ পর্য্যন্ত পাত্র খুঁজিবার সময় হয় নাই। কিরণ সুন্দরী, সুভাষিণী, লোক-রঞ্জিনী। জলদের সহিত তাহার অল্পদিনেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়া গেল। ঊষাঙ্গিনীর ছেলের ভাতের পরও সুনীতির বাসায় আসা ঘটিল না। তাহার সন্তান-সম্ভাবনা বুঝিয়া শাশুড়ী আপত্তি তুলিলেন—একেবারে ছেলে কোলে লইয়া তখন যাইবে। জলদ তা'ই শূন্য গৃহের নিরানন্দময়তা ভুলিবার উপায়—মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই আবিষ্কার করিয়া কিরণ ও তাহাদের ভাই-বোনের সঙ্গেই সময় কাটাইতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সুনীতির দুঃখ

বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন সেখানকার শৃঙ্খলা ও পরিপাট্য-বিধানে শাশুড়ী-ননদের সহিত নিযুক্ত থাকার দরুণ সুনীতি তেমন করিয়া স্বামীর প্রতি মনোযোগিনী হইবার অবকাশ পায় নাই। কাছে বসিয়া মা খাওয়ান, শৈল ও সে রান্নাঘরে ঠাকুরের কাজে সাহায্য করে, অথবা ঠাকুরকে বসাইয়া রাখিয়া তাহারা ননদ-ভাজেই কাড়াকাড়ি করিয়া এটা-ওটা রাঁধে। শাশুড়ীর আদেশ-মত স্বামীর পাতে নিজের হাতেই সব পরিবেষণ করিয়া দিয়া আসে। ছোট বেলায় বৌ হইয়া আসায় শাশুড়ীকে সে তেমন লজ্জা করিতে পারিত না, ঘোম্‌টা তাহার ললাট ছাড়াইত না, কথাও দুই-চারিখানা দূরের ঘর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত। বড় হইয়া শৈল বা উষা যদি নির্লজ্জতার তর্ক তুলিত, তাহা হইলে সে হাসিয়া বলিত, "ওটুকু ঘোম্‌টা যে দি, সে শুধু গুরুজনের মান্য রাখার জন্যে। মাকে লজ্জা করতে সত্যি বল্‌চি ভাই আমার ভারী লজ্জা করে।"

শাশুড়ীও মেয়েদের শাসনে বধূর অত্যন্ত লজ্জার অভিনয় দেখিলে হাসিয়া বলিতেন, "যাকে যা সাজে না, তাকে তা ধরে করাস্‌ কেন বাপু! ও আমার পাগলী মা, ওকে কলা-বৌ দেখতে আমারও ভাল লাগে না বাপু!"

বাড়ীর সে এখন একটি বৌ,—তা'ই তাহার আদরও ছিল সবার কাছে।

স্বামীও অতিরিক্ত আদর দিয়াছেন, সহসা আজ হাত গুটাইতে চাহিতেছেন দেখিয়া যেন তা'ই একটু বিস্ময়ের সহিত সে চাহিয়া দেখিল, দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইল।

সকালে কাছারি যাইবার পূর্ব্বে সে খোকাকে দিয়া জলদকে ডাকাইয়া আনাইয়া কোন্ ছবিখানি কোন্ দেওয়ালে টাঙ্গাইলে কেমন মানাইবে, টিপয়টি খাটের মাথার দিকে অথবা পায়ের দিকে রাখিবে, এই [illegible] বিশেষ সমস্যার সমাধান করিয়া লইত। জলদও হৃষ্টচি[illegible]গ দিত, হুকুম তামিল করিত; ছোট খোকার দোল্নার দ[illegible]কটু টানিয়া দিত, বড় খোকার দুষ্টামির প্রতি মনোযোগী হই[illegible]রিয়া গোলমালে সময় কাটাইয়া বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া জল পা[illegible]ড়াইতে বাহির হইয়া যাইত। সন্ধ্যার পর যখন ফিরিত, তখন [illegible]র অবস্থা বেশ প্রফুল্লই থাকিত। সুনীতিরও তা'ই স্বামীর ম[illegible]ন অনুভব করিতে বিলম্ব হইয়াছিল। প্রথম যেদিন এ [illegible]হার চোখে পড়িল—সে দিন জল খাইয়া পাণ চিবাইতে চি[illegible] কহিল, "কি ছাই পাণ যে সাজ, হয় তেত, নয়, চূণ। কিরণে[illegible] খেয়ে এ স এ পাণ আর মুখে দিতে ইচ্ছা করে না।"

সুনীতি হাসিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া[illegible]সে কিরণটি কে ? কাছারির পাণ-উলী বুঝি ?"

"দূর ! আমায় কি তেম্নি অব্রাহ্মণ [illegible] যে পাণ-উলীর পাণ খাব ? কিরণ মহেন্দ্রবাবু ডেপুটির মেয়ে। [illegible] তোমায় বলাই হয়নি, বুঝি—? যেয়ো বরং একদিন তা[illegible]-পাণ সাজ্‌তে শিখে এস গিয়ে।"

সুনীতি হাসিয়া ,কহিল, "অ্যাঁ [illegible] সে যখন পাণ দিয়ে প্রাণ ভুলিয়ে নিচ্চে, তখন যেতে হবে [illegible] মানুষ কি এত সহজে সব

ছাড়ে! স্বামীর পানে চাহিয়া যেন খুব একটা রসিকতা করিয়াছে, এমনি ভাবে সুনীতি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

জলদ তাহার হাসিতে যোগ না দিয়া যেন একটু ব্যস্ত-ভাবেই ছড়ি লইয়া উঠিয়া পড়িল। সেদিন তাহার মনে কোন ভাবান্তর না হইলেও দুই-একদিনের মধ্যেই সুনীতির মনে হইল, তাহার সে স্বামী আর ঠিক্ তেমনটি নাই।

শৈল ও গৃহিণী একদিন দুপুর বেলায় তারিণীবাবু উকিলের বাড়ী বেড়াইতে গেলেন। সুনীতি বাড়ীতে রহিল, জলদ আসিলে জলখাবার দিবে। খাবার তৈয়ারীর ভারও সেদিন তাহার উপর রহিল। মা চলিয়া গেলেও ছেলের খাওয়ার যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহা অভ্যাসের জন্য শাশুড়ীর মনে পরীক্ষার ইচ্ছাও ইহাতে নিহিত ছিল। সুনীতি এ ব্যবস্থা সানন্দেই গ্রহণ করিল। অন্যদিন সে শুইয়া, বই পড়িয়া, শৈলর সহিত মিছামিছি কলহ করিয়া, তাহার ছেলে-মেয়েদের কখনো কাঁদাইয়া কখনো কোলে লইয়া দুপুর বেলাটা কাটাইয়া দিত। কিছু দিন হইতে এ-সবেও সে আর মন দিতে পারিতেছিল না। আজ শৈলর ছেলে-মেয়ে ও বড় খোকা বাড়ী না থাকায় বাড়ী যেন নিস্তব্ধ হইয়া আছে। দিনটাও খুব দীর্ঘ মনে হইতেছিল। সুনীতির মনের শূন্যতা যেন ইহাতে বাড়িয়া তাহাকে আরও পীড়িত করিতেছিল। সে সকাল সকাল রান্নাঘরে খাবার তৈয়ার করিতে গেল। নিজের গুণপনা দেখাইয়া শাশুড়ী ও স্বামীকে খুসী করিয়া দিবে, এই ইচ্ছাই হইয়াছিল। সেদিন শনিবার। জলদও অন্য দিনের চেয়ে অবশ্য কিছু সকালে আসিবে, তা'ই ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। আজ সে স্বামীকে একা ঘরে পাইবে। আজ আর তাহাকে সে ছাড়িয়া দিবে না।

জলদ বাড়ী আসিলে সে কড়া নামাইয়া উঠিয়া আসিল; পাখা লইয়া কহিল, "আজ তুমি আমার চার্জ্জে—তা জানো?"

জলদ পোষাক খুলিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া কহিল, "তনু, তপ্‌সী, বড় খোকা—কারো সাড়া পাওয়া যাচ্চে না যে! কোথায় তারা?"

"মার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। ঠাকুরঝিও গেছে। আমিই শুধু রইনু বাকী।"

জলদ কহিল, "তুমিও গেলে না কেন?"

"আর তুমি এসে একলা থাক্‌তে, শূন্য ঘরে? খাবার-টাবার দিত কে?"

জলদ কহিল, "সে ঠাকুর কর্‌তো। আমার জন্যে বসে থাক্‌বার কোন দরকারই ছিল না। আমি ত আবার এখুনি বেরুব।"

সুনীতি স্বামীর ডান হাতখানা নিজ করতলে চাপিয়া কহিল, "আমি যদি যেতে না দি?"

জলদ কহিল, "তা হলে যাব না।" কথাটা শুনিতে যেমন মিষ্ট, বক্তার মুখের উদাসীন ভাবের সহিত তাহা তেমন মধুর শুনাইল না। সুনীতির চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল। স্বামীর হাত ছাড়িয়া দিয়া "খাবার আনি" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। মন যখন অভিমানে ভরিয়া থাকে, তখন একটুতেই সে ব্যথা পায়।

সে দিন কিরণের পানের সুখ্যাতি শুনিবার পর কিরণের সম্বন্ধে অনেক কথাই তাহার জানা হইয়া গিয়াছে। সে কেমন দেখিতে, কেমন মিষ্ট স্বভাব, কত ছেলে-মানুষী ধরণ, গল্প করিবার কেমন সুন্দর পদ্ধতি, কত বিষয় তাহার জানা, দেশের প্রতি কেমন জ্বলন্ত অনুরাগ, দেশবাসীর দুঃখে কি গভীর সহানুভূতি তাহার প্রতি কথায় ফুটিয়া ওঠে, ইংরাজী লেখাপড়া জানা থাকায় তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া কত আনন্দ পাওয়া যায় ইত্যাদি অনেক কথাই সে শুনিয়াছে। এবং প্রতি রাত্রেই সেদিনের বৈকালের বন্ধু সম্মিলনের সকল কথাই তাহাকে শুনিতে হয়। শুনায় কোন ক্ষতি

আছে কি না, বক্তার মনে সে প্রশ্ন আদৌ না উঠায় জলদ আপনার মনেই বলিয়া যায়, উৎসাহ না পাইয়া কোন এক সময় হঠাৎ থামিয়া সে অনুভব করে, সুনীতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

স্বামীকে খাবারের থালা ধরিয়া দিয়া সুনীতি রান্নাঘরে গিয়াছিল, ফিরিয়া ঘোর বিস্ময়ের সহিত কহিল, "এ কি হল? উঠে পড়্‌লে যে? আমি সরপুরিয়া কখানা উথ্‌ড়ে নিচ্ছিলুম,—বলে গেলুম, না এলে উঠো না—"

জলদ গামছায় হাত মুছিয়া কহিল, "ভাঁড়ার যখন তোমার ক্ষুদ্র তখন বিপুল দ্রব্য-সম্ভার ঢোকাতে চাইলেই বা ঢুক্‌বে কেন তা? কম-জম করে কর্‌লে আর আপশোষ কর্ত্তে হোত না।"

সুনীতি রাগিয়াছিল, স্বামীর রসিকতায় রাগিয়াই কহিল, "ভাঁড়ার ছোট কি বড়, সে খবর ভাঁড়ারের চেয়ে ভাঁড়ারীরই জানা আছে বেশী; সত্যি, তুমি দু খানা সরপুরিয়া খেতে পার্‌তে না ওর উপর? তাও সিঙ্গেড়া কখানা ফেলে রেখেচ, দেখ্‌চি। ক্ষিদের অভাব নয়, অভাব তোমার সময়ের। কিন্তু যাও দেখি তুমি, কেমন আজ বেড়াতে যাবে?" বলিয়া সে হাতের খাবার স্বামীর পাতের কাছে নামাইয়া রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জলদের আজ সত্যই একটু তাড়া ছিল। ক্ষিতি, যতী, বুলু, বিনু, কিরণ সকলে মিলিয়া আজ তাহাকে তাহাদের সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। অমূল্য কলিকাতায় গিয়াছে। মহেন্দ্রবাবুও অল্পদিনের জন্য জলপাইগুড়িতে বদলি হইয়াছেন—বাড়ীতে অভিভাবকের অভাব, তা'ই ইহাদের দেখিতে যাইবার সখ আর মিটিতেছিল না। সেদিন যতীর মাথায় জলদ বাবুর কথা উদয় হওয়ায় সে তাঁর ও মার মত লইয়া দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছে। এতক্ষণে তাহারা হয়ত প্রস্তুত হইয়া পথ

চাহিয়া বসিয়া আছে! জলদের বিলম্বে কিরণ না জানি কতই ব্যাকুল হইতেছে। এ সময় সুনীতি এমন অন্যায় জেদ ধরিয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল! তবু স্বভাবসিদ্ধ হাসি-মুখেই সে বলিল, "সব যদি জানো, তবে রাগই বা কর কেন? দাও দেখি এখন শালখানা। আজ হয়ত ফিরতে একটু রাতও হতে পারে।"

সুনীতি কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জলদ কহিল, "যেতে দাও, চটপট! দেরী করে অনর্থক কষ্ট দিয়ে কি লাভ?"

"যাও" বলিয়া সুনীতি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। জলদ ডাকিয়া কহিল, "শালখানা দিলে না? ওগো শুনচো, দিয়ে যাও। পরে রাগ করো তখন।"

পাশের ঘর হইতে সুনীতি কহিল, "যারা এত দিন দিত, তাদের বল। আমার এখন সময় নেই।"

কথাটা যে সত্য নয় এবং অভিমানের, জলদ তাহা বুঝিল। কিন্তু এ লইয়া সাধাসাধি করিবার সময় তাহার ছিল না, সে সখও নাই। সুনীতির কিন্তু বড় উল্টা বুদ্ধি! মানুষ কিসে যে কি করে, তা'র যদি এতটুকুও অর্থ থাকে! রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় কিরণকে সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাওরাইয়াছে! ছি এ-সব কি! এমন অন্যায় চিন্তা মনে আসিতে দেওয়াও ত উচিত নয়! সুনীতির সন্দেহে সে ব্যথিত হইলেও এমন লজ্জাকর ভ্রম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা যে তাহার উচিত ছিল, সে কথা কিন্তু মনে হইল না। তুমি যদি পছন্দ না কর, নাই বা গেলাম সেখানে—কেন অনর্থক দুঃখ পাও! এমনই কোন সান্ত্বনার কথা বলিলে যেখানে সব অশান্তি মিটিয়া যাইতে পারিত, সেখানে সে কেবল সুনীতির এ-সব চিন্তা অন্যায় বলিয়াই নিজের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিল। নিজের দিকে কোন তর্কই

রাখিল না! সুনীতির অপছন্দ করা ছাড়া সে যদি এখন মাথা খুঁড়িয়া রক্তগঙ্গা বহায়, তবুও যে কিরণের দেখা পাইবার লোভ সে ছাড়িতে পারিবে না—সে কথা তাহার মনেও হইল না।

সুনীতি কিন্তু ইহার ঠিক উল্টা পথ ধরিয়াই চলিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, বাঁচিয়া থাকার তাহার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই! স্বামীর প্রেম নিশ্চয়ই সে হারাইয়াছে। সেখানে তাহার জন্য আর কোন সান্ত্বনাই বর্ত্তমান নাই। এখন স্বামীর কোন বিশেষ স্নেহ-প্রকাশে বা আদরে সে আর আনন্দ ত পায়ই না, বরং মনে করে, এ সব কৃত্রিম! সব ভুয়া! ঘুষ! ইহার অর্থ নাই, আছে শুধু শব্দ! প্রাণ নাই, আছে দেহ! কি এ দুর্ভাগ্যের ভোগ! মৃত প্রেমের শ্মশানে দাঁড়াইয়া তাহারা স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন হৃদয়ের অভিনয় করিতেছে! ঘৃণায় ধিক্কারে তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়—কিন্তু হায়, চিরদিনের সংসার ভীরুতা ও সহিষ্ণুতার মুখোষ পরিয়া বলে—ছি! কিসের প্রমাণে, কোন্ দলিলের বলে স্বামীকে তুমি এমন অপবাদ দিতে সাহস কর? তা'ই মুখে হাসি মাখিয়া বুকে বিছা পুষিয়া তাহাকে সংসারের কাছে যথা-পূর্ব্বভাবেই চলিতে হইতেছিল। রাত্রে স্বামী যে দিন তাহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিতেন, মনে মনে সে বিরক্ত হইত, এখনই ও বাড়ীর কত কথাই তাহাকে শুনিতে হইবে। ঘুমাইয়া পড়িলে অভিমানে মন ভরিয়া উঠিত,—এখন আর আধ ঘণ্টাও জাগিয়া থাকিতে পারেন না! এখন সে এমনই অনাবশ্যক হইয়াছে! নিঃশব্দে মশারি ফেলিয়া সে শুইয়া পড়িত। সে রাত্রে চোখের জলে কেন যে বালিশ ও অঞ্চল ভিজিত, তাহার কোন সদুত্তর সে দিতে পারিত না; জাগিয়াই রাত কাটিয়া যাইত। প্রভাতে স্বামীর আনন্দোৎফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া মনে হইত, সারা রাত্রি ধরিয়া সে বুঝি প্রকাণ্ড একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যেই ডুবিয়া ছিল। দিনের আলোয় পাখীর গানে ছেলেদের বিচিত্র কোলাহলে ভাব-

রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, বুঝি, কোথাও কিছু অঘটন ঘটে নাই! কিন্তু বৈকালে স্বামী বাহির হইয়া গেলেই তাহার মনে হইত, পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত সবটাই ফাঁকি। ইহার কোথাও কিছু সত্য নাই। এবং সেই সঙ্গে তাহার বাঁচিয়া থাকাটা একান্তই লজ্জাস্কর! জলদও এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া মনের সহিত লুকাচুরি খেলিতেছিল। সে ভাবিত, তাহার বন্ধুদের কথা—সে যখন স্ত্রীর কাছে অকপটে সবই জানাইয়াছে, তখন স্ত্রীর পক্ষ হইতে তাহাকে দোষ দিবার কিছুই নাই! আর কিরণ যখন তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়া তাহাকে সম্মানিত করিয়াছে, তখন তাহার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে সে বাধ্য। স্ত্রীর মন রাখিবার জন্য তাহাকে ব্যথা দেওয়া তাহারও কিছু কর্ত্তব্য নয়। দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য মাথায় রাখিবার জিনিষ—তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিবার নয়!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিষের ক্রিয়া

জলদ ও কিরণবালার দিনগুলি এক রঙীন নেশার মধ্য দিয়া বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। এই নেশার ঝোঁকে তাহারা যে পরস্পরের কতখানি কাছে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহার খবর লইতে দুই পক্ষে-ই কোন সন্দেহ উঠে নাই। বাহিরের লোক, যাহারা এ নেশার কাজল চোখে পরে নাই, তাহারা কি-ভাবে যে তাহাদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিতেছে, সে সংশয়ও তাহাদের মনে জাগে নাই। মহেন্দ্রবাবু বদ্‌লি হইয়া জলপাই-গুড়িতে গিয়াছেন। ক্ষিতি ও যতী এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে। তা'ই বাসা রাখিয়া তিনি শুধু একজন চাকর ও ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। এখানকার বাসার জন্ত আর একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া লইবার কথা ছিল, কিন্তু বাড়ীর লোকের অনাগ্রহে প্রায় তিন মাসেও তাহার খোঁজ হয় নাই। ক্ষিতি বলিত, বেশ খাইতেছি। কি হইবে মিথ্যা লোক খুঁজিয়া? যতী মুখে স্পষ্ট কিছু বলে না, কাজেও কিছু করে না। অমূল্যের পরীক্ষা আসন্ন, তা'ই সে এ-সব চিন্তার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। জলদ অমূল্যের উদ্দেশে নিয়মিতই তাহাদের বাটী আসিত, এবং অধিকাংশ দিনই তাহার অভাবে কিরণের হাতের তৈয়ারী চা খাইয়া, তাহার সহিত গল্প করিয়া সন্ধ্যার অনেক পরে যে দিন যখন মনে পড়িত, সেদিন তখনই বাহির হইয়া যাইত। বিদায়-কালে কিরণ প্রত্যহই বলিত, "কাল্ আস্‌বেন ত?" জলদ হাসিয়া বলিত, "ইচ্ছা ত রইল। দেখি।" অবশ্য ইচ্ছা-পালনে তাহাকে কোন দিনই বীতস্পৃহ দেখা যাইত না। ঠিক্

সময়েই সে হাজির হইত। কিরণ উপন্যাসের ভক্ত। সে জলদের কাছে একদিন বাঙ্গলা বই কিছু আছে কি না খবর লইয়াছিল। জলদের বাঙ্গলা উপন্যাসের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকায় এ পর্য্যন্ত সে তাহার সংবাদ রাখাও প্রয়োজন মনে করে নাই। পরদিন জানাইব বলিয়া বাড়ী আসিয়া সে সুনীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঙ্গলা নবেল-টবেল আছে কিছু? দাও ত দু-একখানা—পড়ে দেখা যাবে।" কিরণ চাহিয়াছে বলিলে সোজা হইত, কিন্তু তাহা সে বলিল না; বলিল, নিজে পড়িবে।

সুনীতি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাঙ্গলা নবেল পড়বে?"

জলদ হাসিয়া কহিল, "দোষ কি! অমন অবাক্ হয়ে গেলে যে? অন্যায় হবে কি কিছু, পড়িই যদি?"

সুনীতি মুখ ফিরাইয়া উদাসীনভাবে কহিল, "খুঁজে দেখব।"

জলদের মনে হইল, অন্যায় কিছু আছে বটে! মনে পড়িল, বছর দুই আগে একদিন কি একখানা বাঙ্গলা উপন্যাস লইয়া সুনীতি জলদকে পড়িবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু জলদ স্বভাব-বশে সে অনুরোধ রাখিয়া উঠিতে পারে নাই। পড়িবে বলিয়া বইখানি সে লইয়াছিল সত্য, কিন্তু তা'র পর সেখানি যে কেমন করিয়া হস্তচ্যুত হইয়া কর্পূরের মত উবিয়া গেল, সে কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। মাস দুই পরে একদিন জেরায় সে বইখানি পড়েই নাই, উপরন্তু হারাইয়াছে—এ-কথা স্বীকার করিলে সুনীতি ঘোর-অভিমানে বলিয়াছিল, জন্মেও সে আর কখনো কোন বই তাহাকে পড়িতে বলিবে না। জলদও তাহাকে কাছে টানিয়া আদরে-সোহাগে আচ্ছন্ন করিয়া বলিয়াছিল, ভালই হইল, কাজ নাই তাহার বই পড়িয়া! সে বইয়ের চেয়ে বৌকেই অধিক ভালবাসে। অকৃত্রিম কবিত্ব যখন তাহার করতল-গত, তখন কৃত্রিমতার প্রয়োজনই বা কি? আজ এই মুহূর্ত্তে সেই কথাটি দু'জনেরই মনে পড়িয়া

গেল। জলদ একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, "অঃ, পুরোনো রাগ! শোধ নাও, শোধ নাও—ছেড়ে কথা কইবে কেন?" সে মুখের তেমন হাসিতে রাগ করিয়া থাকা সুনীতির সাধ্য নয়! তাই অনেক সময় রাগ করিতে গিয়াও তাহার রাগ করা হয় না—অসাক্ষাতে স্বামীর বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি-তর্কগুলাকে শানাইয়া সে যথাকালে প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখে, কার্য্যকালে তাহার একটাও খাটাইতে পারে না। স্বামীর সদা-প্রফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া মনের তাপ কখন জুড়াইয়া যায়। মনে হয়, এমন মুখ যাহার, সে কি কখনো কোন ক্রটি করিতে পারে? আর পারেও যদি, তবে সে কথা কি কখনো বলা যায়? ছি! ঘূর্ণ্যমান রথচক্রে নিষ্পেষিত ধূলিকণা উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইলে আবার ধূলিকেই সে আশ্রয় করিতে চায়, তা'র ত আর অন্য আশ্রয় নাই?

ইহার পর স্ত্রীর সাহায্য না লইয়া সে পুস্তকের দোকানের শরণ লইল; এবং মধ্যে মধ্যে কাছারির ঠিকানায় বই আনাইয়া নিজের অফিস-বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া যথাকালে কিরণবালার কর-কমলে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। যেখানে গোপনতা, সেখানেই পাপ। তবে কি জলদের মনে পাপ প্রবেশ করিয়াছে? সে যদি বইগুলি নিজের বাসার ঠিকানায় আনাইয়া স্ত্রীকে জানাইয়া কিরণবালাকে পড়িতে দিত, তবে কোন সংশয়ের কথাই উঠিত না। কিন্তু সুনীতির সে দিনকার সেই মুখ ও চোখের সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টি তাহার মনকে বাঁকা পথেই চলিতে উপদেশ দিল। মনে হইল, বুড়ো বয়সে সন্দেহে পড়িয়া বৃথা নিজে দুঃখ পাইবে, অন্যকেও দিবে! সে তাহার সন্দেহ লইয়াই থাক্। আমি ত সত্যই কোন অপরাধ করি নাই! মেয়েদের মন ভারী সংকীর্ণ! তা'রা কাকের মত কেবল আবর্জ্জনাই খুঁজিয়া বেড়ায়। জলদের মনে হইল, কিরণ এ শ্রেণীর বাহিরে। সে ত কই কথা-প্রসঙ্গেও কখনো কোন ক্রটি আবিষ্কার করে

না। অবশ্য সুনীতি সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনাও বিশেষ কিছু হয় না। তা' হইলেও দোষ খুঁজিব ভাবিলে দোষ পাইবার পক্ষে আর বাধা কি!

সে দিন কিরণের খুড়িমার ব্রত উদ্‌যাপনের নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া সুনীতি জলদকে শুনাইয়া অনায়াসে বলিল, "কিরণ এত বড় ধেড়ে মেয়ে,—তা ওর বিয়ে দেয় না কেন?" জলদ হাসিয়া বলিয়াছিল, "অমন মেয়ে ত যাকে-তাকে প্রাণ ধরে দিতে পারে না। যখন ওর উপযুক্ত বর পাবে, তখন নিশ্চয়ই দেবে।" তাহাতে সুনীতি উত্তর দিয়াছিল, "যে রকম পুরুষ-ঘেঁষা মেয়ে, নিজেই বর বেছে নেবে, বাপ-মাকে কষ্ট পেতে হবে না।" শুনিলে একবার হিংসার কথা! জলদ এ-কথা অবশ্য সহ্য করিতে পারে নাই। সে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "যার যেমন মন, সবাইকে সে তেমনি দেখে।" সুনীতি ইহার কোন জবাব দেয় নাই।

কিন্তু সেদিন হইতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মনোমালিন্য ঘটিয়া গিয়াছিল। জলদ আর ইচ্ছা করিয়া কিরণের কথা স্ত্রীর কাছে নিজ হইতে কিছু তুলিত না। সেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। তবু দুইজনে একত্র হইলেই সেই এক-জনের কথাই দুইজনেরই মনে পড়িত। সুনীতি ভাবিত—স্বামী এখন কিরণের ধ্যানেই মগ্ন রহিয়াছেন। জলদ ভাবিত, সুনীতি যদি কিরণের মত উদার-চিত্ত হইতে পারিত! জলদ কিরণকে একটু স্নেহ করে, তা'ই সুনীতি ইচ্ছা করিয়াই তাহার সঙ্গ লইল না—বন্ধুত্ব করিল না? করিলে বুঝিত, সে ভাল বাসিবার মত মেয়ে কি না! এতদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে বিচ্ছেদের হাওয়া বহিতে সুরু করিলেও বাহিরে একটা স্বচ্ছতা ছিল। ইহার পর দুইজনের মাঝখানে একটা অন্তরালের ব্যবধান রচিত হইল। জলদের মনে হইল, সুনীতি অকারণে অন্যায় তাহাকে সন্দেহ করে। কিরণের সহিত একটু গল্প করা, বা তা'দের বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া—ইহাতে তাহার ক্রোধের কারণ কিছুই

থাকিতে পারে না। মনকে এত ছোট করা বড় অন্যায়। সুনীতি দেখিতেছিল, স্বামী বাহিরে তাহার প্রতি পুনরায় ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার অন্তরে তাহার স্থান ক্রমেই যেন সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। মানুষ দু'নৌকায় পা দিয়া চলিতে পারে না—এক দিকে ঝোঁক দিতে গেলে 'তৌল দাঁড়ির' অন্য দিক্‌টা হাল্‌কা হইয়া উঠিয়া পড়ে। যে নিপুণ দৃষ্টিতে সমস্ত মন দিয়া ইহারই গতি-লক্ষ্যে চাহিয়া থাকে, ফাঁকটা আগেই তাহার চোখে ধরা পড়ে। স্বামীগত-প্রাণা সুনীতির যে স্বামীর চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই নাই! স্বামীর পরিপূর্ণ ভালবাসাই সে পাইয়াছিল। তা'ই স্বামীর স্বচ্ছ মনটিও সে দর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইত। সেখানে গোপনতার এতটুকু আবরণও কোনদিন কোথাও ছিল না ত? কিন্তু এখন যে তাহা ঘটিয়াছে, সর্ব্বান্তঃকরণে সে তাহা অনুভব করিতেছিল। তা'ই এক নিবিড় ঔদাসীন্যে সংসারের প্রতি তাহার মনও ক্রমে বিরস হইয়া উঠিতেছিল।

সুনীতির আর কিছুই ভালো লাগে না। সংসারের কাজ-কর্ম্মে সে মন নাই। বেশ-ভূষা সে ছাড়িয়া দিয়াছে। স্বামীর সেবা করে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের সে আনন্দ-উন্মাদনা আর নাই। সে যেন অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়াই করিয়া থাকে। ছেলে দুটিকে বুকে চাপিতে চোখে অনেক সময় ব্যথার অশ্রুই ঝরিয়া পড়ে!

শাশুড়ীরও ফিরিয়া যাইবার সময় আসিল। সুনীতি মনে করিল, সেও যদি এই সঙ্গে বিদায় চায়, তবে কেহই তাহাকে আর ব্যাকুল হইয়া বাধা দিবে না। হয়ত,—হয়ত উনি ইহাতে খুসীই হইবেন! পূর্ব্বে এমন সুযোগ লইয়া মিছামিছি বাপের বাড়ী যাইবার ছুতা করিয়া কতদিন সে স্বামীর নিকট ব্যাকুল মিনতি আদায় করিয়াছে। কিন্তু আজ ত আর সেদিন নাই! এখন যে মিথ্যা করিয়াও সে কথা বলিতে সাহস হয় না! কি

জানি, আবেদন যদি প্রার্থনামাত্রেই মঞ্জুর হইয়া যায়! স্ত্রীর প্রতি অনুরাগই না হয় পুরাতন হইয়া যায়। কত-শত রূপসী বিদ্যাধরীদের স্বামী যে সেওড়া-গাছের প্রেতিনীর মোহে মুগ্ধ হন্! কিন্তু ছেলেরা—অমন যে কুসুম-কোমল শিশু, উহাদের জন্যও ত আর কৈ তেমন ব্যগ্র হ'ন না! কাছারি হইতে আসিয়া উহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। পাছে সেখানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়—এই ভয়! অভিমানিনীর মান-ভঞ্জনেই ত তবে আনন্দের কালটুকু কাটিয়া যাইবে? আশ্চর্য্য হইয়া সুনীতি ভাবে—মানুষের মন এমনভাবে কেমন করিয়াই বা বদ্‌লাইয়া যায়? যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, তাহার শক্তি কেন এমন দুর্জ্জয়? ছেলেরা ত তাহারই, তবে উহাদের ভালবাসাও আর ভাল লাগে না? ছোট খোকাটাই হইয়াছে জন্ম-দুঃখী! ও ত বাপের আদর কখনই তেমন করিয়া পাইল না? আর উহার আবির্ভাবেই তাহার মায়ের দুঃখের সূচনা। এমন করিয়া দীর্ঘকালের জন্য স্বামীকে ছাড়িয়া না থাকিলে হয়ত সে মায়াবিনীর মোহিনী-মায়ার স্বামীও এমন করিয়া বাঁধা পড়িতেন না। বাঁধন শক্ত হইয়া গেলে আর কি তা কখনো ছেঁড়া যায়? শুধু উহারই জন্য তাহার এবারকার নারী-জন্মটাই বৃথা হইয়া গেল! কখনো ভাবে, কিরণের বিবাহ হইলে সে যদি উহার সান্নিধ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেই উহার চোখের নেশা কাটিয়া যাইবে—সে দিকেই বা আর কিসের আশা! মন ছাড়িয়া ত আর সে চলিয়া যাইবে না। আর ভূতুড়ে বাড়ীতে বাস করার যে আনন্দ, সে ত সে এখনই প্রতিপলে উপভোগ করিতেছে! এ জন্য সে গেল বা রহিল তাহাতে আর আসিয়া গেল কি? তবে এইটুকু ভাল যে, লোকে কিছু বলিতে পাইবে না। উনি যা'ই করুন্, তবু উহার বিরুদ্ধে যে কেহ কিছু বলে, এও ত আর সহা যায় না, অথচ এই কথাটিই যে আজকাল লোকের মুখে-মুখে? সে দিন মুন্‌সেফ বাবুর মেয়ে অমলা মুখের উপর স্বচ্ছন্দেই

বলিয়া বসিল, " 'সিঁদুর-কৌটার' সুশীর মত সতীনকে স্বামী দিয়ে তাদের ঘর সাজাতে যাবি না কি লো—বকুরাণী ?" পোড়া কপাল তাহার! সে যাইবে আবার সতীনের ঘর সাজাইতে! ভাগ্যে সে সময় শাশুড়ী আসিয়া পড়িলেন, নহিলে কে জানে কি কটু উত্তরই সে দিয়া বসিত! এ-সব কথা তবে বাহিরেও উঠিয়াছে ? এ কথা স্বামীকে বলা তাহার অবশ্য উচিতও—কিন্তু সুনীতির মনের দুর্ব্বলতা বলিল, বলিতে গিয়া সে যদি ঘুমন্ত বাঘকে চেতাইয়া তোলে! জলদ যদি এটা নিজের স্বপক্ষেই ধরিয়া লয়—আজকাল-কার অনেকগুলি ছোট-বড় উপন্যাসে-গল্পেও সে এমনি সব ভালবাসার, দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ পড়িয়াছে। উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষের মতামত এখানে নায়ক-নায়িকারা মান্য করে না। বিবাহ হইয়া গেলে কিছুদিন মন-কষাকষির পর ঘরের ছেলে আবার ঘরেরটির হইয়াই ফিরিয়া আসে। তাহার আদরের বধূই সংসারের পাটরাণী হইয়া বসে। সতীন ভাণ্ডারিণী হইয়া চাকর-দাসীর সর্দ্দারী করে, এবং স্বামী ও সতীনের মনোরঞ্জনার্থ নিজের গায়ের গহনা খুলিয়া সতীনকে পরায়, সতীনের সহিত গলাগলি ভাব করিয়া সংসারের সুখ-শান্তি বজায় রাখে। মা গো! এ-সব লেখাও কি আবার কখনও লিখিতে আছে! ঐ সব গল্প পড়িয়াই না ছেলেদের মনে অমনি সব নূতন প্রেমের সখ জন্মায়! তারপর ঠেলা গিয়া যেখানে পৌঁছায়, সে-ই বোঝে! ঠাকুর-ঝি ঠিক্‌ই বলিয়াছে, লেখকরা সব পুরুষ কি না, তা'ই তাহাদের মনের ইচ্ছা কলমের মুখে প্রকাশ পায়! সতীনের জ্বালা সহিতে হইলে আর অমন উদারতার হাওয়া বহিত না! সুনীতির মনে পড়িল, নারীর লেখায় দু-একখানি এই জাতীয় উপন্যাস সে যেন পড়িয়াছে। গোড়ায় সতীনকে দিয়া বাঁদী-গিরি যথেষ্ট করাইয়া লইলেও লেখিকা তাহার শেষ দিক্‌টায় রক্ষার চেষ্টাও করিয়াছেন। সুনীতির মনে হইল, সে যদি লিখিতে পারিত, তবে বিবাহিতের এই সব

অন্যায় অনুরাগের বিরুদ্ধে খুব একটা তীব্র প্রবন্ধ লিখিত। কিন্তু ভগবান্ তাহাকে সে শক্তি দেন নাই! মন-প্রাণ সব দিয়া শুধু সে ভালবাসিতেই শিখিয়াছে। আঘাতের প্রতিকার-চেষ্টার সাধ্যও তাহার ছিল না—সে এমনি অক্ষম, এমনি নিরুপায়!

স্বামীর প্রতি অভিমানের বিরাগে সে অনেক সময় কাজে-কর্ম্মে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। তবু হতাশার দীর্ঘশ্বাস কখন বাহির হইয়া আসিত, তাহা সে নিজেই জানিতে পারিত না। এক-এক সময় কিরণের উপর বড় রাগ হইত। পরের জিনিষে এ কি অন্যায় তাহার লোভ! যাহাকে দুই দিন পরে অন্যের হইতে হইবে, সে যে এক দিনের অদর্শন সহিতে পারে না, এও ত কম মুস্কিল নয়! বন্ধু কি চাকরি ছাড়িয়া তাহার চোখের তৃষ্ণা মিটাইতে সঙ্গে যাইতে পারিবেন? যতটুকু রয়-সয়, ততটুকুই থাক্ না কেন!—সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইবার শক্তি যাহার নাই, তাহার কাছে নাই বা রহিল এতখানি দাবী!

প্রথম প্রথম জলদ যখন প্রতিদিনের সান্ধ্য ইতিহাস সুনীতির কাছে বর্ণনা করিত, তখন তাহাদের কোন্ দিন কোন্ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল, সে খবর হইতে কিরণ কি-রকম চুল বাঁধিয়াছিল, কি রঙের সাড়ী কোন্ ধাঁচে পরিয়াছিল, কি কথা কেমন সুরে বলিয়াছিল, এ সকল খবরই সে পাইত। এ-তরফ হইতে উৎসাহের অভাবে অথবা দু'একটা খোঁচা খাইয়া অর্দ্ধ-চৈতন্য-লাভে সে এখন স্ত্রীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য এ সকল মনোমত ঘটনার বিশ্লেষণ বড় করিত না। স্ত্রীও শুনিবার জন্য মুখে কোন উৎসাহ দেখাইত না। তাই অন্য কথা ভুলিয়া যাওয়ায় আপাততঃ তাহাদের কথা বলাই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে!

মানুষের স্বভাব, যতক্ষণ সে কোন বস্তু পায়, ততক্ষণ তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করে, কিন্তু পাওয়া বন্ধ হইলেই পাইবার ইচ্ছা জন্মায়;

সুনীতি যখন স্বামীর মুখে কিরণের প্রত্যেক খুঁটিনাটি খবর পাইত, তখন ঈর্ষায় জ্বলিয়া ভাবিত, উনি যেমন বিশ্বভুবনে শ্যাম-রূপ দেখিতেছেন, মনে করেন, আমিও ওঁর কিরণের কথা শুনিবার জন্য তেমনই পাগল হইয়াছি—! কিন্তু এখন সে সব কথার আলোচনা বন্ধ হওয়ায় তাহার পত্নীত্বে আঘাত লাগিত—সে মনে করিত, স্বামী আমায় এমনি হীন-চিত্ত মনে করেন যে, সাহস করিয়া তার কথা আর বলিতেও পারেন না! পাছে আমি হিংসা করি, এই ভয়ে! কেন, সে কি আমার সতীন? আমার অধিকারে ত কেহ হাত দিতে পারিবে না। করুন্ না উঁহারা ছেলেখেলা!

মন কিন্তু এ যুক্তি-তর্ক মানিয়া বশে চলিতে চাহিত না। দুইজনের মনের উপর আর এক জনের আড়াল যতই নীরবতার মধ্য দিয়া চাপিয়া বসিতেছিল, সুনীতির তত মনে হইতে ছিল, সে যেন স্বামীর মনের সাড়াও সেই পরিমাণে ক্রমে হারাইয়া ফেলিতেছে। প্রেমহীন স্বামীর সহিত দাম্পত্য জীবন বহন করা তাহার যেন কঠিন দায়িত্ব বলিয়াই ক্রমে মনে হইতেছিল। অথচ ক্ষুধিত ব্যক্তি নিজে খাইতে না পাইলেও যেমন ভোক্তার পাশে বসিয়াও আনন্দ লাভ করে, তেমনি এক অতৃপ্ত সুখের মধ্যে থাকিয়াও সে স্বামীর সান্নিধ্য ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া যাইতেও পারিতেছিল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ননদ-ভাজ

"বৌ, একটা কথা বল্‌বি ভাই? সত্যি কিন্তু?"

"কি ভাই ঠাকুরঝি, কি কথা? বল্‌ না?"

সুনীতি খাটের বিছানার চাদর তুলিয়া ঝাড়িয়া পুনরায় তাহা বিছাইতেছিল। শৈলাঙ্গিনী মেঝেয় বসিয়া সুপারি কুচাইতেছিল; জলদ জল খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যার পরে ফিরিবে। মা ওদিকে রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া চাকরের কাছে বাজারের হিসাব লইতেছেন। ছোট খোকা দোলায় ঘুমাইতেছে। বড় খোকা একটা লম্বা কাপড়ের পাড় নিজের দুই বগলের নীচে দিয়া চালাইয়া ঘোড়া হইয়া ছোকরা চাকর রামগোলামের হাতে দড়ি তুলিয়া দিয়া ছুটাছুটি খেলিতেছিল। শৈল বলিল, "তুই অমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিস কেন, বল্‌ দেখি? শরীরে ত কোন রোগ দেখ্‌চি না, তবে দশা কেন অমন হচ্চে দিন দিন?"

সুনীতি পাতা চাদরখানি হাত দিয়া জোরে জোরে ঝাড়িয়া কহিল, "খেতে দিস্‌নে, বোধ হয়। নৈলে শরীরে যখন রোগ নেই তখন সুধু-সুধু রোগা হতেই বা গেলুম কেন?"

"দূর পোড়ারমুখী—মা শুন্‌লে ভাব্‌বে, সত্যিই বা। আচ্ছা, খেতেই না হয় দিই না। ধোপা-নাপিতও কি আমি বন্ধ করে দিয়েচি? দু ঘণ্টা ধরে চুল বাঁধা, তিন ঘণ্টা সাবান মাখা, সেগুলোও কি আমার হুকুমে বন্ধ বুঝি?"

"ভেবে দেখা গেল, অনর্থক বাজে খরচে সময় বা পয়সা নষ্ট কর্‌বার দিন আর নেই। তাই ওগুলো ছেড়ে দেওয়া গেছে" বলিয়া সুনীতি ননদের দিকে পিছন করিয়া বিছানায় বালিশ সাজাইতে লাগিল। সমবেদনার এতটুকু স্পর্শেই চোখে তাহার জল ভরিয়া আসিয়াছিল। ঠাকুরঝি ভালবাসে, তাই এ সব তার চোখে পড়ে। কিন্তু স্বামীর এ সব আর চোখেও পড়ে না! আগে একদিন ময়লা কাপড় পরিলে কত হাঙ্গামাই না করিতেন! অতীত সুখের স্মৃতি এখন অন্তরকে মন্থন করিয়া কেবল বেদনাই জাগায়—আনন্দ দিতে পারে না।

শৈল বলিল, "আর ঘর-ভরা প্রাণখোলা সে হাসি—যাকে শাসন দিয়ে কখনো বাঁধ্‌তে পারা যায়নি?"

সুনীতি কথা কহিল না। কথা কহিবে কি? তাহার চোখের জল যে এবার চোখ ছাপাইয়া গাল বহিয়া ঝরিতে সুরু করিয়াছিল! এই অতি-অবাধ্য পানুশে চোখ দুইটাই হইয়াছে তাহার সকল অসম্ভ্রমের মূল। ইহারা স্থান-কাল কিছুই বুঝিতে চায় না; যেখানে-সেখানে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বসে। শৈল নীরবে উঠিয়া আসিয়া সুনীতির মুখখানা ধরিয়া ফিরাইল। তা'র পর গভীর স্নেহে সেই মুখখানা বুকে চাপিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "এ কি তোর সখের কান্না নয় বৌ? সাধ করে কেন এ দুঃখ পাস্ ভাই?"

ননদের বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া সুনীতি যেন তাহার প্রাণের কান্না আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। বুকের দারুণ বোঝা নামাইবার জন্য সে যে এমনি একটা সহানুভূতির আশ্রয়ই খুঁজিতেছিল। এত দুঃখ কি আর একা একা চাপিয়া গুমরিয়া সহা যায়? তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছে। চোখের জল যে দাহ হইয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। এ দুঃখ যে আর সহিতে পারা যায় না। প্রকাশ করারও নয়—বিশেষতঃ নারী হইয়া নারীর কাছে নিজের সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার সংবাদ জানানো—এ লজ্জায়

কি আর সীমা আছে? তবু চিরদিনের বন্ধু এই ননন্দার নিকট মনের ব্যথা প্রকাশ করিয়া আজ যেন মন তাহার অনেকখানি হাল্‌কা হইয়াই গেল। বিয়ের কনেটি হইয়া যখন নব বধূ সে এ বাড়ীতে প্রথম আসিয়াছিল, তখন হইতে দু'এক বছরের বয়সে বড় এই ননদটিই ছিল তাহার খেলার সাথী, কর্ম্মের সঙ্গিনী! ভাব-আড়ির ছড়াছড়ির মধ্য দিয়া দু'জনেই দু'জনকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর ভালবাসার দিনেও ইহার সাহায্য নহিলে তাহার চিঠি লেখা হইত না, স্বামীর ভালবাসার সব কথা না জানাইয়া তৃপ্তি হইত না। স্বামী কলিকাতায় পড়িতে গেলে দুই সখীতে এক-বিছানায় গলাগলি করিয়া শুইয়া কত সুখের কথায় রাত কাটাইয়া প্রভাতের সূচনায় লজ্জার হাসি হাসিয়াছে; গল্পে মাতিয়া কখন যে রাত কাটিয়া গিয়াছে, তাহা তাহারা জানিতেও পারে নাই! তারপর শৈলর বিবাহ হইল। সে শ্বশুর বাড়ী গেলে তাহার বিচ্ছেদ-ব্যথা যেমন করিয়া সে অনুভব করিয়াছিল, এমন বোধ হয় আর কেহই করে নাই। শৈলও মন খুলিয়া তাহার মনের সব কথা সখীর কাছে জানাইয়া সুখী হইত, শৈলের স্বামী অভয়প্রসাদ বলিতেন, "শৈল, তুমি আমার চেয়ে সুনীতিকেই বেশী ভালবাস।" শৈল হাসিত আর বলিত, "ওটা যে ছেলেবেলার বদ্‌ অভ্যাস। ওটা এম্‌নি দস্যি যে ওকে ভাল না বাসিয়ে ছাড়েনা। তাইতো তোমায় ভয়ে ভয়ে চোখে চোখে রাখি, পাছে আবার আমার দশায় পড়ে যাও! দেখ্‌চ না, কেমন ডাকিনী! দাদাকে কি-রকম ওঠ্‌-বোস করাচ্ছে!" এখন তাহারা ছেলে-পুলের মা। তাই পদবী-অনুসারে গম্ভীর হইয়াছে। এখন আর কথায় কথায় কলহ ও সন্ধি হয় না। তবু তা'দের মনের টান তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। বরং সময়ের জ্বালে প্রেমের দুগ্ধ মরিয়া গাঢ় হইয়াছে।

শৈলর সমবেদনায় সুনীতির মনের ব্যথা গলিয়া জল হইয়া দুই চোখে

ঝরিতে লাগিল। উত্তর দিবার তাহার আছেই বা কি? শৈলও যেমন পাগল! কোন মেয়ে কখনো সাধ করিয়া এমন দুঃখ নাকি আবার স্বেচ্ছায় ভোগ করিতে চায়! তাহার কপাল মন্দ, তাই সে এত দুঃখ পাইতেছে। অদৃষ্টের সহিত ত আর কোঁদল চলে না?

শৈল কিন্তু এ যুক্তি মানিতে চাহিল না। কহিল, "অদৃষ্টের সঙ্গে কলহ না চল্‌তে পারে,—স্বামীর সঙ্গে ত চলে, তাঁকেই কেন স্পষ্ট করে বল্ না, এ-সব খেয়ালের খেলা আমি পছন্দ করি না—সব ছেড়ে দাও।"

সুনীতির মুখ লজ্জাজড়িত হাস্যে রঞ্জিত হইল। সে কহিল, "যদি বলেন, অন্যায়টা কি কর্‌ছি, দেখিয়ে দাও? তুমি পছন্দ না কর্‌লেও আমি কর্‌ছি যে,—তখন মানটা থাক্‌বে কোথায়?"

শৈল কহিল, "পোড়ারমুখী, মান নিয়ে কি ধুয়ে খাবি? 'যারে ঠাকুরে করে হেলা, তারে রাখালে মারে ঢেলা'—না হয় অপমানই হলি! স্বামীর কাছে আবার মান-অপমান কিরে? বলে ভাখ্ আগে।"

সুনীতি কহিল, "মরণ! এ সব নোংরা কথা কখনো বলা যায়? সত্যিই ত আমি তাঁর মনের কথা জানি না। যদি বলেন, তাকে আমি বোনের মতন ভালবাসি, তোমার মন অশুদ্ধ, তাই তুমি সাদাকে কালো দেখ্‌চ?"

"ইস্ লো! বোনের মত ভাল বাসেন! তাই একটা সন্ধ্যে বাড়ীতে থাক্‌তে অত যে সাধ্‌লুম, তা সময় হলো না! বলে, 'শশা খেয়ে যেমন জল্‌কে টান'! তেমনি ভায়ের বোনকে টান। অত পোষাকের ছটা, এসেন্সের ঘটা, চুল আঁচুড়াবার কায়দা, বোনের মন ভুলুতে ত দরকার হয় না, ভাই।"

"তোর আপ্‌শোষ হচ্ছে, না ভাই ঠাকুরঝি, ওগুলো যদি তার জন্যে না হয়ে তোর জন্যে হতো! না?"

শৈল এ বিদ্রূপ গায়ে মাখিল না, কহিল, "তাতে ক্ষতি কি হতো ভাই? আমিও ভায়ের রাজবেশ দেখে চোখ জুড়োতাম, তোরও বুকের দুড়্দুড়ুনি ঘট্‌ত না। যাক্—ও সব বাজে কথা—না সত্যি, একদিন বারণ করেই দেখ্‌না, কি বলেন?"

"করেছিলেম। বল্‌লেন, সারাদিন খেটেখুটে এসে ছেলেদের কান্না আর বাড়ীর গোলমাল ভাল লাগে না, একটু বেড়াতে যাই। বন্ধু-বান্ধব-দের সঙ্গে একটু গল্প করি, এতে রাগ হয় তোমার?"

"কিন্তু ঐ একটিমাত্র শান্তি-মন্দির ছাড়া কি সহরে আর বেড়াবার জায়গা নেই? ও বাড়ীতে ত একটি পাল ছেলে-মেয়ে—নির্জ্জনতার আবাস বটে! মহেন্দ্রবাবুর বড় মেয়ে হিরণ এসেচে। তারও গুটি তিন-চার ছেলে-মেয়ে দেখ্‌লাম। এ মেয়েটি কিন্তু ভাই, বেশ গেরস্তালী ধরণের, নভেলিয়ানা ভাব নেই এর। আজ নদীতে চান কত্তে গিয়ে দেখা হোল। একদিন আস্‌বে বলেচে। আচ্ছা বৌ, মেয়েটা কি দাদাকে সত্যিই ভালবেসেচে না কি?" শৈল সুনীতির পানে চাহিয়া একটু ক্ষোভের হাসি হাসিল।

সুনীতি কহিল, "নব-অনুরাগের কি কি লক্ষণ ভাই ঠাকুরঝি, সে ত আমার চেয়ে তুমি আরও ভালই জান! আমাদের বোন কবে সেই সত্য যুগে মান্ধাতার আমলে বিয়ে হয়েছিল, জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখ্‌চি যে আদিকাল থেকে এই চেনা মানুষটিকেই ভাল বাস্‌চি। এতে না ছিল পূর্ব্বরাগ, না ছিল প্রেমের নেশা। হৃদয়-সরোবরে প্রেমশতদল কখন যে তার সহস্র দল মেলেছিল—তার সাল-তারিখ্‌টিও জানা যায় নি। তোদের বরং দেখা-শোনার বিয়ে—ঠাকুর-জামাই পছন্দ করে বিয়ে করেচেন, তোরও দেখে যাবার পর পূর্ব্বরাগের অবকাশ মিলেছিল—তুই বরং এ-সব তত্ত্বে পাকা।"

"ও হরি! তাই বুঝি এত গদগদ? তোদের বিয়ে তা'হলে বিয়েই নয়, বল্? দাদার ত যা হোক্ সাধ মিট্‌লো। পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, 'সএব যমুনা-তীরঃ সএব মলয়ানিলঃ,'—অনুরাগিণী রাধারাণীও পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু তোর জন্মটা যে মিথ্যে হয়ে গেল বৌ, তার এখন কি প্রতিকার করা যায়, বল্ দেখি—?" বলিয়া শৈল দুষ্টামির হাসি হাসিল।

সুনীতি ননন্দার গাল টিপিয়া দিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি তরু-অরুর মা। আমার জন্ম ত আগেই সার্থক হয়ে গেছে।"

"বৌ, আমি এম্‌নি কথাই তোর মুখে শুন্‌তে চাইছিলাম। সত্যিই ত! স্বামীর ভালবাসার যদি কিছু অভাবই পড়ে থাকে, তাতে কাতর হব কেন? পুরুষের কত কাজ,—কত রকম সঙ্গ? একভাবে তারা কি চিরকালই আমাদের মত জীবন কাটাতে পারে? কিন্তু আমরা যে মায়ের জাত! আমাদের প্রেম ত সঙ্কীর্ণতায় বদ্ধ রাখ্‌বার জিনিষ নয়। স্বামীর প্রেমের অংশ নিয়েই যে সন্তান-বাৎসল্য আমাদের বুকের সুধায় জন্মেচে। এ প্রেমের মূল্য নেই, কাড়াকাড়ি নেই—যত পার বিলোও। দানে এর ক্ষয় নেই। এমন বিশ্ব-ভরা আনন্দ যখন আমাদের হাতে, তখন কল্পনার পিছনে কেন আর ছুটোছুটি! আমার মনে হয় স্বামীর ভালবাসার অভাব সকল নারীর মনেই অল্প-বিস্তর থাকে। তবে কারো বেশী, কারো কম, এই যা। কেউ ভাবে—তার প্রিয় ভালবাসে না, বা ভালবাসা, তা অপাত্রে ব্যয় করে। কেউ ভাবে, ভালবাস্‌তে জানে না! ফলে ঐ একই অবস্থা। অভাবের ভাব সবার মনেই জেগে থাকে। কেউ খুলে বলে, কেউ চাপা। আমরাও যদি গোড়া থেকে বুঝে-সুঝে ভালবাস্‌তে শিখ্‌তাম্, তা'হলে এমন করে দেউলে হতাম না!" সুনীতিকে বাহু-বেষ্টনে জড়াইয়া হাত ধরিয়া পুনরায় সে কহিল, "তার চেয়ে আয় ভাই, একবার এমন কাউকে ভালবাসি, যাঁর ভালবাসায় সন্দেহ করে কাঁদ্‌তে হবে না,

প্রতারিত হবার ভয় থাক্‌বে না, হিংসা, ক্রোধ, অভিমান আস্‌বে না,—শুধু আনন্দ আর শান্তিই ভোগ করা যাবে। যাঁর ভালবাসা যৌবন-বার্দ্ধক্যের খোঁজ রাখে না, রূপের মোহে ছলাকলায় ভোলে না, মনের ভিতরের লুকোনো মনকেও খুঁজে বার করে। যে প্রেম ক্ষমা কর্‌বার জন্যেই ব্যাকুল হয়ে থাকে, সেই প্রাণের প্রাণকে প্রাণ ভরে ভালবাস্ ভাই! ভালবাসাও ধন্য হবে—মনের অভাবও সব মিট্‌বে। অমৃতের অধিকারী আমরা—আমরা ত কখনো দুঃখী নই। অতিথশালার কাজ বজায় রেখে শুধু কর্ত্তব্য করে যাব। এখানকার সরা-বাটীতে লোভ কর্‌বো কেন—সে যে আবার দুদিন পরেই ফেলে যেতে হবে? বোঁচ্‌কা বেঁধে ত আর সঙ্গে নিতে পার্‌বো না?"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লের পণ

হিমুর সহিত শত্রুতা সাধিয়াই যেন রথের দিনটি আর নিকটবর্ত্তী হইতে চাহিতেছিল না। দিদিমার ধনুকভাঙ্গা পণ—তিনি রথ না দেখিয়া কিছুতেই বাড়ী ফিরিবেন না। অথচ হিমুর দিনগুলা যে কেমন করিয়া কাটিতেছে, সে খবর লইতে তাঁহার অবকাশই হইত না। একটিমাত্রও সঙ্গী নাই। দু'দণ্ড কথা বলিয়া মনের বোঝা নামাইবে, এমন একটি মানুষও নাই! ছুটিয়া বেড়াইবারও স্থানের অভাব। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত সে যেন ছটফট করিতেছিল। এই কয়দিনের মধ্যেই এখানকার এত বড় বাড়ীখানা তাহার চোখে ক্ষুদ্র কারাগারে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার পৃথিবীর বর্ণও যেন কেমন ধূম্র-মলিন হইয়া গিয়াছে। দিদিমা নীচে গৃহিণীর মহলে থাকেন। সেখানে গেলেই দাসী-মহলে, আশ্রিতা প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণীর দলে 'আহা' 'উহু' সহযোগে কতই না আদর-আপ্যায়ন চলিতে থাকে। গৃহিণী মুখে স্পষ্ট করিয়া কিছু না বলিলেও চোখে যে স্নেহ ভরিয়া চাহিয়া দেখেন—এখন হিমুর তাহাতেও সন্দেহ জাগে। এ-সব আদর-আপ্যায়ন তাহার সহ্য হয় না। সে বিরক্ত চিত্তে রাত্রে ঘুমাইবার সময়টি ছাড়া দিদিমার সঙ্গও ত্যাগ করিল। বাগানে সকালে-বিকালে আলোকনাথ বেড়াইতে যায়, তা'ই সে আর বাগানে যায় না। হেমলতার কাছে যাইবার জন্য তাহার ব্যাকুল মন অনেক সময়ই ছুটিতে চায়, কিন্তু কতক লজ্জায়, কতক ভয়ে সাহস করিয়া সে যাইতে পারে না। অনিচ্ছাতেও সে যে তাঁহার নিকট অপরাধিনী! আর এ কথা—এ-বাড়ী

ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি যে বুঝিতে পারিলেন না! তিনিও হয় ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন, গহনা-কাপড়ের লোভে হিমু তাঁহার বুড়া স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্ম পাগল হইয়াছে! তা' যা' খুসী—তিনি ভাবুন! যতক্ষণ না সে বাড়ীর বাহির হইতে পারে, অনেকেই অনেক কথা ভাবিবে। তা'র পর—সে যখন সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া এ বাড়ী ছাড়িয়া মার কাছে ফিরিয়া যাইবে, তখন সবাই বুঝিবে, হিমুকে বিবাহ কর। কেমন সহজ! আর হেমলতাদি'ও তখন নিশ্চয় নিজের ভুল বুঝিয়া হিমুর জন্ম কাঁদিতে বসিবেন। এই সকল জটিল সমস্যায় বিব্রত হইয়াই সে লাইব্রেরী-ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে আত্ম-গোপন করিয়াছিল। এখানে তাহার জন্ম আশ্রয় ও আনন্দ দুইটাই প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। লোকসঙ্গের অভাব সে পুস্তক-পাঠের আনন্দে ভুলিয়াছিল। এখন ভাবনা হইত—এত বইয়ের মধ্যে কয়খানিই বা সে পড়িয়া লইবার অবসর পাইবে! এমনও তাহার মনে হইত যে বুড়া কর্ত্তার মতিচ্ছন্ন না হইলে সে বাছা-বাছা খানকতক বই তাঁহাকে বলিয়া সঙ্গে লইত, আবার পড়া শেষ হইলে কাহাকেও দিয়া ফিরাইয়া আনিবার কথা বলিয়া যাইত।

আজ লাইব্রেরীর এ নিরাপদ আশ্রয়টুকুও যখন তাহার ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দারুণ শূন্যতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। সে শুনিয়াছিল, এই লাইব্রেরী-কক্ষে ঐ একটিমাত্র মানুষেরই পূর্ণ অধিকার! এখানকার সহিত আর কাহারও কোন সহানুভূতি বা সংস্রব নাই। এ কয়দিন সে অনধিকারে যাহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার আগমনমাত্রেই সেখান হইতে তাহার নির্ব্বাসন হইয়া গেল। তা'ই দণ্ডদাতাকে সে এ বাড়ীর অন্য কাহারও চেয়ে অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। পাছে দৈবাৎ সেই অপ্রীতিকর লোকটিরই চোখে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে যখন হেমলতার কক্ষে বা অন্য কোথাও থাকিত, সে সময়ও সাহস করিয়া হিমু

পুস্তকাগারে যাইতে পারিত না। অথচ তাহার আনন্দ-রস-লুব্ধ মনটি সেই সব ঝক্‌ঝকে বাঁধানো, সুবর্ণ অক্ষরে নামাঙ্কিত, রাশি রাশি ইংরাজী ও বাঙ্গলা বইয়ে-ভরা কাচের বড় বড় আলমারীগুলির সাম্‌নেই ঘুরিয়া বেড়াইত।

কাচের শার্শির ভিতর দিয়া বিকাল বেলার রোদ খানিকটা ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের নীল আকাশ খোলা দরজা দিয়া চোখে পড়িতেছিল। পাখীর ঝাঁক উড়িয়া চলিয়াছে। একটা চিল উড়িতে উড়িতে আসিয়া সম্মুখের গেটের মাথায় বিশ্রাম লইতে বসিল। ঠিক যেন ধাতু-গঠিতের মতই সে স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। খাটের বিছানায় শুইয়া হেমলতা এই দৃশ্যগুলিই চোখ দিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। কার্য্যহীন রোগ-যন্ত্রণা-কাতর শরীরের মনের অস্বাচ্ছন্দ্য তাহাকে ক্রমেই অধিক পীড়িত করিতেছিল। সে বুঝিতেছিল একঘেয়ে রোগের দীর্ঘ সেবায় বাড়ীর লোক'ও ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী দিনান্তে একবার কাছে আসিয়া বসিতেন, কুশল প্রশ্ন করিতেন—তিনিও আজ ক'দিন আর আসেন নাই। আর যে কারণে আসেন নাই, সেটা এমনি দাম্পত্য প্রেমের অন্তরায়, যে হেমলতাও নিজ হইতে তাঁহাকে আসিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইতে পারে নাই। লজ্জা, সঙ্কোচ, বিরাগ, ঔদাসীন্য সবই যেন সেই চিন্তার ভিতর জড়াজড়ি করিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল। দিনের পর দিন একই ভাবে শুইয়া থাকা, ঔষধ খওয়া, ডাক্তারের নিকট পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ তাহার নাই! অথচ এমন একঘেয়ে আধ-মরা জীবন, এও যেন সে আর বহিতে বা সহিতেও পারিতেছিল না। ঘরের যে দিকে চাহিয়া দেখে—টেবিল, চেয়ার, আল্‌না, আল্‌নার উপর ঝোলান কোঁচান সাড়ীগুলি, দেওয়ালের ছবি, ব্রাকেটের উপর ঘড়িটি পর্য্যন্ত সবই যেন সেই একঘেয়ে বিমর্ষ চাহনিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। এই আনন্দ-লেশহীন একান্ত দুর্ব্বহ জীবনে কবে যে মুক্তি লাভ করিবে, ইহাই হইয়াছে

এখন তাহার জপমালা! স্বামীর বিবাহ বার্ত্তায় সে তাঁহাকে দোষারোপ করে না। রুগ্না স্ত্রীর সেবা করিয়া চিরদিন যদি তিনি নাই কাটাইতে পারেন! কিন্তু স্বামীর তাচ্ছীল্যে সে ব্যথা অনুভব করিত—দিনান্তে একবার চোখের দেখা দেখিয়া গেলে ক্ষতিই বা কি এমন ছিল? হিমুকে প্রথম দর্শনেই সে ভালবাসিয়াছিল; মনেও একটি মধুর সাধ তাহার জাগিয়াছিল। হেমলতা ভাবিয়াছিল, প্রফুল্লের সঙ্গে এই সুন্দরী মেয়েটির বিবাহ দিয়া ইহাকে রাণীর সাজে সাজাইয়া সে তাহার অতৃপ্ত কামনা মিটাইবে। তাহার বন্ধ্যা-হৃদয়ে নবোচ্ছ্বসিত স্নেহধারা এই মেয়েটির পানেই তা'ই স্নিগ্ধ শীতলতায় আর্দ্র হইয়া ধীরে ধীরে বহিতে সুরু করিয়াছিল। সে আর কতটুকু, কত দিনেরই বা! স্বামীর কাছে এ প্রসঙ্গ তুলিবার উপক্রম না করিতেই সব অদল-বদল হইয়া গেল। কল্পনায় যাহাকে রাণীর সাজে সাজাইয়া বুকে চাপিয়া সে ব্যর্থ স্নেহের সকল ক্ষুধা মিটাইতে চাহিতেছিল, সে তেমনি রাণী সাজিয়াই রহিল বটে, শুধু তাহার বুকের ব্যথা জুড়াইয়া না দিয়া সেখানে ব্যথা হইয়াই বাজিয়া রহিল! হেমলতা শুনিল—স্বামী নিজেই তাহাকে বিবাহ করিবেন। শুনিয়া সে দুঃখিত হইল। সে তবে এতদিনের এত ভালবাসা দিয়াও তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই? তা'ই নূতনের মোহে তিনি উচিত জ্ঞানও হারাইলেন!

কিন্তু নিজের স্বার্থ-হানির চিন্তার চেয়ে বড় চিন্তা হইয়াছিল সেই অবাধ্য যুবার—যাহাকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে; মা-হারা শিশুকে কত পরিশ্রমে, কত যত্নে কত না আদরে-সোহাগে বড় করিয়াছে—সেই ফুলুর জন্য! সে যে চিরদিন শুনিয়া আসিয়াছে, সে-ই এ জমিদারীর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। এখানকার আঁধার ঘরের মণিদীপ সে! আজ সেই দীপের আলো, শুধু তাহারি রুগ্নত্বের অপরাধের ঝড়ো হাওয়ায় নিজেই নিবাইতে বসিল, সে এমনি অপরাধিনী খুড়ি-মা! ফুলুরই কি এ কথা এতক্ষণ আর

শুনিতে বাকী আছে? ইহা শুনিলে অভিমানী সে, সে কি আর এ গৃহের কিছু স্পর্শ করিবে! হয়ত কোথাও চলিয়া যাইবে! হয় ত আর কখনো খবরও দিবে না, কাহারো খবর লইবেও না! কিন্তু হেমলতা যে এখনও তাহারই হাতের প্রজ্বলিত অগ্নিকণাতেই নিজ ব্যর্থ জীবনকে শীতল করিবে বলিয়া আশা রাখিয়াছে! এ সাধও কি তবে তা'র পূর্ণ হইবে না?

সহসা তাহার চিন্তার ধারা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। "ও মেয়েটি কে খুড়ি-মা? ভারী সুন্দর দেখ্‌তে ত!" বলিয়া হাসিমুখে প্রফুল্ল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মাথার কাছে খাটে বসিয়া হেমলতার ললাটে হাত রাখিয়া তাপ-পরীক্ষান্তে পুনরায় বলিল, "ও মেয়েটি কে, খুড়ি-মা?"

হেমলতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "ও হিমু—দু'দিন বাদে তোমার খুড়ি-মা হবেন।"

প্রফুল্ল যে কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, সে তাহার কথার বিশেষণেই হেমলতা বুঝিয়াছিল, উদ্গত নিঃশ্বাসটা তা'ই চাপিয়া ফেলিতে হইল। বড় আশার জিনিষ যেন হারাইয়া গেল—প্রফুল্লের প্রশ্নে এমনি একটা ব্যর্থতার ব্যথা তাহার মনে বাজিল।

"কে হবেন্?" বলিয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে তাহার অবিন্যস্ত চুলগুলি গুছাইয়া দিতে লাগিল। যাহা শুনিল, তাহা এমনি অবিশ্বাস্য, যে বিস্ময় বোধ করারও প্রয়োজন ছিল না। সে কথার উত্তর না দিয়া হেমলতা কহিল, "জল খেয়েচ? মার কাছে গেছ্‌লে?"

"নিশ্চয়! অবস্থা দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না বুঝি? সোজা হয়ে বস্‌বার যো আছে—পেটের ভারে? ঠাকুমা ভাবে, পেট্‌টা যেন আমার রবারের থলি। এগারো মাসের বাকী খাবার একমাসে এর মধ্যে ঠেসে-ঠুসে সে বেশ ধরাতে পারে!"

হেমলতা চোখ তুলিয়া স্নেহমাখা-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল,

"যে ছিরি করে আসো, বাবা! না করেই বা করেন কি, বল? ছুটিটাও যদি এখানে কাটাতে, তা হলেও যে আমাদের আশ মিট্‌তো।"

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, "সেই যে একটা গান্ আছে,—'সাধ কখনো মেটে না ভাই—সাধে পড়ুক বাজ! বেলা-বেলি চল্‌রে চলি সাধি আপন কাজ'!—সাধ বুঝি আবার কখনো মেটে, খুড়িমা? ওকে যত বাড়াবে, ততই বাড়্‌বে। ছুটিতে সময় কোথা পাই, বল? আমারও যা কিছু কাজ তাও ত ঐ সময়টুকুর জন্যেই তোলা থাকে।"

হেমলতা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তোমার কাকা ত ঐ জন্যেই রাগ করেন। শুন্‌লুম, তুমি না কি পিঠে মোট বয়ে কোথায় স্বদেশী কাপড় বেচ্‌তে গেছ্‌লে। কোথায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তার জন্যে দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে চাঁদা চেয়ে বেড়িয়েছ, এ সব কেন কর, ফুলু? শরীরটাকে তুমি একটুও যত্ন কর না!"

"শরীরের চেয়েও যে আমার দেশ্‌কে আমি বেশী ভালবাসি খুড়িমা? আমার দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পর্‌তে পাচ্ছে না, অত্যাচারে জর্জ্জরিত হচ্চে,—এ দেখে শুধু শরীর বাঁচাবার জন্যে আমি লুকিয়ে বসে থাক্‌বো? সে শরীর কখনো বাঁচে, তুমি মনে করেচ? অর্থে না পারি, সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব তা কেন কর্‌বনা? তুমি নিজে ভেবে আমায় বল, এ কি ভারী অন্যায় করি?"

"তোমার কাজে ন্যায়-অন্যায় বিচার ত আমি কখনও করিনি বাবা। যা তুমি কর, সবই আমি মনে করি, তুমি যখন বুঝে করেচ, তখন তা অবশ্যই ভাল। কারণ—মন্দ কাজ করা ত তোমার স্বভাব নয়। তবে তুমি যা কর্‌বে নিজেকে বাঁচিয়ে করো। শরীর রেখে ধর্ম্ম,—আমাদের মেয়েলি শাস্তরেও ব'লে থাকে। তোমরা ত কত সংস্কৃত শ্লোকট্লোক জান। মানুষকে মানুষ ভালবাস্‌বে না, এ কি আর কেউ কখনো বল্‌তে পারে?" বলিয়া হেমলতা একটু স্নিগ্ধভাবে হাসিল।

প্রফুল্ল কহিল, "তোমার শাস্ত্রই ত আমি মেনে চলি। শরীর না রাখ্‌লে কি এমন থাকে ? দেখ দেখি আমার হাতের গুলি। আচ্ছা, আমার সঙ্গে কে পাঞ্জা লড়্‌তে আস্‌বে—আসুক্—" বলিয়া সে পাঞ্জাবির আস্তিন গুটাইয়া খুড়িমাকে অনাবৃত বলিষ্ঠ বাহু-শোভা দেখাইয়া হাসিতে লাগিল।

হেমলতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে। কেবল তর্কে জিত্‌তে শিখেচ। কিন্তু লোকে তোমায় কি বল্‌চে, জান ? লেখাপড়া শিখে তুমি যেমন কাজ হারালে—সহজ বুদ্ধিতে কেউ কখনো এমন কর্‌তো না। জমিদারীর কাজ কর্ম্ম শিখ্‌লে না,—ঘর-বাসী হলে না বলে তোমার কাকাও আগে আগে অনেক দুঃখ কর্‌তেন। এখন অবশ্য আর কিছু বলেন না।"

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, "ভালকে ভাল বলে বুঝেচেন তাই বলেন না। লেখাপড়া শিখ্‌লে কি বুদ্ধি এম্‌নি কেঁচে যায়—যে কর্ত্তব্য কাজও মানুষ কর্‌তে পারে না ? জমিদারী চালাবার জন্যে কি লেখাপড়া একটা অন্তরায় না কি ? প্রজা ঠেঙ্গানো—তা সেটা কোনো জমিদারই নিজের হাতে ত করে না ? আমি এমন অনেক শিক্ষিত জমিদারকে জানি, যাঁরা প্রজা-পীড়নে—কশাইয়েরও বাবা। যাদের মেহনতে তাঁদের নবাবী—তাদেরই এতটুকু ত্রুটিতে—ত্রুটি আর কি, খাজ্‌না দিতে দেরী হলে বা বিনা পয়সায় বেগার খাটুতে রাজি না হলে—পাইক দিয়ে ধরিয়ে এনে মার-পিট্, এমন কি ঘরে বন্ধ পর্য্যন্ত করে রাখে,—কেউ-কেউ আবার প্রজার ঘরের ঘটি-বাটি ধান-চালের সঙ্গে তাদের স্ত্রী-বোন্-মেয়েকে পর্য্যন্ত নিজের পাওনা মনে করে। অবশ্য সবাই এক ধাতুর হলে পৃথিবী সইতে পার্‌তো না। তা ভাল মন্দ সকল শ্রেণীতেই আছে। তবে শিক্ষায় যে মানুষ-চরিত্র বদ্‌লায়, তা ভেবো না। যে যা থাকে, সে তা থাকেই, বাইরেটা শুধু মার্জ্জিত আর অমার্জ্জিত। গোখ্‌রো সাপের মাথায় মাণিক থাকে, তা বলে সে কি কেউটের চেয়ে কাম্‌ড়ায় কম ? বাইরের ব্যবহারটা শোভন আর

অশোভন—এইটুকুই যা তফাৎ! শিক্ষিত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিবেক-বুদ্ধি তুমি কি মনে কর আত্ম-সর্ব্বস্ব মোড়লদের চেয়ে বেশী তফাৎ? কখনই না! যে উৎপীড়ন-অবিচারে দক্ষ না হয়, সে তার কর্ম্মগত দুর্ব্বলতার জন্যেই হয় না। না হ'লে শিক্ষায় মানুষকে অকর্ম্মণ্য করে না, বরং কাজের লোকই করে। যে একটা শিখ্‌তে পারে, সে আর একটাও পারে। বরং লেখাপড়া শেখা থাক্‌লে মাথা বুদ্ধি চালাতে শীগ্‌গিরই পারে। আমার কিন্তু অত-শত পোষাবে না। জমিদার হওয়া আমার ধাতে সইবে না, দেখ্‌ছি। তিন পুরুষ ধরে চাষ করেছেন বাপ-পিতামহেরা, হাড়ের ভিতর এখনও সেই রক্ত বইচে যে। ধরে-বেঁধে বাবু সাজা কি সাজ্‌বে কখনও?" বলিয়া সে হাসিমুখে খুড়িমার চুলের ভিতর কুরাইয়া দিতে লাগিল।

এই একটুখানি স্নেহের অভিব্যক্তি! তবু অনাবৃষ্টির দিনে এতটুকুও জলের অভাব—তৃষ্ণা-কাতর মুমূর্ষু ধরণী যেমন মুহূর্ত্তেই শুষিয়া লয়, ক্ষুদ্র বটে তবু এ যে কত কাঙ্ক্ষিত, তাহা তৃষ্ণাদগ্ধ মরুবক্ষই শুধু অনুভব করিতে পারে! চোখে তাহার বন্যার ধারা উপ্‌চাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তবু হেমলতার সহিষ্ণু চিত্ত সে বিড়ম্বনা ঘটিতে দিল না। এই স্নেহাস্পদকে স্নেহ, ইহার মহৎ হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ও তৎপ্রতি অবিচারের ব্যথা—সমস্ত মিলিয়া তাহার ব্যথা-কাতর মনটিকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিলেও মুখে সে একটু করুণ হাসি হাসিয়া কহিল, "তাই হবে তোমার, বাবা। চাষ করে কোদাল পেড়েই তুমি খেয়ো। জমিদারের ফর্‌মাস দেওয়া হচ্চে। যে যেখানে সাজ্‌বার, সেই সেখানে সাজ্‌বে। ঘুঁটে-কুড়ুনির মা কি কখনো রাজার মা হয়? তুমিও এবার মনের সুখে যত খুসী গুণ্ডামি করে বেড়াওগে। কেউ মানা কর্‌বে না, খবরও নেবে না তোমার!"

প্রফুল্ল মনে করিল, হেমলতা নিজের শারীরিক অবস্থার কথা ভাবিয়া এরূপ বলিতেছে। সে সবিস্ময়ে কহিল, "মানে? মতলবটি কি তোমার,

শুনি? ফাঁকি-ফুঁকি কিছু ঠাউরে রেখেছ না কি? সে সব চল্‌বে না, তা কিন্তু সাফ্ বলে দিচ্চি। তারপর—ফরমাসি জমিদারটি আস্‌বেন কোথা থেকে, শুনি?"

হেমলতা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "তার উত্তর ত ঘরে ঢুকেই পেয়েচ বাবা।"

"ঘরে ঢুকে—?" বলিয়া প্রফুল্ল অতীত-ক্ষণের স্মরণে কিছুক্ষণ বৃথা কাটাইয়া কহিল, "হার্‌লাম! আমার ত বিন্দু-বিসর্গও মনে পড়্‌ল না, কখন আবার নূতন জমিদারের কথা হোল?"

হেমলতা কহিল, "নেকা ছেলে! আগে গাছ, না আগে ফল? তোমার নতুন-খুড়ির কথা প্রথমেই কি বলিনি? আকাশ থেকে পড়্‌লে যে?"

প্রফুল্ল বিষণ্ণভাবে কহিল, "তোমায় আমি ছেলে-বেলা থেকে মায়ের মান্য দিতে পারিনি—মা, খুড়ি, বোন্, বন্ধু,—সব মনে করে সব দৌরাত্ম্যই করে এসেচি, তুমি তাতে বাধা দাওনি, মান্য কর্‌তেও শেখাওনি কখনও! কিন্তু কাকাকে আমি কতখানি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, তা তুমিও জান। তাঁর সম্বন্ধে এ রকম তামাসা করাও তোমার উচিত নয়।"

হেমলতা বলিতে গেল—'সে বংশ রক্ষার জন্য'—কিন্তু মুখে তাহার বাধিয়া যাওয়ায় শুধু কহিল, "তিনি যদি দ্বিতীয়বার বিয়েই করেন—তা হলে কি তুমি আর তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা কর্‌তে পার্‌বে না বাবা? ওটা কি এতই ক্ষণ-ভঙ্গুর?"

প্রফুল্ল উদ্ধত-ভাবে কহিল, "না, তা আমি পার্‌ব না! খুলে বল দেখি, ব্যাপারটা কি? ও কাদের মেয়ে? জুট্‌লই বা কেন এসে? কে এ সব দুর্ব্বুদ্ধি ওঁর মাথায় দিলে? আর তোমাকেও বলি—তুমি এ হতে দেবে?"

"আমি ? আমি ত তোমাদের সংসারের বোঝামাত্র—ফুলু ? শুধু সেবা নিচ্ছি, দিতে পারলুম না কিছু। উনি যদি সুখী হতে চান—"

খাটের ডাণ্ডায় মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তীব্রস্বরে প্রফুল্ল কহিল, "তখন পতিব্রতা হয়ে তাঁকে পাগ্‌লামিতে উৎসাহ দেওয়া তোমার উচিত বই কি ! বেশ—তোমাদের তরফ ছাড়া আর একটা দিকও ত আছে ? সুখী হওয়াটা ত তাঁর এক্‌লারই জন্যে নয়—বুড় মানুষকে বিয়ে করে ও মেয়েটির কি হবে, শুনি ?"

একটুখানি বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া হেমলতা কহিল, "হাসালে তুমি ফুলু ! আইবুড়, দুঃখীর মেয়ে ! বিয়ে জুট্‌চে না বলে বিধবা-মায়ের গলায় কাঁটা হয়ে ফুটে আছে ! এমন রাজ-সংসারের রাণী হবে, দুঃখ তার কোথায় পেলে ? যদি বল, সতীন ? সে ত অনেক দিনের নয়। আর জ্যান্তে যে মরা, সে ত মরার বাড়া ! স্বামীর একটু বয়সের কথা যদি বল,—সে আর এমন কি বেশী ! এর চেয়ে কত বেশী বুড়ো মানুষে দ্বিতীয় ছেড়ে তৃতীয়-চতুর্থ বার যে বিয়ে কচ্চে—তা কি নিক্তির ওজনে সবাই সব পায়, না পাচ্চে ? এই কি অনেক নয় ?"

"না, অনেক নয়। আর যে যা বলুক্, তোমার মুখের কথা এ—মনের নয়। সত্যি বল্‌চো খুড়িমা ? মেয়ে মানুষের এই চরম পাওয়া ? তারা ঐশ্বর্য্যকে সব-চেয়ে বড় পাওনা মনে করে ? বিশেষতঃ অমন মেয়ের—"

"ফুলু জানালাটা বন্ধ করে দাও ত বাবা, চোখে পড়ন্ত রোদ্‌টা লাগ্‌চে।"

প্রফুল্ল উঠিয়া আদেশ-পালনান্তে ফিরিয়া আসিলে হেমলতা একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া কহিল, "গোপালের মাকে ডেকে দিয়ে যেয়ো ত, একটু বাতাস্ দেবে।"

খুড়িমা যে এ-প্রসঙ্গে আর একটুও অগ্রসর হইবেন না, তাহা বুঝিয়া

প্রফুল্ল বিষণ্ণ-মুখে উঠিয়া গেল। 'আমি বাতাস দিতেছি, গোপালের মাকে প্রয়োজন কি' ?—এ কথাটা মনে উঠিলেও সে মুখে কিছু বলিল না। সে জানিত, খুড়িমা আপাততঃ একটু নির্জ্জনতা চাহিতেছেন। বিশ্বের সহিত সে বিদ্রোহ করিতে পারে, কিন্তু কোনো দিক্ দিয়াও ইঁহার মনে এতটুকু আঘাতও সে ইচ্ছা করিয়া অকারণ দিতে পারে না। এখানে সে যে কত পাইয়াছে ও এখনও পাইতেছে, সে কেবল সেই জানে। সে ত বাহিরের লৌকিকতা বজায় রাখা সাধারণ স্নেহ নয়! সেই জন্যই সে এমন বিসদৃশ ব্যাপার একেবারেই ঘটিতে দিবে না। স্থির করিল—ইহার একটা হেস্ত-নেস্ত করিয়া তবে সে ছাড়িবে! এ-সব কি ?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হিরণের উপদেশ

সে দিন কি একটা বিশেষ কাজে জলদকে কিরণদের বাড়ী হইতে সকাল সকাল বাসায় ফিরিতে হইল। তাহার শান্ত মূর্ত্তি জানালার বাহিরে যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন পৃষ্ঠে মৃদু করস্পর্শে সচকিত হইয়া ফিরিয়া স্মিতকণ্ঠে কিরণ কহিল, "দিদি! আমি ভেবেছিলুম, কে? এমন নিঃশব্দে এসেচো তুমি!"

"নিঃশব্দে? না। আসাটা সম্পূর্ণ সশব্দেই হয়েছিল। তখন পূজারিণীর ধ্যান ভাঙেনি তাই যা—! এতক্ষণ হচ্ছিল কি—কোর্টসিপ্?" বলিয়া দিদি হিরণবালা সহাস্যে ভগিনীর মুখের পানে চাহিল। কিরণের মুখ এই আকস্মিক আঘাতে লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সলজ্জ বিরক্ত-মুখে সে কহিল, "যাও—ও সব কি! ও আমি ভালবাসিনা।"

হিরণ কহিল, "কি ভালবাসিস্ না? কোর্টসিপ্ করা? না—সে কথা কারো বলা?" হিরণের কণ্ঠে তেমনি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর!

কিরণ মুখ ফিরাইয়া তীব্র-স্বরে কহিল, "জলদবাবু রোজ এখানে আসেন। সবাই ওঁর সঙ্গে কথা বলেন, আমিও বলি। বাবা, মা, দাদা, কেউ ত আমায় মানা করেন নি কখনো? বরং দাদাই প্রথম কথা বল্‌তে বলেন। তাতে দোষ হয় বলে জানি না ত!"

হিরণ কহিল, "দাদা, বাবার কাণ্ডই অম্‌নি। মা, খুড়ীমা ত সংসার সাম্‌লাতেই ব্যস্ত—ওঁদের রান্না-ভাঁড়ার ছাড়া আর কোন দিকে চোখ আছে কি?"

"ওঁদের নেই,—তোমার ত আছে!" বলিয়া কিরণ বিষণ্ণ-বিরক্ত-মুখে ঘরের বাহির হইতে গিয়া বাধা পাইল। হিরণ তাহার আঁচল টানিয়া ফিরাইয়া কহিল, "রাগ কর্‌লি ভাই? সত্যি বল্‌চি, তোকে কষ্ট দেব বলে আমি কিছু বলিনি। বড় বোনের বলা উচিত ভেবেই বলেচি,—তুই ত বুদ্ধিমতী, লেখাপড়াও শিখেছিস্, নিজেই বুঝে ত্তাখ্। এই যে জলদ বাবুর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা—'না দেখ্‌লে রইতে-নারি' ভাব, এ কি ভাল? অন্যেরও ত চোখে পড়ে?"

"পড়্‌লেই বা,—কি করেচি আমি—যার জন্যে যা খুসী তাই বল্‌বে—?" অভিমানে কিরণের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। বক্তব্যটুকু সে শেষ করিতে পারিল না।

হিরণ তাহার অনিচ্ছা না মানিয়া টানিয়া তাহাকে সোফার উপর নিজের পাশে বসাইল। বোনটির বেদনাহত মুখের পানে চাহিয়া তাহার স্নেহ-তরঙ্গ উথলাইতে চাহিলেও সে স্থির হইয়া রহিল। অপ্রিয় হইলেও চিকিৎসককে অনেক সময় রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। কিন্তু সে নিষ্ঠুরতা শুধু রোগীর মঙ্গলের জন্যই। আজ সে উপদেষ্টার যে পদ গ্রহণ করিয়াছে, ইহার দায়িত্ব তাহাকে পালন করিতেই হইবে! বিচলিত হইলে চলিবে কেন? হিরণ কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব—ঠিক জবাব দিবি?"

"কেন দেব না?" বলিয়া কিরণ জানালার বাহিরে একটা ফলে-ফুলে ভরা নিম গাছের প্রতি বিষণ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

হিরণ কহিল, "জলদবাবু যদি হঠাৎ বদ্‌লি হয়ে এখান থেকে চলে যান? আর কখনও ওঁর সঙ্গে দেখা হবার আশা যদি না থাকে, তা'হলে তুই কি করিস্?"

"আফিং খাই কি কেরোসিনে পুড়ি—এমনি কিছু করি বোধ হয়?" কিরণের কথায় ঝাঁজ থাকিলেও হিরণ বুঝিল, এইবার মনের ঠিক জায়গাটি

সে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। সে কহিল, "না, অত বড় কিছু করিস্ না। তবে দুঃখ যে পাস্ খুবই, তা নিশ্চয়। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদিস্‌ও,—মনের ভেতরটা সব শূন্য হয়ে যায়। সত্যি কি না, ভেবে বল্ দিকি?"

কিরণ কহিল, "কেউ কোথাও গেলে কেঁদে আমি চিরকালই থাকি। তখন যদি তা করি, আমার নিজের কাছে তাতে একটুও আমি আশ্চর্য্য হব না। দেখ দিদি, আমিও ক'দিন থেকে দেখ্‌ছি, তুমি আমায় সারাক্ষণ কেবল চৌকী দিয়ে ফির্‌চো—কিন্তু কেন বল দেখি? আমার দোষ কিছু খুঁজে পেলে কি? দাদার বন্ধু হন্, আমিও ওঁকে দাদার মত-ই মনে করি। ওঁর সঙ্গে কথা কইলে দোষ হয়, তা আমি জানি না।"

হিরণ ক্ষুণ্ণভাবে কহিল, "কথা বলায় দোষ কি থাক্‌বে? তুই রাগ কর্‌চিস্—আমি কিন্তু ঠিক সেভাবে বলিনি, কিরণ। সব জিনিষেরই একটা সূক্ষ্ম দিক আছে কি না। আমি বল্‌ছিলুম সেই মনের দিক থেকে—ব্যবহারের দিক থেকে নয়। দাদার পথ চেয়ে যে চোখ-কাণ তোর এমন করে পথের উপর পড়ে থাকে না—তা তুইও জানিস্! আর কোন্ সাড়ী-খানিতে কেমন মানাবে, চুলগুলি কোন্ ছাঁদে কেমন করে বাঁধ্‌লে মুখ-খানির বাহার বেশী খুল্‌বে, এ-সব গুরুতর সমস্যাও মনে ওঠ্‌বার দরকার হয় না। যদি বল—দাদার মতন নয়, প্রিয় বন্ধুর মত—তা'হলেই কতকটা ঠিক্ কথা বলা হয়। কিন্তু তোমার মত ছেলে মানুষের এমন বন্ধু থাক্‌লে লোকে নিন্দে কর্‌বার সুযোগ পায়। জলদবাবু একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। তাঁর ছেলে আছে, স্ত্রী আছে। নিন্দের কারণ কিছু নেই অবশ্য। তবু জান ত, ও জিনিষটা এমনি মন্দ যে, সীতা-হেন সতীকেও সে জন্যে বনে যেতে হয়েছিল। লোকের কথা তত গ্রাহ্য করি না—তবে আমি ত এ কালের আর সে কালের অনেক নভেলই পড়েচি। সখী ঢের থাকে—কিন্তু সখা থাক্‌লেই মুস্কিল হয়! একজন নায়িকাকে তিনজন নায়কে ভালবাস্‌তে পারে।

গ্রন্থকার দু'জনকে সন্ন্যাসী বা যা-হয়-কিছু করে একজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে শেষ রক্ষা করে থাকেন। কিন্তু উল্টো হলেই না বিপদ! এমন বিপদে অনেকেই পড়েচেন। এখনকার দিনে ভদ্র-সংসারে দু'চারটে বিয়ে অবশ্য কেউ করে না। তা'ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষও আছেন। কিন্তু আমরা যে সীতা-সাবিত্রীর জাত। সুধু দেহ নয় ত,—মনকেও যে আমাদের সূর্য্যের মত উজ্জ্বল নির্ম্মল রাখ্‌তে হবে। মনের আর্‌সিখানা যদি আজে-বাজে, যা-তা এঁকে-জুকে আগে থেকেই ভরিয়ে রাখি, তা'হলে আসল ছবিটি ত মনের সবখানটি জুড়ে পড়্‌বে না ভাই? হয়ত সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে কত বারই তুলনায় কত খুঁত-খুঁতুনি মনে উঠে তার সব শান্তিটুকু-ই নষ্ট করে দেবে। হয়ত এমন কত—"

কিরণ শান্তমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরভাবে কহিল, "তোমার বোধ হয় আমি কোন ক্ষতি করিনি?"

হিরণ স্মিত-মুখে কহিল,"না, তা করিনি। তুমি আমার ক্ষতি কর্‌লেও আমি তোমার ক্ষতি কখনো কর্‌তুম না। আমার স্বার্থে আঘাত লাগ্‌লে হয়ত তোমায় উপদেশ দেবার পথ আমার উবে যেত। কিন্তু তখনও আমি তোমার শুভাকাজ্ক্ষিণী বড় বোনই থাক্‌তাম। এর পরে ঠাণ্ডা-মাথায় ভেবে দেখো কিরণ, অপাত্রে ভালবাসা দিতে বারণ করে খুব অন্যায় আমি করিনি।"

"যা খুসী, তাই কিন্তু বল্‌চ দিদি। কে চায়? বয়ে গেছে আমার" বলিয়া ঝড়ের বেগে সহসা সে ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

হিরণের মনে হইল, ঝড়ের সহিত বৃষ্টিও যেন দেখা দিয়াছে! উপস্থিত সে নির্জ্জনে কাঁদিবার জন্যই পলাইয়া গেল। যাক্‌—ঝড়ের উদ্দাম বাতাস হাহাকারই টানিয়া আনে! বৃষ্টির শীতল ধারা তাহাকে শান্ত করে! মৃদু হাসিয়া টিপয়ের উপর হইতে সেলায়ের ঝাঁপিটি নামাইয়া সে মনে মনে

বলিল, "এ রোষ রবে না চিরদিন—" বলিয়া ঝাঁপি খুলিয়া সেজ-খুকীর ফ্রক্ সেলাইয়ে পুনরায় মনঃ-সংযোগ করিল।

এই কাজটি প্রায় ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে সে আরম্ভ করিয়াছিল; এবং জলদের আবির্ভাবে ইহা উঠাইয়া রাখিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তখন কিরণও এখানে উপস্থিত ছিল। তাহার ব্যগ্র দৃষ্টি ঘড়ি ও ঘরের আরসি-খানার পানে যতটা নিবিষ্ট হইতেছিল, তাহাতে দিদির তাঁতের কাপড়ের অসৌখীন ফ্রকের প্রতি মনোযোগ দিবার মত সুবিধাও তখন ছিল না। মানুষ মাত্রেই নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। অল্প-বয়সীদের মধ্যে আবার এ রোগটা কিছু বেশী। দুই বোনে পাশাপাশি বসিয়া পরস্পরকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছিল। হিরণ ভাবিতেছিল,—কিরণের মনটিকে সে এইবার ঠিক নখ-দর্পণে দেখিয়া লইয়াছে। কিরণ ভাবিতেছিল,—আশ্চর্য্য মানুষ দিদি! তাই জলদ বাবুর সহিত মন খুলিয়া কথা কয় না। বরং কেন উনি নিত্য আসেন, এমন অভিযোগও উহার কথায় কথায় বিদ্রোহীর ভাবে প্রকাশ পায়। দিদির মতে একা শরৎ বাবু ছাড়া জগতে আর আদর্শ মানুষ নাই! পৃথিবীতে মানুষ ঐ একটি মাত্র! কেমন করিয়া মানুষ ভালবাসায় এমন এক-চক্ষু হইয়া যায়, কে জানে? স্বামীকে ভক্তি করিতে হয় কর, ভালবাসিতে হয় বাস, কে মানা করিতেছে? তা'ই বলিয়া তাঁহার দোষ-গুণও দেখিতে পাইবে না? এ কি অন্ধ-ভক্তি? এমনি করিয়া পূজা দিয়াই ত আমরা নিজেদের সম্মান খোয়াইয়া বসিয়াছি। ধর, জলদ বাবু—মানুষটির ত অনেক গুণ,—তা'ই বলিয়া কি তাঁ'র সবই ভাল ভাবিতে হইবে না কি?

কিরণ মনে মনে জলদ বাবুর দোষানুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিল,—আপাততঃ কৈ কিছুই ত স্মরণ হইতেছে না। শেষে সে সিদ্ধান্ত করিল, মন এখন চঞ্চল রহিয়াছে, তা'ই স্মরণ হইতেছে না, পরে ভাবিয়া

দেখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ত্রুটি উঁহারও পাওয়া যাইবে। কিরণের মনে হইল, জলদ বাবু আজ অযথা বিলম্ব করিতেছেন। কাছারি হইতে ফিরিয়াছেন, সেই পাঁচটায়—এখন ছয়টা বাজিয়া তেরো মিনিট্ হইয়াছে! এখনও তাঁহার আসিবার নাম নাই! আশ্চর্য্য মানুষ! গল্প পাইলে তাঁ'র আর কিছুই মনে থাকে না! হয় ত কোথাও গল্পে জমিয়া গিয়াছেন। আর কি সময়ের হুঁস্ আছে? যা'ই হোক্, কিরণের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। অতঃপর সিঁড়িতে জুতার শব্দের সহিত জলদের হাসি ও কথার সুর শুনিতে পাওয়া গেল। আর সে আওয়াজটি কিরণের কাণেই আগে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

মেঘ ও রৌদ্র

পরদিন নিয়মিত সময়ে যে উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও উৎসাহের ভরে জলদ তাহার তীর্থ-মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল—ফিরিবার সময় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাতেই ফিরিল। সহসা অত্যধিক আহত হইলে বা কোন প্রিয় বস্তু হারাইলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয়, জলদের মুখেও তেমনি বেদনা ও হতাশার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে শুনিয়া আসিয়াছে, কিরণ সেদিন সকালে তাহার মামার সঙ্গে ত্রিপুরায় চলিয়া গিয়াছে। কিরণের মাতামহ কিছু অসুস্থ, তা'ই কিরণ তাঁহার সেবার জন্য গিয়াছে। ত্রিপুরায় সে কখনো যায় নাই। সেখানে যাইবার লোভও তাহার মনে পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এই সময় কি একটা মোকর্দ্দমা উপলক্ষে মামা আসিয়াছিলেন; হিরণ আসায় মার কাজের দোসর মিলিয়াছে, তা'ই সে এমন শুভ অবসর ত্যাগ করিতে রাজি হইল না। শুনিয়া জলদ বিস্মিত হইল। কাল সন্ধ্যা-বেলায় সে এ বিষয়ের কোনো আলোচনাই শুনিয়া যায় নাই ত! একটা রাত্রির মধ্যেই সব স্থির হইয়া গেল? না—অনাবশ্যক-বোধে এ বিষয়টা কিরণ ইচ্ছা করিয়াই তাহার কাছে কিছু বলে নাই? কিন্তু বলিলে ক্ষতি কি ছিল? জলদ ত তাহার মনের শুভ-ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিত না? না হয় সে ক্ষুণ্ণ হইত! সে ত আজও হইয়াছে—এবং চিরদিনই হইবে! তাহাতে কাহার ক্ষতি? তবু জানা থাকিলে বিদায়-ক্ষণে বাড়ীতে না হয় ষ্টেশনে গিয়াও ত একবার চোখের দেখা দেখিয়া আসিত! আর সেই মধুর দৃষ্টি—মোহন হাসিটুকুই ভবিষ্য জীবনের

সম্বলরূপে সে সঞ্চয় রাখিয়া দিত! সে যখন ফিরিয়া আসিবে, জলদ হয়ত তখন সরকারী কাজে বদ্‌লি হইয়া,—কে জানে,—কত দূরে চলিয়া যাইবে। হয়ত আর কখনও তাহাকে দেখিতেও পাইবে না! তাহাদের আনন্দময় বন্ধুত্বের এইখানেই হয়ত শেষ! এ দেখা না হওয়াই যে ছিল ভাল! যা' এত ভঙ্গুর, এত অনির্দ্দিষ্ট, তাহার জন্য এ কি ব্যর্থ ব্যথা!

জলদের মনে হইল, নিজেকে এমনভাবে জড়াইয়া সে ভাল করে নাই। সত্যই কি কিরণ তাহার বন্ধুত্ব আর চায় না? সে কি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে ব্যথা দিয়া গিয়াছে? তাহাদের এত দিনের তিলে-তিলে গড়া এমন যে ভালবাসার মন্দির, সে কি এমনি বিনা-বাতাসেই ভাঙ্গিয়া গেল? সবটুকুই চপলা বালিকার খেয়াল? মূলে তাহার কিছু-ই নাই, কিছু ছিলও না? সেই যে ব্যাকুল আগ্রহে পথ চাহিয়া থাকা—যে চাহনিতে ভিন্ন-পথের পথিক সে,—পথ হারাইয়া বিপথে পাড়ি দিতে বসিয়াছিল, সেও তবে মিথ্যা?

সে দিন জলদ স্থির করিল, কিরণকে একখানা চিঠি লিখিয়া সে তাহার মনের কথা জানিয়া লইবে। নীতীশের কাছে ঠিকানা জানিয়া আসিল। সেই সঙ্গে কিরণের পৌঁছানো সংবাদও শুনিয়া আসিল। চিঠি লিখিবার ইচ্ছা মনে উঠিলে সে যেন ইহার মধ্যেও একটুখানি উন্মাদনার আনন্দ অতি-গোপন অন্তরের তলে তলে অনুভব করিল। এই একটিমাত্র উপায়ে তাহাদের বন্ধুত্বকে সে এখনও বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। হারাইয়াও আবার তাহাকে কাছে পাইবে। পূর্ব্বে জলদ কোন দিন কিরণকে কোন চিঠি লেখে নাই। কিন্তু কিরণের হাতের লেখা ছোট-খাট চিঠি সে দুই-চারিখানি পূর্ব্বে পাইয়াছে। তাহাদের চাকর মধু বাজার যাইবার সময় সে চিঠি ডেপুটি বাবুর নিজের হাতে দিয়া গিয়াছে। চিঠিতে অবশ্য কথা বেশী কিছু থাকিত না, এবং যাহা থাকিত, তাহা বৈকালে দেখা হইলে বলা চলিত, তবু

কিরণের মনের তাড়া বেশী থাকায় সে সময়ের অপেক্ষা রাখিত না। পত্রের বিষয় থাকিত এমনি—'সে দিন জলদ যে বইখানি আনিবে বলিয়া গিয়াছিল, তাহা যেন ভুলিয়া না যায়' অথবা—'অমূল্যের মেসের ঠিকানা সে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা লিখিয়া দিতে হইবে'—এমনি অনুরোধ। অমূল্য পরীক্ষা দিতে কলিকাতায় গিয়াছে।—তবু সেই ছোট চিঠির টুক্‌রাগুলি জলদকে প্রীত করিত। সে গুলি যে লেখিকার কতখানি উদ্বেগ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা সে কল্পনায় অনুভব করিত—করিয়া তৃপ্তির হাসি হাসিত।

কয়েক দিন ইতস্ততঃ করিয়া কাটাইয়া কিরণকে চিঠি লিখিয়া তাহার কৈফিয়ৎ লওয়াই সে স্থির করিল। কেন সে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে জলদকে জানাইয়া গেল না? মধুর হাতে দু'লাইন লিখিয়া দিলেও ত জলদ যথা-সময়ে হাজির হইতে পারিত! কি অপরাধ সে করিয়াছিল যে এমন কঠিন শাস্তি তাহার জন্য বাহাল হইল? হয়ত জীবনে তাহাদের দেখা-শোনার এই শেষ। আর হয়ত কখনও তাহারা এ সুযোগ পাইবে না। তবে বিদায়-কালের পাথেয়—বন্ধুত্বের এ দাবীটুকু পূরণ করিলে কিই বা তাহার ক্ষতি ছিল? হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে এমন কি অপরাধ সে করিল, যে জন্য এই কঠিন দণ্ড? পত্রের সম্বোধনে কল্যাণীয়া ও শেষাংশে শুভার্থী লিখিয়া চিঠিখানা ডাকে ফেলিয়া উৎকণ্ঠিত-আগ্রহে সে তাহার উত্তরের পথ চাহিয়া রহিল। পোষ্ট-অফিসের ঠিকানায় চিঠির জবাব দিবার কথা লিখিয়াছিল। বাড়ীতে চিঠি আসিলে যদি সুনীতি তাহা কৌতূহল-বশে খুলিয়া পড়ে! সুনীতির নিকট গোপন করিবার এই ইচ্ছা তাহার নিজ-কার্য্যে তাহাকে লজ্জিত করিলেও নিরস্ত করিতে পারিল না।

মনকে সে বুঝাইল, এ কার্য্যের জন্য সুনীতিই অংশতঃ দায়ী। কিরণকে সে ত তাহার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সুনীতি ত

কিরণের কথা শুনিতে চায় না। কখনো মুখ ভার করে, কখনো ছুতা করিয়া উঠিয়া যায়। তা'ই জলদও আর সে সব কথা তুলিত না। এই যে—না বলিয়া কিরণ হঠাৎ চলিয়া গেল, সে কথা সেই রাত্রেই সে সুনীতির কাছে আগে জানাইয়াছিল; ভাবিয়াছিল, সেখানে সে সহানুভূতি পাইবে। কিন্তু হায়রে, এ যে পাথরে তাহার জল ঝরাইবার সাধ! সুনীতি শুধু অনাসক্তভাবে জবাব দিয়াছিল, "আসবে এখন ফিরে।" ব্যস্—সহানুভূতির চূড়ান্ত হইয়া গেল! সে যেন কিছুই না। ছোট খোকার বা বড় খোকার কান্নার মতই সে যেন অনায়াসলভ্য নিত্য ঘটনা! তা'রপর সাত দিনের ভিতর একবারও সে স্বামীর চিন্তার সংবাদ লইয়াছে কি? কিছু না। কেনই বা লইবে? সে ত কিরণকে ভালবাসিত না, বরং হিংসাই করিত। বুড়া-বয়সে তাহার সবই বাড়াবাড়ি! বৃথা সন্দেহে পড়িয়া নিজেও দুঃখ পায়—অন্যকেও দেয়। এ-সব কি? মেয়েগুলা মনে করে, মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিয়া স্বামী তাহাদের কেনা হইয়া গিয়াছে। কাহারও সহিত কথা কহিলে বা হাসিলে—এতটুকু এদিক-ওদিক হইলে পৃথিবী উল্টাইয়া গেল! কিরণের মত মেয়ের বন্ধুত্ব পাওয়া জলদ গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করে। মানুষ ত আর পাখী নয় যে সে শুধু নিজের খাঁচার মধ্যেই বসিয়া থাকিবে, বাহিরের সহিত কোন যোগ রাখিবে না। এখন ত সকল শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরাই বন্ধু-বান্ধবের সহিত এমন মেলামেশা করিয়া থাকে, তাহাদের সংসারে ত এ জন্য এমন বিপ্লব বাধে না। তবে কিরণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া সেই বা স্ত্রীর কাছে অপরাধী হইবে কেন?

কিছুদিন হইতে তাহার মনে একটা সংশয় জাগিয়াছে। তবে কি সত্যই সুনীতির সন্দেহের কোন ভিত্তি আছে? কিরণকে সে তাহার বন্ধুত্বের পাওনা ছাড়া কি বেশী কিছু দিয়া ফেলিয়াছে?

যদি দিয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতিই বা কি! সে ত কোনরূপ নীতি-

বিগর্হিত অন্যায় কাজ কিছু করে নাই। যোগ্য ব্যক্তিকেই ভালবাসিয়াছে। সখী বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে, ইহা কি এমনই অপরাধ? প্রতিদানে সেও কি সেখানে কিছু পাইয়াছিল? হয়ত পাইয়াছিল!

জলদ ভাবিয়া দেখিল, বুঝি দেওয়ার চেয়ে পাওয়ার তালিকা বড় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রত্যেক কথা, হাসি, ভঙ্গিমা—সমস্তই যেন জলদের চিত্তবিনোদনের জন্যই সৃষ্ট ছিল। তাহাকে নিজের হাতে খাবার দিয়া, বাতাস দিয়া, গল্প করিয়া ও গল্প শুনিয়া সে যেন বিশ্বের আনন্দ উপভোগ করিত। অতর্কিতে কতদিন সে তাহার এত কাছে আসিয়া বসিত—যে আপন-ভোলা জলদকেও চকিতে একবার অন্যের দৃষ্টি-পর্য্যবেক্ষণে বাধ্য হইতে হইত। প্রতিদিন বিদায়-কালে, কোন দিন আসিবার সময়েও সেই দুইটি যাদু-করা কালো চোখে কি মধুর দৃষ্টি ভরিয়াই সে তাহার পথের যাত্রা মধুময় করিয়া দিত! সে চোখের ভাষা কি ভালবাসার চোখে কখনও গোপন থাকে? যাতায়াতের পথটা ছিল অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, তা'ই সুবিধাও ছিল খুব। নহিলে ফিরিয়া তাকাইতে গিয়া কতবারই যে তাহাকে লোকের ধাক্কা সহিতে হইত, তাহার কি আর হিসাব ছিল! ইদানীং মা ও সুনীতির উপদ্রবে প্রায়ই তাহার প্রতীক্ষা দীর্ঘতর হইয়া উঠিত। জলদের সময়ে যাওয়া ঘটিত না, তাহাতে সে কতই না ক্ষুব্ধ হইত। "আপনাকে রোজ রোজ আস্‌তে বলে কেবল জ্বালাতন করি, এখন আপনার গল্প কর্‌বার ত আর লোকের অভাব নেই, তাই আর আস্‌তে ইচ্ছা হয় না! সুনীতি দিদি বুঝি মানা করেন এখানে আস্‌তে?" এমনি সব অভিমানের কথায় অভিমানিনী নিজ অনুকূল উত্তর আদায় করিয়া তবে ছাড়িত। সে-মুখ বলিত—জলদকে সে অশ্রদ্ধা করে না। তাহার সঙ্গ তাহার অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। হয়ত,—হয়ত সে তাহাকে ভালও বাসিত!

এ চিন্তাটিকে জলদ প্রশ্রয় দিতে সাহস করিল না। ইহার যৌক্তি-

কতাকে সমর্থন করিতে সে কুণ্ঠা অনুভব করিল। তবু এ অস্পষ্ট-চিন্তায় কত সুখ! ইহাতে যে বিষ-মিশ্রিত সুরা ছিল। ত্যাজ্য হইলেও তাহা লোভনীয়!

নীলকণ্ঠের মতই তা'ই সে হলাহল সে কণ্ঠমধ্যেই ভরিয়া রাখিল। কিরণ যখন কাছে ছিল, তখন তাহার আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল না। সে তাহাকে দেখিতে ও তাহার সহিত গল্প করিতে ভালবাসিত। পাওনা যখন পূরামাত্রায় পাইতেছিল, তখন মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। এখন কিরণ সহসা চলিয়া যাওয়ায় নিজের মনের ভাব সে যেন অত্যন্ত সহসা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইল। বিস্মিতই হইল, কিন্তু দুঃখিত হইল না। লোভ যে কখন্ কোন্ ছিদ্রপথে মানুষের মনে প্রবেশ করে, তাহার গতি-নিরূপণের শক্তি যদি মানুষের থাকিত, তবে মানুষ 'মানুষ' না হইয়া দেবতা হইতে পারিত। সংসারে নর-রূপী দেবতার অভাব না থাকিলেও সাধারণ মানুষ মানুষই! জলদের নিষ্কলুষ বন্ধুত্ব—বন্ধুত্বের সীমা ছাড়াইয়া প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল কি না, তাহা সে কোনদিনই যাচাই করিয়া দেখে নাই। সে চিরদিনই ভাব-প্রবণ। সংসারের ছোট ছোট দোষ-ত্রুটি দেখিয়া বা মানিয়া চলা কোনদিনই তাহার স্বভাব নয়। মানুষের জীবনের পথ যদি চিরদিনই সুগম থাকিত, প্রলোভন যদি মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা না দিত, তবে তাহার জীবনে অনেক অসুখ-অশান্তিই জন্মিতে পারিত না!

সাধারণ মানুষের চেয়ে যাহাদের মধ্যে আবার একটু অসাধারণত্ব, সংসারে তাহাদেরই জীবন-পথ আরও জটিল হইতে দেখা যায়। তাহার কারণও ঐ অসাধারণত্ব। কেহ ঘরে বসিয়া যুদ্ধের স্বপ্ন দেখিতেও ভীত হয়, আবার কেহ সাধ করিয়া তাহারই মধ্যে যোগদিতে চায়, এবং কখনো দু'একটা গোলা-গুলির আস্বাদও হয়ত অনুভব করে। মানুষে-মানুষে এই যে বিভিন্নতা, ইহা তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারেই জন্মায়। তা'ই ফলাফলের জন্য

মানুষ নিজেই দায়ী। যাহার জীবনের পথ বাধা-বন্ধনহীন, সরল ও সুগম, আমরা তাহারই প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করি এবং অপর পক্ষে বীরত্ব থাকিলেও তাহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিতে পারি না। অথচ এই শ্রেণীর লোকের যে আকর্ষণী-শক্তি থাকে, তাহাতে অনিচ্ছাতেও আকৃষ্ট হইতে বাধ্য হই।

সরল-চিত্ত জলদের স্বচ্ছ মনে কোন দিনই কপটতা ছিল না। সে শুধু ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল। নূতন আকর্ষণের আনন্দ তাহাকে তৃপ্ত করিলেও সময় সময় পীড়াও যে না দিত, এমন নয়। মনে হইত, সে যেন তাহার অধিকারের সীমা ছাড়াইয়া কোন্ সঙ্কীর্ণ পথে যাইতেছে। সুনীতির সহিত অনেক সময় কিরণকে লইয়া এই সব গোপনতা সৃষ্টি করিতে হওয়ায় এই ভাবটা তাহার মনে জাগিতেছিল। কিন্তু কোন সাধারণ বিষয়ে চিন্তা করাও তাহার স্বভাব ছিল না—এ সব তর্ক মনে উঠিলেও সে তাহাকে বেশী একটা প্রশ্রয় দিত না। বর্ত্তমানকে সে পূরাপূরি দখল করিতেই ভালবাসিত। মানুষের বিচার সে নিজেকে দিয়া করিত। যে কার্য্যে তাহার মনে সংশয় না জন্মায়, অন্যেরই বা তাহাতে সংশয় জন্মিবে কেন? তা'ই নিজের ব্যবহার সংশোধন না করিয়া অন্যের প্রতিই সে ক্রুদ্ধ হইত।

আজ চুনিয়া চুনিয়া অতীত দিনের কথাই তাহার মনে পড়িতেছিল। কিরণকে হারাইয়া তাহার ভালবাসার নিদর্শনগুলি সে যেন স্পষ্ট করিয়াই দেখিতে পাইতেছিল। এমন একটি দিন যায় নাই, যে দিন কিরণ তাহাদের সান্ধ্য-সভায় যোগ না দিয়াছে। ঘরে যত জায়গাই থাক, কিরণ কখনও তাহার একেবারে কাছটি না ঘেঁষিয়া বসিত না। সে এত কাছে, যে তাহার সুরভি-নিশ্বাসের বাতাসটুকু জলদকে স্পর্শ করিত। ছবি দেখিতে, বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে কতবারই তাহার কোমল করের মধুর স্পর্শ সে

অনুভব করিয়াছে! ঠাকুর চলিয়া যাওয়ায় কোন দিন রান্নাঘরে মা'র কোন কাজে আবদ্ধ থাকিলে সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতই ছট্‌ফট্‌ করিত। ছুতা করিয়া কতবারই না ছুটিয়া আসিয়া একটু হাসিয়া, দুইটা যা' তা' বকিয়া আবার কাজে চলিয়া যাইত। তাহার উৎসুক মন যে জলদের এতটুকু কথার আওয়াজ, একটু হাসির সুর শুনিলেও ব্যস্ত হইত। কিরণ না থাকিলে সে-বাড়ীর আর কোন আকর্ষণই তাহার থাকিত না। ঘরে অন্য যাহারা—কিরণের ভাই-বোনেরা থাকিত, তমোনাশী এক চন্দ্রের অভাবে সেই শত তারা জলদের অন্ধকার মনে আলো দিতে পারিত না। সে দিন জলদের হাতের নূতন আংটিটা তাহার হাত হইতে টানিয়া খুলিয়া কেমন অসঙ্কোচে সে নিজের আঙ্গুলে পরিয়া ফেলিল। আবার জলদের ফিরিবার সময় তেমনি অবলীলায় তাহার হাতখানা টানিয়া লইয়া আংটিটা পরাইয়া দিয়াছিল! জলদ হাসিয়া বলিয়াছিল, "কি করলে, জানো? অঙ্গুরীয়-বিনিময়!" সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিল, "বিনিময় নয়,—গচ্ছিত-প্রত্যর্পণ! গচ্ছিতও নয়, ডাকাতির মাল ফেরৎ দিলাম।" কথাটা সে অবলীলায় বলিলেও জলদের কথায় তাহার মুখখানা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া কি মনোহরই না দেখাইয়া ছিল! সে মুখের পানে চাহিয়া জলদও যেন ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। সে দিনও সে তেমনি মধুর দৃষ্টি দিয়াই তাহাকে বিদায় দিয়াছিল, উপহাসে নয়। পথে চলিতে চলিতে যতদূর দৃষ্টি যায়, জলদ তাহার হাসিমাখা সুবেশ-সজ্জিত মূর্ত্তিখানিই যে দেখিতে পাইয়াছিল!

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের ব্যবহার মিলাইয়া সে কোন সামঞ্জস্য আনিতে পারিতেছিল না। কিরণ তাহার মামার বাড়ী গিয়াছে। কথাটা এমন কিছু আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক নয়, তবু জলদের মনে হইতেছিল, এ যেন অত্যন্ত অন্যায়রূপে তাহাকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। আজই সে

তাহার কাছে এমন অনাবশ্যক পর হইয়া গেল? হিরণ বলিয়াছে, "সে একরকম জেদ করেই চলে গেল—যা ধরবে, তা ত নড়বে না?" সে তবে ইচ্ছা করিয়াই গিয়াছে? কেহ বাধ্য করিয়া তাহাকে পাঠায় নাই! "শীতটা সেখানেই থাকিবে"—গৃহিণী এমন মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। এখন সবে এই কার্ত্তিকের সুরু—শীত শেষের এখনও বহু বিলম্ব। তা'ছাড়া শীতের পর—আবার কোন নূতন ঘরে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে কি না, সে কথাও ত কিছু বলা যায় না? জলদও এখানকার স্থায়ী মানুষ নয়। হয় ত এ জীবনে আর কখনও তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিবে না। সে বার বার মনে মনে আবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিল,—যাহা চিরন্তন, তাহা ঘটিয়াই থাকে। ইহাতে ক্ষোভ করিবার কিছু নাই। আর পাঁচ জনের মত সেও এখানে দর্শক,—তাহার কার্য্যে চুপ করিয়া অনুমোদন করিতেই বাধ্য! তাহার স্বাধীনতার উপর জলদের কিসের দাবী! না বলিয়া চলিয়া যাওয়া—সে ভাল বুঝিয়াছিল, তা'ই গিয়াছে—বেশ করিয়াছে।

কিন্তু তবু এই শেষের চিন্তাটিকে সে যেন কোন মতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছিল না। এই কথাটাই বারবার মনে তোলাপাড়া করিয়া ইহার গুরুত্ব পাষাণ-ভারের মতই তাহার বুকে চাপিয়া বসিতেছিল। হাস্য-কৌতুকময়ী লীলা-চঞ্চলা কিরণের মূর্ত্তি তাহার বর্ত্তমানের ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিল। সুনীতিও এই কয়দিন স্বামীর নিভৃত চিন্তায় অবসর দিবার জন্যই যেন তাহাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া চলিতেছিল। শাশুড়ী ও শৈল চলিয়া যাওয়ায় তাহার কাজও বাড়িয়াছিল; তা'ই তাহার অনাসক্ত দূরত্ব-ভাব জলদকে সংশয়ান্বিত করে নাই। সে মনে করিত, এখন আর কাজের জন্য সুনীতি তাহার কাছে বড় বেশী আসিবার সময় পায় না। ইহাতে সে ক্ষুণ্ণ না হইয়া খুসীই হইয়াছিল। এখনকার মনের অবস্থায় পত্নীর মনোরঞ্জনের অক্ষমতা সে পদে পদে অনুভব করিতেছিল। ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীকে কেন,

কাহাকেও সে ব্যথা দিতে চাহে না। স্ত্রীকে সে ভালবাসে; তবে অবশ্য-প্রাপ্য ঘরের জিনিষ জানিয়া, তাহার প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ দিবার প্রয়োজন বোধ করিত না। যা'ই কেন হউক না, যত ত্রুটিই ঘটুক না, এখানে ত আর বাঁধন দিয়া ভাঙ্গন বাঁচাইতে হইবে না। সে যে নিজের বাঁধা-ঘাটের শীতল বারি,—প্রয়োজন-কালে মিলিবেই। তাহাতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছুই নাই। তাহার সবটুকুই যে জানা, তা'ই তাহার রক্ষার জন্য ভয়ও ছিল না। যাহা দুর্ল্লভ, তাহাই সুন্দর! সংসারের নিয়মই এই!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ভুল ভাঙ্গা

নিঃশঙ্ক পথিক চলিতে চলিতে সহসা পথ হারাইয়া একটা প্রকাণ্ড খড়ের ধারে আসিয়া পড়িলে যেমন ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে, জলদও তেমনি ভাবে সুনীতির হাতে কিরণের লেখা চিঠিখানির পানে চাহিয়া রহিল। এই চিঠিখানির জন্য যে সে সপ্তাহ-কাল কাতর আগ্রহে কম্পিত-বক্ষে পথ চাহিয়া বসিয়াছিল—সে কথা এখন আর যেন তাহার মনেই রহিল না। এই ত সেই প্রার্থিত উত্তর! সেই পরিচিত হাতের সুছাঁদের অক্ষরগুলি! তবু অধিকারী-ভেদে এ যেন 'অমিয়-সায়রে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল'! কিরণ তাহার অভিযোগের উত্তর তাহাকে ত দেয়ই নাই—সে আবার উত্তর দিয়াছে সুনীতিকে। মাল-শুদ্ধ আসামী যদি ধরা পড়িয়া যায়, তাহার অবস্থাও বোধ হয় এমনি শোচনীয় হইয়া উঠে। সুনীতি খোলা চিঠিখানা প্রসারিত অবস্থাতেই টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, "তোমার কিরণের চিঠি।"

চোখ মেলিলেই চিঠিখানি দেখা যায়। জলদ প্রথম দৃষ্টিপাতেই দেখিতে পাইল, সম্বোধনে—'পূজনীয়া সুনীতি দিদি' লেখা। চিঠিখানি কিরণের হাতেরই লেখা বটে। জলদ যে কিরণকে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা সুনীতি তবে জানিয়াছে? আজ আর এ জানায় যে সে ভ্রূক্ষেপও করে না—সে কথা কিন্তু মনে করিতে পারিল না। বরং একটা কুণ্ঠিত অপরাধের ভাবেই তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। জোর করিয়া মুখে একটু হাসি আনিয়া মনের অপ্রতিভ ভাবটাকে তাড়াইয়া দিবার জন্যই যেন সে

বলিল, "তুমি যে কিরণের চিঠি পেয়েচ, দেখ্‌চি। বাঃ!" কথাটা সে সাধারণভাবেই বলিতে গেল, কিন্তু উচ্চারণে কণ্ঠস্বর বেসুরা বাজিল!

সুনীতি একটি কথাও না বলিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে জানিত, স্বামীর হাতে এইমাত্র সে যাহা দিয়া আসিল, তাহাতে আর যাহাই থাক, আনন্দ বা সান্ত্বনা ছিল না। নিজের দুঃখে ব্যথিত হইলেও স্বামীর দুঃখও যে সে সহিতে পারিত না! এমন দুর্ব্বল মন লইয়াই সে জন্মিয়াছিল!

চিঠিখানায় বেশী কথা কিছু লেখা ছিল না। কিরণ লিখিয়াছে, "জলদবাবুর পত্রে বুঝিলাম, তাঁহাকে না জানাইয়া এখানে আসা আমার অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার নিকট অনুমতি লওয়া যে আমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। আপনার স্বামীকে বলিবেন, তিনি যেন ক্ষমা করেন। দাদামহাশয় বেশ ভালই আছেন। তাঁহার নিকট পড়াশুনার খুব সুযোগ পাইতেছি। জায়গাটিও ভারী সুন্দর। আমার ইচ্ছা, অনেক দিনই এখানে থাকি।" উপসংহারে কাহারও কুশল যাচ্ঞা করিয়া পত্রের একটা উত্তরও সে প্রার্থনা করে নাই। 'প্রণতা কিরণ' বলিয়া নাম সহি করিয়াছে।

চিঠিখানা সুনীতির নামে, তবু এ কাহাকে লেখা, দৃষ্টি-মাত্রেই জলদ তাহা বুঝিল। সম্পূর্ণ বাহুল্য-বর্জ্জিত উত্তর। ইহাকে রূঢ় বলা চলিতে পারে—কিন্তু মিথ্যার অপবাদ দেওয়া যায় না। জলদের ব্যথিত অন্তর বলিতে চাহিতেছিল, এমন অপ্রিয় সত্য না বলিয়া একটু মিথ্যা বলিলেই বা ক্ষতি কি হইত? এতদিন ত এই মিথ্যা খেলাতেই তাহারা ভুলিয়াছিল। জলদের যে সেখানে কিছুই পাইবার বা চাহিবার ছিল না, সে কথা সেও ত কোনদিন কোন ব্যবহারে তাহাকে বুঝিতে দেয় নাই? কর্ত্তব্যজ্ঞান যদি তাহার এতই প্রখর, তবে তাহা দু'দিন আগে প্রয়োগ করিলেও ত

চলিত। তা' হইলে সেও তাহার কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটিতে দিয়া চিরদিনের শান্তি-সুখ হারাইয়া বসিত না। অভিমান তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিলেও, তাহার বিচার-বুদ্ধি বলিতেছিল, কিরণ ভালই করিয়াছে। এই তাহার উচিত প্রাপ্য! সত্যই সে তাহার অধিকারের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিল। কিরণের উপর তাহার লোকতঃ ধর্ম্মতঃ কোন দাবীই ত ছিল না। তবে এমন প্রবলরূপে সে কেন তাহাকে ভালবাসিতে গিয়াছিল? সুধু বন্ধুত্ব? সত্যই কি তা'ই—? তাহার ত বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই। কৈ, এমন আকর্ষণ ত সে কাহারো উপর কোনদিন অনুভব করে নাই। তবে এ কি! রূপের মোহ? এ কথা মনে করিতে সে নিজের কাছেও যেন লজ্জিত হইল। সে স্বাধ্বী স্ত্রীর স্বামী—সন্তানের পিতা। নিজেও কখনো চরিত্রে কোন দুর্ব্বলতা পোষণ করে নাই। কিরণের সহিত বন্ধুত্ব যে ক্রমে তাহাকে মোহাবিষ্ট করিতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পারিলে হয়ত কখনই সে এ ব্যবহারে অগ্রসর হইত না। সে স্থির করিল, যে ভুল করিয়াছে, তাহা পুরুষের মতই এবার সংশোধন করিবে। যে অগ্নি নিবাইতেই হইবে, তাহাতে ইন্ধন যোগাইবার প্রয়োজন কি! কিরণের সকল সংস্রব সব চিন্তা ত্যাগ করিয়াই তাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে আজ উদ্যত হইল।

জলদ ভাবিয়া দেখিল, কিরণের প্রতি অজ্ঞাতে সে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে। তাহার কুমারী-হৃদয়ে না বুঝিয়া সে হয় ত অনুরাগের বীজ বপন করিয়া বসিয়াছে। অত্যন্ত অকস্মাৎ জাগ্রত মনের এ লজ্জাকর সমস্যার মীমাংসা করিতে তাহার সাহস হইল না। তবে 'এ টুকু সে বুঝিল যে, কিরণের সহসা এমন নূতন ব্যবহারের নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। হয়ত এমনি একটা কিছু আভাবে শুনিয়া বা বুঝিয়া সে তাহার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিয়া লইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে হয়ত এমন কোন কথা

উঠিয়াছিল, যাহা উঠা উচিত ছিল না। কিরণকে এমন কঠোরতার মধ্যে ফেলিবার উপলক্ষ্য হওয়ায় সে নিজেকে দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিল। কিন্তু অনুশোচনা ছাড়া অতীতের জন্য কিছুই আর তাহার করিবার নাই! দ্বিতীয়বার পত্র লিখিবার কথা সে মনেও ঠাঁই দিল না। সে বুঝিয়াছে, কিরণ তাহার সহিত সকল সম্বন্ধই ত্যাগ করিয়াছে।

সারাদিন এই একই চিন্তায় জলদের মনটা বিব্রত রহিল। কখনো কিরণের তাচ্ছীল্য-অনুভবে বেদনা, কখনো বা নিজের চিত্তের দুর্ব্বলতায় ক্রোধ জন্মিতেছিল। অথচ এ কথা আলোচনা করিবার উপায়ও ছিল না। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সুনীতিকে সে তাহার মনের সব কথা খুলিয়া বলে—বলিয়া মনের এ পাষাণ ভার লঘু করিয়া লয়। সে ক্ষমাময়ী, এখনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে। কিন্তু সে ক্ষমা করিতে পারিলেও জলদ তাহা চাহিবে কেমন করিয়া? কেমন করিয়া সে তাহাকে বলিবে—'কিরণের রূপে মজিয়া তাহাকে আমি ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলাম গো! এখন ভুল বুঝিয়াছি, অতঃপর এমন ভুল আর করিব না'! এ কথা তাহার মনের কথা হইলেও যাহাকে জানাইবে, জলদের নিজের মুখে এ কথা শুনিলে সে কি শিহরিয়া উঠিবে না? সে কি মনে করিবে না,—'ধরা পড়িয়া গিয়াছ,—সে এখন হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তা'ই এ সন্ধির প্রস্তাব'? ছি! কাল ত এ ধর্ম্ম-বুদ্ধি দেখা দেয় নাই। তবে? সে ভাবিল, কার্য্যের দ্বারাই সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

প্রতিদিন যদি কাহাকেও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিত্য দেখাটাই আমাদের অভ্যাসে দাঁড়ায়। দৈবাৎ কোনদিন যদি সেই মানুষটিকে দেখিতে না পাই, কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও দৃষ্টি অজ্ঞাতসারে যেন সেই নিত্যদৃষ্ট স্থানটিতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। অভ্যাস মনে মনে কেবলি যেন তাহাকে খুঁজিতে থাকে। কেন সে আসিল না?

না জানি তাহার কি হইল! এমনি একটা অকারণ ব্যাকুলতা মনের মাঝে ঘুরিতে থাকে। জলদের মনে হয়ত এমনি একটা অভ্যাসের ভাব জন্মিয়া গিয়াছিল,—যাহার অস্ফুট ব্যগ্রতা রহিয়া রহিয়া কিরণের সংবাদ লইবার আশায় সে বাড়ীখানার পানে তাহাকে ফিরাইয়া দিত। কিন্তু মনের সে আবদার সে রক্ষা করিত না। জানিয়া ভুলের পথে যে সে আর চলিবে না, ইহা নিশ্চিত। ক্রমে অনভ্যাসে কিরণের চিন্তা তাহার মনে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। দিনান্তে—হয়ত সব দিন—আর মনেও পড়িত না। এখন সে ক্লাবে অনেকের সহিত পরিচিত হইয়াছে। কেহ কেহ তাহার বন্ধুও হইয়াছে। অতীতকে সে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকখানি অস্পষ্ট করিয়া আনিতে পারিল।

এমন সময়ে অরুণের লেখা একখানি পুরাতন চিঠি তাহার চোখে পড়িল। পত্রে অরুণ প্রফুল্লদা'র সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিল। সে নিজে তাহার কোন সংবাদই পায় নাই, জলদ যদি জানে, তবে যেন অবিলম্বে জানায়। চিঠিখানা পড়িয়া জলদ মনে মনে লজ্জিত হইল। মনে পড়িল উহার উত্তর দেওয়াও হয় নাই! এখানে আসিয়া অভিনব বন্ধু-লাভে সে যে তাহার বহুদিনের বন্ধুদের ভুলিয়াছিল, সে কথা সে মনের কাছেও অস্বীকার করিতে পারিল না। রমণী-রূপমোহের এই বিচিত্রতায় সে বিস্মিত হইল।

সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা জলদের স্বভাব। দুঃখ বিষাদকে গভীর-ভাবে সে কখনও গ্রহণ করিতে পারিত না। কিরণের আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়াই সে মুগ্ধ হইয়াছিল। হতাশ প্রেমিকের অনুকরণে দুঃখকে বিষাদের ভাবে বুকে পুষিয়া লালন করা তাহার স্বভাবে সম্ভব হইল না। আত্মজ্ঞানীর ন্যায় নিজের দিককার ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া মনকে ধিক্কার দিয়া সে কিরণের চিন্তা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

হিমানী-সান্নিধ্যে

আলোকনাথের অযাচিত প্রস্তাবে মুক্তা ঠাকুরাণীর মনে মনে পূর্ণ সম্মতি থাকিলেও মুখে স্পষ্ট একটা উত্তর তিনি দিতে পারেন নাই। মেয়ের মাকে না জানাইয়া তিনি ত আর এত বড় একটা দায়িত্বের ভার ঘাড়ে লইতে পারেন না—ইহাই তাঁহার উত্তর।

তা' স্পষ্ট করিয়া মুখে তিনি নাই বলুন, বাড়ীর লোকেরা সকলেই জানিয়াছিল—এ বিবাহ হইবেই! এ সময় প্রফুল্ল বাড়ী আসায় আলোচনা একটু মন্দা পড়িয়াছিল মাত্র। হাঁক-ডাক থামিয়া কানাকানি চলিতেছিল। উপযুক্ত পৌত্রের বিবাহ না দিয়া, বধু-বর্ত্তমানে ছেলের দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন গৃহিণীর মনেও যেন একটু বিসদৃশ ঠেকিতেছিল, তা' ছাড়া নাতির মতি-গতির খবরও তাঁহার কিছু জানা ছিল। লোকে যাহাকে বলিবে ন্যায়, উহার চোখে তাহাই হইবে অন্যায়! লোকে যদি চলে সোজা রাস্তা দিয়া ত সে হাঁটিবে উল্টা পথে—এমনি সে অবাক-করা ছেলে। তা'ই গৃহিণীর কড়া হুকুমে নূতন আলোচনা আর মুখে মুখে তেমন ফিরিতে পারিতেছিল না।

ইহাতে হিমু একটু আশ্বস্ত হইলেও, অন্য পাঁচজনের অস্বস্তির সীমা ছিল না। স্বয়ং আলোকনাথও এ অস্বস্তির হাত এড়াইতে পারে নাই। যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভুলাইয়া দুইদিন কাছে রাখিতে পারিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না, সেই এখন যেন তাহার সুখের পথে কণ্টক হইয়াছে! হিমানীর তল্লাসে দ্বিতলের কক্ষে দৈবাৎ আসিয়া পড়ার ছলে একবার ঘুরিয়া

যাওয়াও আর চলে না। তাহার জন্য কোন নূতন উপহার পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে আর সাহস হয় না। তবু সে সোনার অঙ্গে সোনা কেমন মানায় দেখিবার ইচ্ছায় যে নূতন চুড়ি জোড়াটি কলিকাতা হইতে অনেক মূল্যে ক্রয় হইয়া আসিয়াছে, সে গুলি নিজে হাতে করিয়া তাহার হাতে দিবার সাধটুকুও আপাততঃ চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে!

মেয়েটাও আবার এমন বেয়াড়া যে বিবাহের কথা হওয়া পর্য্যন্ত সম্মুখে ত আর আসেই না, বরং ডুমুর ফুলের ন্যায় একেবারেই অদৃশ্য হইয়া থাকে! সে দিন বুক-ভরা সাধ লইয়া নিজের হাতে তোলা ফুলের রাশি উপহার দিয়া যে প্রতিদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা কোনো প্রেমিকের চিত্তেই আনন্দ দিতে পারে না।

আলোকনাথ ভাবিয়া পায় না যে, ও মনে করে কি? তাহার সহিত বিবাহে যে উহার চতুর্দ্দশ পুরুষ কৃতার্থ হইবে, এ কি ও বোঝে না? এতই বোকা! রূপের গর্ব্বে মনে করে, বোধ হয় কোন যুবরাজই বা উহার সঙ্গে মালা বদল করিতে চাহিবে! তা' গর্ব্ব করিবার রূপ বটে! সে কথা আলোকনাথ অস্বীকার করে না। তবে কিনা সংসারটা ভিন্ন রুচিতে তৈয়ারী। সুধু রূপের ত এখানে আদর নাই—সঙ্গে চাই রূপচাঁদ! নহিলে এমন রূপের ডালি মেয়েরও আবার বিবাহ হয় না? আর বিবাহ হইবেই বা কেমন করিয়া? বিধাতা যে নির্জ্জনে গড়া তাঁহার এই মানস-প্রতিমাকে ভাগ্যবান্ আলোকনাথের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন! নহিলে এই কয়দিনের দেখা-শুনাতেই এমন করিয়া সে তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিবে কেন? আর এ অতর্কিত দেখাশুনার সংযোগও কি সেই অদৃশ্য মিলন-কর্ত্তারই ইঙ্গিত নয়? নহিলে কোথায় কোন্ অজানা কুটিরে দরিদ্র-গৃহে এ মহামূল্য মণি খনিগর্ভে লুকায়িত রত্নের মত লুকানো থাকিত—আলোকনাথ তাহার বার্ত্তাও জানিতে পারিত না।

মুক্তা ঠাকুরাণী বলেন, মেয়েটি অত্যন্ত আদরে একটু বেয়াড়া হইয়া গিয়াছে। তা' হউক, আলোকনাথ ভালবাসার বশীকরণ-মন্ত্র দিয়া উহার চঞ্চল মনকে একদিন যে বাঁধিয়া ফেলিবে, এ ভরসা তাহার বিলক্ষণ আছে। এখন ভালয় ভালয় শুভ-কর্ম্মটি সম্পন্ন হইয়া গেলেই হয়। অনেক সময় প্রফুল্ল কোথায়—সে কি করিতেছে, এ খবরও সে লয়। মেয়েটার চাঁদ-পানা মুখ দেখিয়া ছেলে না আবার ভুলিয়া যায়! হায়রে, স্বার্থপর স্নেহ—মানুষের মনকে এমনই সঙ্কীর্ণ করে!

কার্য্যের অভাবে হিমুকেও এখন অনেক সময় তাহার নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষটিতেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সে যখন এ বাড়ীতে আসে, পড়িবার জন্য সে একখানি "সদালাপ, তৃতীয় ভাগ" সঙ্গে আনিয়াছিল; বইখানি অরুণ দিয়াছিল। সে বইখানিও সে লাইব্রেরী-ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছে। পাছে প্রফুল্লের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়, এই ভয়ে সেখানি আর আনা হয় না।

সকালবেলা খোলা জানালা দিয়া রোদ আসিয়া হিমুর মুখে মাথায় পড়িয়াছিল। জানালার ধারে বসিয়া হিমু অদূরে খিড়কীর পুকুরের দিকে চাহিয়াছিল। দাসীরা কেহ বাসন মাজিতে, কেহ কাপড় কাচিতে, কেহ বা চাউল ও শাক ধুইতে আসিয়াছে। হাতে কাজ, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখে গল্পও চলিতেছিল। কেহ মনিবের, কেহ রাঁধুনীর, কেহ অপর চাকরাণীর নিন্দা করিয়া সকালবেলাকার সভাটিকে বেশ সরস করিয়া তুলিয়াছিল। তীরস্থিত সজিনা গাছের পাতা অনবরত ঝরিয়া পড়িয়া জলের তিনভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন বাতাস ভিন্ন মুখে বহিতেছিল, তা'ই এপারের জলটুকু বেশ স্বচ্ছ দেখাইতেছিল। তীরে ঘাসের বিছানায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া একটা কুকুর মাঝে মাঝে জিহ্বা কম্পিত করিয়া আলস্য জ্ঞাপন করিতেছিল। গলায় দড়ি বাঁধা বাছুর দুইটি ছাড়া পাইয়া কখনো লাফাইয়া কখনো ঘাস

খাইয়া আপন-মনে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পুকুর-পাড়ের আম্‌ড়া গাছ দুইটা মুকুলের মধুর গন্ধে দিক পূর্ণ করিতে ছিল। হিমু বসিয়া এই-সব দেখিতেছিল। হঠাৎ ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছায়া পড়ায় সে ঘাড় ফিরাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হাতে 'সদালাপ' বইখানি। হিমু বিরক্ত হইল—বইখানি দিবার ছলেই প্রফুল্ল তবে তাহার সহিত যাচিয়া কথা কহিতে আসিয়াছে?

কিন্তু হিমু এখন ঠেকিয়া শিখিয়াছে। সে প্রফুল্লের সম্বন্ধে কিছু না জানিলেও এ-বাড়ীর লোকদের আর কাহারো সঙ্গে কথা কহিবে না। তা'ই মুখ ফিরাইয়া সে আবার তাহার অনভিপ্রেত দৃশ্যাবলীতেই ক্লান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

প্রফুল্ল ঘরে ঢুকিয়া বিনা ভূমিকায় একেবারেই কহিল, "তুমি হিমানী? অরুণের বোন্? ঝাল্‌দায় তোমাদের বাড়ী?"

অরুণের নাম শুনিয়া হিমু কিন্তু তাহার ঔদাসীন্য বজায় রাখিতে পারিল না। তাহার সহসা মনে হইল, এই প্রফুল্ল বাবুই অরুণদা'র সেই প্রফুল্লদা' নন্ ত? নিশ্চয়ই তা'ই! আনন্দ ও কৌতুক-পূর্ণ চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া সে কেবল ঘাড় হেলাইয়া এক কথায় তাহার সব কথার উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

প্রফুল্লের মুখ মুহূর্তে ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "এই বইখানায় অরুণের নাম দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল। অরুণ জানে—এ সব কথা? এতে তার মত আছে?"

অরুণের কোন্ বিষয় জানার কথা প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিতেছে বুঝিতে না পারিয়া হিমু বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। প্রফুল্ল একটু হাসিয়া কহিল, "অরুণ আমায় 'প্রফুল্লদা' বলে। আমায় তুমি তার মতই বিশ্বাস করতে পার।"

প্রফুল্ল হয়ত মনে করিয়াছিল, হিমু তাহার প্রশ্নে সন্দিগ্ধ হইয়া উত্তর দিতে অনিচ্ছুক। হিমু কহিল, "আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি। অরুণদা' আপনাকে খুব ভালবাসে।"

প্রফুল্ল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কাকার সঙ্গে এই বিয়েয় তোমার মত আছে ?"

হিমু জানিত, নিজের বিবাহের সম্বন্ধে কোন কথা কহা মেয়েদের পক্ষে অপরাধ—লোকে তাহাতে নির্লজ্জা বলে। তা'ছাড়া এই কয়দিনের ঘটনাবলী তাহার মনেও একটুখানি সংসার-জ্ঞান আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে ভাবিয়া দেখিল, প্রফুল্ল বাবু অরুণদা'র বন্ধু। ইনি এ বাড়ীর লোক হইলেও ইঁহাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি নাই। সে ইঁহার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছে, লজ্জা করিবে কি না—দ্বিধা-গ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া প্রফুল্ল পুনরায় কহিল, "যা বল্‌বার থাকে, আমায় তুমি অসঙ্কোচেই বল্‌তে পার। অরুণের মত আমায় তুমি তোমার বড় ভাই বলেই মনে করো।"

এমন ঢালা হুকুম পাইবার পর লজ্জার কারণ আর হিমুর মনে কি থাকিতে পারে ? সে মুক্তির আনন্দে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আমায় আপনি বাড়ী পাঠিয়ে দিন। আমি ওঁকে কখনোই বিয়ে কর্‌ব না।"

"কর্‌বে না কেন ? উনি খুব বড় মানুষ ত ! খুব সুখে রাখ্‌বেন, ঢের গহনা কাপড় খেলনা দেবেন।"

প্রফুল্লের কণ্ঠস্বরে তাহার মনের ভাব বুঝা গেল না। হিমু কহিল, "উনি হেমলতাদি'র স্বামী। আমি বড় মানুষ হতে চাই না।"

সে যে কেন আলোকনাথকে বিবাহ করিতে চায় না, এই অল্প কথাতেই তাহা এমন স্পষ্ট প্রকাশ হইল যে, প্রফুল্ল মনে মনে মেয়েটির প্রতি একটুখানি করুণ কৃতজ্ঞতা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না।

ঐশ্বর্য্যের লোভে মুগ্ধ হইয়া সে তাহার দিদি-আখ্যায়িতা নারীর প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে চাহে না, ইহা মনে হওয়ায় প্রফুল্ল খুসী হইয়া কহিল, "তা'হলে এ বিয়ে বন্ধ হওয়ায় তোমার অমত নেই ?"

হিমু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, "একটুও না।"

এইবার সত্যই তাহার লজ্জা করিতেছিল। মাগো, কেবল কেবল নিজের বিয়ের কথা কি বলা যায় ? কি কুক্ষণেই যে সে বাড়ীর বাহির হইয়াই ধোপানীর মুখ দেখিয়াছিল। দিদিমা অপ্রসন্ন মুখে তখনই 'দুর্গা নাম' স্মরণ করিয়া ছিলেন। সে কিন্তু তাহা করে নাই। সে অরুণের কাছে শুনিয়াছিল, ও সব মানুষের কুসংস্কার ! এইবার দেখা হইলে সে তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে যে লেখা-পড়া শিখিলেই শাস্ত্র শেখা হয় না ! দিদিমার মত শাস্ত্র-জ্ঞান হইতে তাহার এখনও বিশ বৎসর বিলম্ব আছে।

প্রফুল্ল কহিল, "আমি কাকাকে আগে বুঝিয়ে বলি, তিনি যদি মত বদল করেন, ভালই। না হলে"—বলিয়া সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হিমু পরবর্ত্তী উপায়টা শুনিবার জন্য উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

প্রফুল্ল কহিল, "না হলে তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। কিন্তু কি করে তা হয়, তাই আমি ভাব্‌চি। কাকা হয়ত যেতে দেবেন না।"

হিমু সিংহিনীর ন্যায় মাথা হেলাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ইস্‌, দেবেন না! কার সাধ্যি আমায় জোর করে রাখে? রাখুক দিকি। আমি ঠিক চলে যাব।"

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, "সাধ্য অনেকেরই আছে ! আচ্ছা, তুমি যদি দিদিমার সঙ্গে মেলা দেখ্‌তে যাও, আর সেখান থেকে অরুণ তোমায় বাড়ী নিয়ে যায়,—দিদিমা কি তা'হলে ভারী রাগ্‌ কর্‌বেন ?"

হিমু কহিল, "কি করে সে জান্‌তে পার্‌বে ?"

প্রফুল্ল কহিল, "আমি তাকে খবর দেব। ব্যাপার শুন্‌লে সে নিশ্চয় আস্‌বে। আচ্ছা, অরুণ কি তোমার আপন ভাই?"

হিমু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া অনিচ্ছাতেই আস্তে আস্তে কহিল, "না, মার পেটের নয়, আপনও নয়। ও কে, তা ও নিজেই জানে না। কে একজন বড়লোক ওকে জল থেকে এনে মানুষ করেছিল। হঠাৎ সে বড়লোক মারা গেলে ও দিদিমার কাছে থাক্‌লো। আপন না হলেও অরুণদা' এখন আমাদেরই।"

এ সব কথা প্রফুল্ল পূর্ব্ব হইতেই জানিত, তবু হিমুর মুখে শুনিতে চাহিল। জানিত বলিয়াই অরুণের কাছে সে নিজের বাড়ীর কথা তেমন করিয়া কিছুই কখন বলিত না। অরুণেরই ঐশ্বর্য্যে যে তাহারা রাজভোগে থাকিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে, এই ভাবের প্রেরণাতেই সে অরুণের নিকট নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিত। আশা ছিল, সুদূর ভবিষ্যতে সে তাহাদের এই অন্যায় আচরণের প্রায়শ্চিত্তও একদিন করিবে। কিন্তু এখন তাহার ভাগ্যলিপি বদল হইয়া গিয়াছে। কাকা যখন বিবাহের সখে মাতিয়াছেন, তখন ইহাকে না পা'ন, অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন, নিশ্চয়। এ সংসারের নিকট তাহার আর কোন মূল্যই নাই। সে এখানে এখন অনাবশ্যক ভার মাত্র! তাহাতে ক্ষতি অবশ্য তাহার কিছুই নাই। কেবল এই শয্যাশায়িনী খুড়ীমার মরণ পর্য্যন্তই তাহার এখানকার বাঁধন! তা'র পর সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। হাঁ, আরও এক জায়গায় কিছু কর্ত্তব্য তাহার আছে বটে। সে তাহার মা। যে মাকে সে কোনদিনই বোঝে নাই,—এবং তিনিও তাহাকে বুঝিতে চাহেন নাই। হয়ত, ক্রটিটা তাহার তরফেই অধিক হইয়া থাকিবে। নহিলে, কুপুত্র হইলেও কুমাতা ত কখনো হয় না। হতভাগ্য সে-ই তবে সে অমূল্য মাতৃ-স্নেহে চিরবঞ্চিত রহিয়া গেল কেন?

অতি শৈশবে কাকা যখন তাহাকে মাতৃক্রোড়-চ্যুত করিয়া লইয়া আসে, তখন অবশ্য এই আশা করিয়াই আনিয়াছিল যে সন্তান-বাৎসল্য সকল অভিমানের উপরে জয় লাভ করিবে। কিন্তু সেটা কাকা ভুল করিয়াছিল। মা সন্তান ছাড়িলেন—তবু সংকল্প ছাড়িলেন না। তা'র পর অদ্ভুত ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে আলোকনাথ যখন রাজ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইল, তখনও প্রফুল্ল তাহার মাকে ভুলিয়া যায় নাই! বরং সেবার প্রফুল্লই নায়েব ও দাসদাসী সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিল। তখনও মা আসিলেন না। দিদিমা তখন মরিয়া গিয়াছেন। মামা রাজদ্রোহ-অপরাধে অননুভূত নির্য্যাতনে মরণাধিক শোচনীয় অবস্থায় জেলখানা হইতে মুক্তি পাইয়া বাড়ী আসিয়াছেন। নিম্নাঙ্গ তাঁহার পক্ষাঘাত-গ্রস্তের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছিল। মা সেই অর্দ্ধমৃত ভাইয়ের সেবাতেই শরীর-মন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তা'ই ছেলের ডাক্ তাঁহার কানে পৌঁছাইল না। প্রফুল্ল মামাকে বাড়ী লইয়া গিয়া ভাল রকম চিকিৎসা করাইতে চাহিল। মা তাহা অস্বীকার করিলেন। যদি সমানে সমানে কুটুম্বিতা হইত—তবে ইহা অনায়াসে চলিতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। তাঁহার জীবন্মৃত ভাইকে তিনি ধনী আত্মীয়ের উপহাসের লক্ষ্য হইতে দিতে পারেন না। নায়েব অনেক বুঝাইল। প্রফুল্ল রাগ করিল, চোখের জল ফেলিল—ফলে কিন্তু কিছুই হইল না। ঘোর অভিমানে প্রফুল্ল মনে করিল, মা তাহাকে কোনদিনই ভাল বাসেন নাই। দুইদিন কাছে থাকিয়া যাইবার জন্য মার করুণ অনুরোধও সে তা'ই উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

ইহার পর সে তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া লইল। লেখাপড়ায় প্রবল অনুরাগ থাকায় পূর্ব্বেও সে তাহা করিত। এখন ইহাকেই সে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া লইল। সময় সময় বিপন্নের

ডাকও তাহার কাণে পৌঁছিত। সে নিজে দুঃখী, তা'ই দুঃখীর প্রতি তাহার সমবেদনা জন্মিত। স্থান-কাল-অবস্থা সব ভুলিয়া সে তা'ই দশের কাজে নিজেকে সঁপিয়া দিত। এ লইয়া আলোকনাথের সহিত কতদিন মনান্তর হইয়াছে, হেমলতা কান্নাকাটি করিয়াছে, ঠাকু'মা' নিজ মৃত-মুখ দর্শনের ভয় দেখাইয়া দিব্য দিয়াছেন তবু তাহাকে কেহ কোনদিন ফিরাইতে পারে নাই। আজও তাহার বিবেক যখন বলিল, হিমুকে বিবাহ করা কাকার অন্যায়, তখন সারা অন্তঃকরণ দিয়াই সে তাহার মনের যুক্তির অনুমোদন করিল! বিশেষতঃ এই হিমু—এ তাহার বন্ধুর আত্মীয়া। তাহার অজ্ঞাতেই এ বিবাহ ঘটিতেছিল! এ বিবাহ কখনোই সে হইতে দিবে না।

প্রফুল্ল স্থির করিল, মালতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে তাঁহাকে এ সংকল্প হইতে নিরৃত্ত করিবে। মেয়ের বিয়ে হয় না, এ আবার একটা কথা না কি? মানুষ এখন মনুষ্যত্বের দিক্ হইতে সাড়া দিতে শিখিয়াছে। দেশের জন্য লোকে হাসি-মুখে কত মহৎ দুঃখ বরণ করিয়া লইতেছে, এও ত সেই দেশেরই কাজ, মায়েরই সেবা! গরীবের অপরূপ রূপসী কন্যাকে বিনা-পণে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করা, এ কি এমনই ভয়ঙ্কর স্বার্থত্যাগের বিষয়? বিবাহের জন্য ভাবনা নাই। সে ভার প্রফুল্ল লইবে। এখন উঁহাদের মতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে হয়! খুড়ীমার স্থান—তা'ও আবার হিমুকে দিয়া দখল করাইতে, সে কিছুতেই দিবে না। ইহাতে কাকা রুষ্ট হ'ন্, হইবেন। কর্ত্তব্য-পালনে সে ত কখনও ভয় পায় নাই—আজও পাইবে না। কাকার বিরুদ্ধাচরণ করা অবশ্য তাহার অনুচিত। তা'ই সে স্থির করিল, প্রথমে তাঁহাকে এ সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার সে চেষ্টা করিবে। উচিত কথা ত তিনিও কাহারও মুখে শুনিতে পান না? যত সব স্তাবকের দল! প্রফুল্লের অনুরোধে অন্ততঃ কাকিমার বাঁচিয়া থাকা পর্য্যন্ত ত কথাটা রাখিতে পারিবেন।

ঊনত্রিংশ-পরিচ্ছেদ

খুড়া-ভাইপো

দুপুর বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া সদর ও অন্দরের মাঝখানে একখানা সুসজ্জিত ঘরে খাটের বিছানায় তাকিয়ায় অর্দ্ধ হেলান দিয়া শুইয়া আলোকনাথ রূপার গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিল। ঘুম ছাড়িয়া গেলেও তন্দ্রার ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। অর্দ্ধমুদিত চোখের কাছে হিমুর পুষ্পিত-যৌবন দেহ ও ঢল-ঢল মুখখানিই ভাসিতেছিল। এখন নিভৃত অবসরে সেই মুখখানির ধ্যান করাই আলোকনাথের কাজ হইয়াছিল। সেই রূপাধিকারিণী কবে যে তাহার পার্শ্ব-সঙ্গিনী হইয়া পরমানন্দ দান করিবে, কল্পনায় তাহাই অনুধাবন করা তাহার এখন প্রধান সুখের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। পায়ের শব্দ করিয়া প্রফুল্ল আসিয়া ঘরে ঢুকিলে আলোকনাথের আনন্দ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানায় যথেষ্ট স্থান থাকিলেও সে ঘরের কোন হইতে একখানা চৌকি টানিয়া আনিয়া কাকার কাছে বসিল। এ ব্যবহার নূতন। আলোকনাথ লক্ষ্য করিলেও কথা কহিল না।

দুইজনের মনেই মেঘ জমিয়াছিল। কথা কহিবার মত কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই কাটিয়া গেল। প্রফুল্লের বলিবার কথা এত অধিক ছিল যে তাহার চাপে সে সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আলোকনাথের বলার কথা কিছুই ছিল না। যা' ছিল—সে ত সেই প্রথম সাক্ষাতে কুশল প্রশ্নেই ফুরাইয়া গিয়াছে। নূতন আর কি আছে? হাঁ, একটা ছিল,—"কবে যাচ্চ?" এই প্রশ্নটাই এখন প্রধান। আপদ বিদায় হইলেই বাঁচা যায়!

ইতস্ততঃ-ভাবটা কাটাইয়া প্রফুল্লই প্রথমে কথা কহিল। সে বলিল, 'কাকিমার জ্বর ত দেখ্‌চি আর বন্ধই হয় না। আনুসঙ্গিক উপদ্রব সমস্তই ত রয়েচে। বরং গতবারে যা দেখে গেছি, তার চেয়ে বেড়েচি। এখন উঠে বস্‌তে-টস্‌তেও পারেন না।"

আলোকনাথ মুখের নল না সরাইয়া অনাগ্রহভাবে কহিল, "হুঁ।"

"কিন্তু তার জন্যে কোন ব্যবস্থাই ত হয়নি। কবিরাজী ওষুধ উনি আর খাচ্ছেন না। কবিরাজ মশায় বল্লেন, হাত-টাতও দেখান না। উপকার না হলে—অনেক দিন ভুগ্‌লে রোগী অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, তা বলে বাড়ীর লোক হাল-ছাড়া হলে ত চলে না। আমার মনে হয়, একবার কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে ওঁকে ভাল করে দেখানো উচিত!"

"উচিত, তা কর না বাপু। কেউ ত বারণ করে রাখেনি, আমায় ওসবের ভেতর জড়িও না শুধু। বারোমাস রোগ আর রোগ—ক্ষেপিয়ে তুলেচে যেন! দু-দিন সরে গেলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়" বলিয়া আলোকনাথ গড়গড়ার নলটা ফেলিয়া দিয়া অপ্রসন্ন মুখে ডাকিল, "রেধো, এই বেটা রেধো।"

"আজ্ঞে যাই" বলিয়া বাবুর খাস-খানসামা রাধানাথ সজ্জিত কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ঘরে ঢুকিয়া কলিকা বদ্‌লাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে আলোকনাথ পুনরায় গড়গড়ার নল মুখে তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে টানিতে লাগিল।

প্রফুল্ল বিপদে পড়িল। খুড়ীমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের মীমাংসার পরিণাম তাঁহার রোগোপনোদনের ভেষজ হইবে কি না, কে জানে! হয়ত এই সুযোগে গৃহকর্ত্রীর শূন্য স্থান পূর্ণ হইয়া এই বিদায়ই গৃহলক্ষ্মীর চিরবিদায়ের আয়োজনে দাঁড়াইবে। বিজয়ার পূর্ব্বেই বিসর্জ্জনের পালা সাঙ্গ হইবে। আর ঘটনার উপলক্ষ হইবে—সে নিজে। না, এ ব্যবস্থায় সে এখন আর সম্মতি দিতে পারে না। সে শান্তভাবে কহিল, "এখনই ত ওঁকে নিয়ে

যেতে পারা যাচ্চে না। তার আগে একবার কোন বড় ডাক্তারকে আনিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। যাতে যাবার কষ্ট সহ্য করতে পারেন, তাই আগে করা চাই। হরিশ আজই যাক্, ডাক্তার সান্ন্যালের কাছে। তিনি যাঁকে বল্‌বেন, তাঁকে নিয়ে আস্‌বে।"

আলোকনাথের ললাট ও ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, এ আবার এক গ্রহ জুটিল। যে মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে শান্তিতে মরিতে দাও,—তা না—কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাও! পয়সার শ্রাদ্ধ করাও! তা'র পর সত্যই যদি বাঁচিয়া উঠে, তখন? তাহার ঝক্কি সামলাবে কে রে বাপু? তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

আলোকনাথের মনে পড়িল না যে অভাগিনী রুগ্নার নিকট একদিন তাহারাও কত পাইয়াছে! মা ছাড়া প্রফুল্ল অকৃত্রিম মাতৃ-স্নেহই সেখানে পাইয়াছে,—সে অনুপাতে কি-ই বা সে দিয়াছে বা করিয়াছে! আর সে নিজে? কিছুই কি পায় নাই? দুঃখের দিনের সঙ্গিনী,—সেবা-যত্ন, প্রাণঢালা-ভালবাসা দিয়া সে কি আলোকনাথকেও দেবতার মত পূজা করে নাই? রোগে পড়িয়া এখনও সে কি তাহারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান কল্পে মনোযোগী হইয়া নাই? তরুণ জীবনে বসন্তের নবপল্লব মণ্ডিত যে মুঞ্জরিত লতাটি সুগন্ধে সৌন্দর্য্যে তাহাকে পুলকিত পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, আজ সে শীত-শীর্ণ মরণাতুর, তবু তা'র মধুর স্মৃতি-টুকুও কি আর মনে স্থান দেওয়া চলে না? জীর্ণ লতা এখনও যে সেই দাবী রাখিয়াই বাঁচিয়া আছে! এ আশ্রয় হইতে চ্যুত হইলে সে আর বাঁচিবে কি লইয়া? এ প্রশ্ন আলোকনাথের মনে উঠিল না! বুঝি, এমন অবস্থায় কাহারও তা' উঠে না।

আলোকনাথ বিরক্ত স্বরে কহিল, "অনর্থক ফের কতক গুলো পয়সা জলে ফেলা বৈ ত নয়। সে সব চেষ্টাও ত গোড়ায় গোড়ায় ঢের করা

গেছে। আর কেন বাপু? এখন ওর পরকালে কিছু সুবিধে হয়, এমন কিছু করাতে হয়ত করিয়ে দাও! আস্‌চে জন্মে আর এমন করে না ভুগে মরে!”

কথাগুলি রূঢ়! তবু শেষের দিকটায় যেন একটু স্নেহের উচ্ছ্বাসে আর্দ্র হইয়া বাহির হইল।

কাকার কথায় প্রফুল্ল ক্ষুব্ধ হইলেও আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, “সে সব যা করতে হয়, আপনারা করাবেন। আমি এখনই হরিশকে চুণী ডাক্তারের কাছে পাঠাচ্চি। তা’ছাড়া আর একটা কথা আমার বল্‌বার আছে।”

আলোকনাথ অসহিষ্ণুভাবে কহিল, “যা বল্‌বার থাকে, চটপট বলে ফেল! কেনই যে বলা, তা তুমিও জান। কর্ত্তা ত দেখ্‌চি তুমি। তোমার ইচ্ছাতেই যখন কাজ, তখন অনুমতি চেয়ে অনর্থক আমার অপমান না করলেই ভাল হয় না? দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করো,—ডাক্তার বলেচে, ও রোগ সারবার নয়।”

প্রফুল্ল উঠিয়া আলোকনাথের পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিল, “আমায় মাপ্ করুন, কাকা। আমি বড় অবাধ্য। কিন্তু এটায় আমায় অনুমতি দিন আপনি, নৈলে আমি যে শান্তি পাচ্চি না। সত্যি আমারই ত ত্রুটি। আমি ত এতদিন তেমন করে মন দিই নি—সেবা করিনি—কিছুই না। আপনার তরফ থেকে অনেক হতে পারে। আমার ত কিছুই হয় নি।”

আলোকনাথ কথা কহিল না, তাম্রকূট-সেবনে মনোযোগী হইল। প্রফুল্লের কথায় তাহার মনের মধ্যে হয়ত ক্ষনিক একটা দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহাকে কাছে টানিয়া দুইটা মিষ্ট কথা বলে, কিন্তু কিছুই বলা হইল না। মনে পড়িল, উহার আরও একটা দাবী মত জুএবং এখনই তাহা শুনিতে হইবে। আর সে দাবীটা খুব সম্ভব

তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চিন্তার ফল নয়—প্রফুল্লেরই স্বার্থরক্ষার অর্গল। এই কথাটা মনে উঠিবামাত্র স্বার্থপর আলোকনাথের মনের ক্ষণিক দুর্ব্বলতাটুকু দূর হইয়া গেল। মনে হইল, সংসারে স্বার্থপর কে নয়? এই যে উচ্চ-শিক্ষিত প্রফুল্ল! দেশবন্ধু প্রফুল্ল! পরোপকারী স্বার্থত্যাগী প্রফুল্ল! যাহার প্রশংসা-বাণী সাধারণের মত একদিন তাহাকেও মুগ্ধ করিয়াছে, পুলকিত করিয়াছে—সেও কি অপর সাধারণের মত স্বার্থ-রক্ষায় ব্যাকুল নয়? এই যে খুড়ীর জন্য এত উদ্বেগ, এত ঐকান্তিক যত্ন, এ-সব এতদিন ছিল কোথায়? ছেলে দেশোদ্ধার করিয়া, গ্রামে গ্রামে তাঁত বসাইয়া, চরকা চালাইয়া প্রচার-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। তা'ই ঘরের খবর লইবার তাহার অবসর হয় নাই! স্বীকার করি, রোগের বাড়াবাড়ির খবরটা সে পূর্ব্বে জানিত না। কিন্তু জানিতেই বা মানা করিয়াছিল কে? জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না কি? দেশের খবর রাখিতে পার, আর ঘরের খবর রাখিতে পার না, বাপু? ও-সব চালাকি! এবার স্বার্থে ঘা লাগিতে চলিয়াছে। তা'ই মরা গাছে জল ঢালিবার এত আয়োজন হইতেছে। যাহাকে যমে লইবে, তাহাকে কি মানুষ বাঁচাইতে পারে? পাগল! আলোকনাথও মানুষ। প্রফুল্লের ন্যায় হৃদয় জিনিষটা তাহারও বর্ত্তমান। কৃপণও সে নয়। তাহার ত আর বাপ-পিতামহের উপার্জ্জনের কড়ি নয় যে 'পথ্য' দিবার ব্যবস্থা করিবে। পয়সা খরচ করিতে সেও জানে। জমিদার-গৃহিণীর অবশ্য-প্রাপ্য চিকিৎসা-সেবা কিছুরই ত্রুটি এখানে হয় নাই। বরাতে তাহার সুখভোগ নাই, লোকে তাহার করিবে কি? কে তাহাকে মরণে সাধিয়াছিল? তবু ভাগ্যবানের হাতে পড়িয়াছিল বলিয়া মরণ-শয্যাটাও রাণীর মত ঘটিয়াছে। তবে আবার চোখ রাঙ্গাইতে আইস, কিসের জন্য বাপু? আসল কথা—ঐ রক্ষা-কবচ গলায় ঝুলাইয়া আত্মরক্ষা করা। সে আর হয় না গো—শ্মশান-যাত্রীর পথ তাকাইয়া সে তাহার বাকী জীবনটা আর ব্যর্থ

হইতে দিবে না। স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বকালে ছিল বটে—কিন্তু স্ত্রীর চিতায় স্বামীর পুড়িবার ব্যবস্থা কোন কালের কোন শাস্ত্রই দেয় নাই!

খুড়ার চিন্তাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া প্রফুল্ল দ্বিতীয় আবেদন নিবেদন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অথচ সেটাই যে উপস্থিত প্রয়োজন। বিলম্ব করিলেও চলিবে না। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর দ্বিধা কাটাইয়া সে কহিল, "আমি শুনছিলুম, আপনি আবার—আবার নাকি বিয়ে করবেন! এ কথাটা কি সত্যি?"

আলোকনাথ বারকতক জোরে জোরে তামাকের ধোঁয়া টানিয়া তাহা ছাড়িয়া দিয়া অন্য দিকে চাহিয়া দ্রুত উচ্চারণে কহিল, "সত্যি হ'লে বোধ হয় অদ্ভুত কাণ্ড কিছু হবে না! আমার ছেলে নেই, মা যখন ধরেচেন, তখন তাঁর ওপরও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত?"

প্রফুল্ল ক্ষুব্ধভাবে কহিল, "কাকীমার শরীরের এই অবস্থার উপর এটা খুব সাংঘাতিক আঘাত হবে না কি?"

আলোকনাথ উদাসীনভাবে কহিল, "বল্‌তে পারি না। মেয়েদের হিংসে শুনেচি—খুব। হ'তেও পারে।"

প্রফুল্ল কহিল, "আমায় কিছুদিন যত্ন-চিকিৎসার ভার নিয়ে দেখ্‌তে দিন। যদি না সারে, তখন—" তখন যে কি হইতে পারে, প্রফুল্ল তাহা কতক লজ্জায়, কতক ক্ষোভে ঠোঁটের বাহির করিতে পারিল না।

আলোকনাথ ক্রুদ্ধ ক্রূর দৃষ্টিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিষাদ-মণ্ডিত মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "ডাক্তার বলেচে, এ রোগ কখনই সারবে না। হ'তে পারে, দু'বছর পরে যাবে,—হ'তে পারে, দু দিনেও তা ঘট্‌তে পারে। হঠাৎ হার্ট ফেল্ করেও যেতে পারে। এখনও কি বল্‌বে, ঐ মৃত্যুকে আঁক্‌ড়ে আমায় চিরদিন বসে থাক্‌তে হবে? আমার দিক্‌টা দেখ্‌চ কি?"

প্রফুল্ল জানিত, খুড়ীমা শয্যা লইবার পর—না কাকা, না সে, কেহই তাহারা তাঁহাকে আঁকড়িয়া বসিয়া নাই ; এবং তাঁহার অভাবে কাকার কোন সখ, কোন আমোদ-প্রমোদও এ পর্য্যন্ত বন্ধ হয় নাই। বরং রুগ্না কর্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব না ফুরাইতেই এ ঘটনাটি এখন অবাধ আনন্দলাভের সুযোগেই দাঁড়াইয়াছিল। তবু সম্বন্ধের গুরুত্ব মনে রাখিয়া সে নম্র-কণ্ঠে কহিল, "তা'হলে এখন ও-সব হাঙ্গাম বন্ধ রাখাই ভাল নয় কি ? তাতে যদি দুবছরটা—আমরা দু'দিনেই ডেকে আনি ?" উদ্বেগে ও আশঙ্কায় তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। এই মাত্র ঐ পাষাণ পুরুষের কণ্ঠোচ্চারিত যে নিষ্ঠুর মন্তব্য ডাক্তারের বাণী-রূপে সে প্রাপ্ত হইল, তাহার কঠোরতা সে তখন সারা মনে-প্রাণে অনুভব করিতেছিল। ইহার পরেও মানুষ যে এমন করিয়া কাহারও সম্বন্ধে অবিচার করিতে পারে, এ যেন সে ধারণাই করিতে পারিতেছিল না। তাহার তরুণ হৃদয় সেই একমাত্র পরম স্নেহশালিনী, অসাধারণ ধৈর্য্যময়ী নারীর চরম দুর্গতির কল্পনাতেও শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে পুনরায় কহিল, "না না—এ আমি কখনই হ'তে দোব না—তিনি বেঁচে থাক্‌তে তাঁর জায়গায় আর কেউ এসে বস্‌তে পাবে না—কিছুতেই না।"

আলোকনাথের মুখে ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল। ক্রোধ-কম্পিতস্বরে সে কহিল, "কেন বল দেখি ? এত জোর খাটাবার সত্যি অধিকার তোমার কি কিছু আছে এখানে ? স্বার্থে ঘা পড়্‌চে বলে জ্ঞান হারিও না। তুমি যেমনই হও, আমি উচিত-কর্ত্তব্যই কর্‌ব। ভবিষ্যতে জমিদার হতে না পাও—ভাতের ব্যবস্থা তোমার থাক্‌বে—ভয় নেই। হিংসেতে তুমি যে মেয়েদেরও ছাড়ালে, দেখ্‌চি ?"

প্রফুল্ল উদ্বেগ-বর্জ্জিত শান্তমুখে কহিল, "না কাকা, জমিদারী হারাবার ভয় আমি একটুও করি না। কারণ আপনার কৃপায় দরকার হ'লেই টাকা হাতে আসায় ও ভাবনাটা শিখ্‌তেও পারিনি। আজ যখন মনে করিয়ে'

দিলেন, আর আপনার মনেও যখন এটা উঠেচে, তখন বল্‌ছি, আপনার জমিদারী, সম্পত্তি, অর্থ, যা-কিছু—আমি যদি তার কণামাত্রও কখনো গ্রহণ করি, তবে যেন মাতৃঘাতীর দেশদ্রোহীর মহাপাতকে পাতকী হই! এর বাড়া বড় শপথ আমি আর কিছু জানি না।"

আলোকনাথ এক সময় প্রফুল্লকে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। ঐশ্বর্য্যের সহিত রুচি পরিবর্ত্তনে খুড়া ভাইপোয় বছর কয়েক হইতেই খিটিমিটি, মতভেদ প্রায়ই উপস্থিত হইত। তবু স্ত্রীর উপর তাহার যে বিদ্বেষের ভাব জন্মিয়াছিল, প্রফুল্লের উপর তেমন কোন বিদ্বেষ-ভাব তাহার ছিল না। নবপ্রণয়ের রঙ্গিন চিন্তার বাধা-স্বরূপ সে যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মনে করিয়াছিল—অর্থের প্রলোভনে তাহাকে ভুলানো চলিবে। ধর্ম্মতঃ উহার প্রাপ্য ত কিছুই নাই! ছেলেও শিক্ষিত! অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা সে অবশ্যই মানিয়া লইবে। সত্যই ত তাহার ফুলুকে সে কিছু আর অন্ন-কষ্ট দিতে পারিবে না?

দু'একখানা ছোট-খাট তালুক বরং লিখিয়া দিলেই চলিবে। ইহাতে পাকা খেলোয়াড়ের মত 'বোড়ের চাল'ও চালা হইবে। চাই কি, ভবিষ্যতে তাহার নাবালক পুত্রদের বিষয়-সম্পত্তি প্রফুল্লই দেখিতে শুনিতে পারিবে। ছোঁড়া আর যা'ই হ'উক, মিথ্যা বা চুরি উহার দ্বারা কখনো সম্ভব হইবে না—এটুকু চরিত্রাভিজ্ঞতা তাহার জন্মিয়াছে। ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ একটা মানসিক দলিল লিখিয়া রাখিয়া আলোকনাথ প্রফুল্লের সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্তই হইয়াছিল। কিন্তু আজ অতর্কিতভাবে প্রফুল্লের মুখে এই অনাবশ্যক গর্ব্বিত ত্যাগের মন্ত্র তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বুকে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতের দোলা দিয়া শরীরটাকেও আমূল নাড়া দিয়া দিল। ঐ গর্ব্বিত, অবাধ্য, দুর্ব্বিনীত যুবা এই মাত্র যে কঠিন শপথ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইল, তাহাকে কিছুতে কোনমতেই যে আর কেহ

তাহার গন্তব্য পথ হইতে ফিরাইতে পারিবে—সে সম্ভাবনা মোটেই নাই!

আলোকনাথ ইহা ভালই জানে! বাঘকে পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া তাহার সম্মুখে প্রচুর আমিষ খাদ্য রাখিয়া যদি তাহা স্পর্শ করিতে না দেওয়া হয়, তাহাতে সে যেমন ভীষণ হইয়া উঠে—আলোকনাথও ক্রোধে, নিরুপায় ক্ষোভে, ঈর্ষায় জ্বলিয়া তেমনি ভীষণ হইয়া উঠিল। তাহার মুখে তখনও তেমনি ক্রূর হাসি। চোখে তখনও তেমনি ঈর্ষার তীব্র জ্বালা! কণ্ঠস্বরে সে জ্বালা ঢালিয়া দিয়া সে কহিল, "তুমি মস্ত লোক, বিষয়ের লোভ তুমি কর না! তবে সত্যিটা কি, বল্‌বে কি? আমার চোখের দিকে চেয়ে সত্যি বল্‌বার সাহস যদি থাকে,—তোমার মনের কথা?"

প্রফুল্লের দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য বিপন্ন ও বিমূঢ়ের মত দেখাইল। খুড়ীমার স্বার্থ রক্ষা ছাড়া আর কি অভিযোগ তাহার আছে বা থাকিতে পারে? হাঁ, আছে বই কি, এখনই সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? সেই যে একটি নিরপরাধিনী রক্ষক-হীনা বালিকাকে সে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে, তাহার কথা সে ত ভুলিয়াই বসিয়া আছে! এই যে কাকার সহিত অপ্রিয় আলোচনা, ইহার মূলে সেই—কি না? তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই না সে কাকার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিল! হিমানীর অনিন্দিত মূর্ত্তিখানি মনে পড়ায় প্রফুল্লের মুখে একটা কোমল মাধুর্য্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল। শুধু মরণ-প্রার্থিনীর জন্যই নয়—জীবনমাধুর্য্যে পরিপূর্ণাঙ্গী তরুণীর জন্যও সে আজ বিচার-প্রার্থী! এইমাত্র ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার যে পাথেয় সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিল, তাহাতে সুধু বিসর্জ্জনের বাদ্য নয়—আগমনীর সুরও তাহার অজ্ঞাতে বাজিয়াছে! আজ সে রিক্ত হয় নাই, ধন্য হইয়াছে!

প্রফুল্লের মুখে যে মেঘ ও রৌদ্রের দ্রুত নর্ত্তন-লীলা ঘটিয়া গেল, তাহা চতুর আলোকনাথের হিংসা-কুটিল দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। তাহার মনে

হইল, এইবার ঠিক রাস্তা সে ধরিতে পারিয়াছে। আঁতে ঘা লাগিয়াছে, তা'ই বাছাধন একেবারে অ-বোল হইয়া গিয়াছে! মুখে ত কই আর সে খই ফুটিতেছে না? আলোকনাথ ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "কৈ, জবাব দাও! ভারী যে সত্যি কথার গুমর কর! আজ সত্যি বল দেখি, পরোপকার পরম ধর্ম্মটা ছেড়ে দিয়ে বাকী যেটুকু নিছক সত্যি সেই মনের কথাটি বল ত—বাপু!"

কাকার অতর্কিত অদ্ভুত প্রশ্নে প্রফুল্ল প্রথমটা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত 'খেইহারা' হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু আবার তাহারই চোখের ঈর্ষা-বিদ্রূপভরা কুটিল ক্রূর দৃষ্টি ও শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠস্বরে আত্মস্থ হইয়া নিজের উত্তর সে সহজেই খুঁজিয়া পাইল। নিজ অচঞ্চল চোখের দৃষ্টি আলোকনাথের চোখের উপর স্থির রাখিয়া, মৃদু অকম্পিত-কণ্ঠে সে কহিল, "আপনি যাঁকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলেন তিনি আমার নমস্যা। আমার বন্ধুর বোন্ তিনি, তবু আমি বল্‌চি, হিমু আমার মা! আর সেই জন্যেই অরুণের অমতে তাঁর বিয়ে হবে না। অরুণের বিষয় আমরা ভোগ কচ্চি, কিন্তু তার বেশী অন্যায় আর ঘট্‌তে দেওয়া হ'তে পারে না!"

আলোকনাথের ক্রুদ্ধ ঈর্ষা-কাতর দৃষ্টি সহসা লজ্জানত হইয়া পড়িল। বিস্ময় তাহার মনে—সীমা ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। মনে হইল, মানুষ কখনো এত উদার, এমন ত্যাগী হইতে পারে? এমন অপ্সরীতেও মুগ্ধ না হইয়া বিচার করিয়া চলিতে শেখে? ইহাকেই না তাহারা কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে? তবে ইহার মনের কোন খবর জানিতে পারে নাই কেন? মানুষ এই জন্যই ঘরের ঠাকুর ফেলিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হয় রে! ফুলু-যে সেই ছেলে-বেলার সেই ফুলুই আছে, তাহার নিজের চোখে হিংসার আগুন জ্বলিয়া ছিল বলিয়াই প্রফুল্লের সত্য মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল? কিন্তু এখন এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে তবে করিবে কি?

ছেলে যে দর্প করিয়া সকল তাতেই জিতিয়া যাইবে, আর সে সেই অপমানের বোঝা অবনত-মাথায় তুলিয়া লইবে, এও কিছু উচিত বা সম্ভব নয়! চিন্তিতভাবে আলোকনাথ মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিল। দূরে সাদা চূণকাম-করা কাছারি-বাড়ীর ছাদের আলিসার উপর দুইটি সাদা পায়রা পরস্পরের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদেরই অনতিদূরে কয়েকটি কালো পায়রা যেন সাদা-কালোর পার্থক্য রাখিয়া চুপ চাপ বসিয়াছিল। মুখ না ফিরাইয়া উদাসীন অনাগ্রহের ভাবে সে কহিল, "সেই চেষ্টাই করে দেখ তবে।"

প্রফুল্ল আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "না—সে ভার আপনার উপরই রইল। আপনিই তাকে মুক্তি দেবেন। সে আমার বন্ধুর বোন্, আপনার অতিথি। আমার এখানকার সব কাজই ফুরিয়ে গেছে" বলিয়া সে অর্দ্ধ-নতভাবে আল্‌গোছে আলোকনাথকে একটা প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

আলোকনাথের গড়গড়ার নল অনেকক্ষণ হস্তচ্যুত হইয়াছিল—এবং কলিকার আগুনও নিবিয়া গিয়াছিল। এইবার অবকাশ পাইয়া কলিকার অবস্থা পরীক্ষান্তে অবসন্ন-ভাবে তাকিয়ার উপর হেলিয়া পড়িয়া বিরক্তির সুরে সে ডাকিল, "রেধো, এই বেটা রেধো—"

"আজ্ঞে কর্ত্তা, যাই" বলিয়া উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই রাধাচরণ নিঃশব্দে আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাহু-মুক্তি

সূর্য্য এই খানিক আগে অস্ত গিয়াছে। এখনও তা'র রাঙ্গা আলো খানিকটা নীল আকাশের গায়ে দূরস্থিত অগ্নিদাহের ম্লান আলোক-শিখার মত ছড়াইয়া ছিল। নিম ও নারিকেল গাছের শাখার ফাঁকে ফাঁকে পাতার আড়াল এড়াইয়া তাহার রঙ্গের খেলা দেখা যাইতেছিল। ছাদে দাঁড়াইয়া হিমু উদাস-দৃষ্টিতে কখনও বা সেই পাতার অনুজ্জ্বল মনমোহন আলোর দিকে, কখনও তাহার বিপরীত দিকের ধূসর আকাশে চাহিয়া দুইখানা উড্ডীয়মান ঘুড়ির লড়াই দেখিতেছিল। তাহার দেশের কথা, মার কথা, খেলার সাথীদের কথা, বড় বড় তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঢাকা সরল-গতি অপরিসর পল্লীপথ, রাখাল বালকদের মাঠে মাঠে গোচারণ, সন্ধ্যায় তাহাদের ঘরে ফেরা হইতে থলি-কাঁধে ডাক্-হরকরার ঝম্ঝম্ শব্দে ছুটিয়া চলার শব্দটি অবধি তা'র মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। সেখানকার অসংস্কৃত অপরিসর পথ, অধিকাংশ মাটীর বাড়ী, জঙ্গলাকীর্ণ স্থান—সবই আজ তাহার চোখে নূতন রঙ্গে ফুটিতেছিল। সকালে সন্ধ্যায় এখানেও গাছে গাছে পাখী ডাকে। বরং আলোকনাথের পাখীশালায় কত রঙ্গের, কত রকমই না পাখীর ডাক শুনা যায়,—তবু সেখানকার তেঁতুল গাছের ডালে বসিয়া, ভোরের পাখী যেমন মধুর সুরে ডাকিয়া প্রতিদিন তাহার ঘুম ভাঙ্গাইত—সালিক, টুন্টুনি, চড়ুই যেমন গান করিয়া তাহার মন ভুলাইত, এখানকার এই এত পাখীর কণ্ঠে তেমন সুর কোথায়? হিমুর মনে হইতেছিল, সে যদি দৈববলে পাখী হইয়া এখনি উড়িয়া গিয়া তাহাদের

উঠানের সেই আমড়া-গাছটির উপর বসিতে পারিত! সেখানে বসিয়া সে তাহার মাকে দেখিতে পাইত! মা আজ সেখানে একা! কেহ মার সঙ্গী নাই। নিজের জন্য নিয়মিত রান্না-খাওয়াও করেন কি না, কে জানে! আচ্ছা, মা এখন কি করিতেছেন? চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়া তাহারই মত ঐ আকাশটার দিকেই চাহিয়া আছেন কি? মা এখন নিশ্চয় তাহারই কথা ভাবিতেছেন। মা ত জানেন না, কোথায় কোন শত্রুপুরীতে তিনি তাহার আদরের হিমুকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! এখান হইতে সে কি আর কখনো বাহির হইতে পারিবে? বলাইয়ের মার মুখে যে কথা সে এই কতক্ষণ পূর্ব্বে শুনিয়াছে, তা'র পর যে সে আর কোন ভরসাই পাইতেছে না। তাহার দশা যেন এখন রাম-রাবণের মধ্যবর্ত্তী মারীচের মতই হইয়া পড়িয়াছে! কাল যিনি ভাই বলিয়া, বন্ধু বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আজ তিনিও আবার শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন!

ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে বলাইয়ের মা দিদিমার অনুজ্ঞা জানাইয়া যখন তাহাকে নীচের ঘরে চুল বাঁধিবার জন্য ডাকিতে আসিল, তখন সে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষেই বসিয়াছিল। দাসী আহ্লাদ করিয়া বলিয়াছিল, "চল দিদিমণি, চুল বাঁধ্‌বে চল। কর্ত্তা-মা তোমার পর্‌বার জন্যে কেমন খাসা ফুল-চিরুণী গড়িয়ে আনিয়েচেন, দেখ্‌বে চল। এক একটি নক্ষত্তরের ভেতর এক একটি রাঙ্গা চুনি। রক্তের মতন টক্‌টকে রাঙ্গা! খাসা পালিশ ক'রেচে বাবু। তাও বলি, বল্‌লে বল্‌বে হয় ত বাড়ানো কথা—তা বাবু, বলাইয়ের মা কিন্তু কক্ষণো বাজে কথা জানে না, এ কলঙ্ক তাকে কেউ কখন দিতে পার্‌বে না। বৌ-ঠাক্‌রুণের আমাদের কত রকমের কত ফুল, কাঁটা, প্রজাপতি—তবেগে—বাগান-টাগান মাথার সাজই বা কত রকম! তা'হলে কি হবে, বল? এমন মুণ্ডু-মালিনীর কেশ ত আর নেই! এ চুলে কেবল একটি এলো খোঁপা জড়িয়ে রাঙা টুক্‌টুকে একটি গোলাপ ফুল

গুঁজে দিলেই কত বাহার দেখায়! সোনা দিয়ে একে সাজাতেও হয় না” বলিয়া দাসী মুগ্ধ-চোখে হিমুর রেশম-চিক্কণ ঘন-কুঞ্চিত কেশ-পাশের দিকে চাহিয়া রসিকতার হাসি হাসিল। বুদ্ধিমতী বলাইয়ের মা একসঙ্গে দুই দিক রাখিতেছিল। দুইদিন পরে ইনিই যখন মনিব হইবেন, তখন এখন হইতে ইঁহাকে খুসী রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে সেটা কাজে লাগিতে পারে; মেয়েটি একবগ্‌গা হইলেও সরল খুব। সংসারের বুদ্ধি এতটুকুও নাই। তা'ছাড়া সেও ত আর এমন কিছু মিছা কথা বলিতেছে না!

হিমুর চুলগুলি এতক্ষণ খোলাই ছিল। দাসীর কথায় সে ব্যস্তভাবে সেগুলি খুব উঁচু করিয়া মাথার মাঝখানে ক্ষিপ্রহস্তে তাল পাকাইয়া জড়াইয়া লইল—লইয়া উদাসীনভাবে কহিল, “দিদিমাকে বলগে, আমার চুল ভিজে, বাঁধ্‌ব না।”

দাসী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, “ওমা, সে কি গো? ভিজে—তবে জড়ালে কেন আবার? এস না—আমি কুরিয়ে দি। হাওয়া পেলে এখনি শুকিয়ে যাবে'খন। চুল বড় সুখী প্রাণী, দিদিমণি,—এদের যত্ন না করলে আবার থাকেও না” বলিয়া কাছে আসিয়া হিমুর মাথায় হাত দিতে গেলে হিমু সবেগে মাথা সরাইয়া লইয়া অপ্রসন্ন-কণ্ঠে কহিল, “আমার মাথায় হাত দিয়ো না বল্‌চি।”

বলাইয়ের মা কহিল, “তবে পশ্চিমের বারান্দায় চল। সেখানে এখনও পড়ন্ত রোদ একটু আছে। একবার মেলে দিলেই শুকিয়ে যাবে। চল, দিকি।”

হিমু কহিল, “পড়ন্ত রোদে আমার মাথা ধর্‌বে। তুমি বলগে যাও, চুল ভিজে, বাঁধ্‌বে না। তোমার এত সাত-সতেরোয় দরকার কি?”

তাহার অপ্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দাসী একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল, “বুঝেচি দিদিমণি, বর তোমার মনে ধরে নি। তাই সবেতেই

তোমার গোঁসা! তা কি ক'র্‌বে ভাই, বল,—সবই কি আর পছন্দ-মতন হয়?"

হিমু মুখ ফিরাইয়া একটা রুদ্ধ জানালার বন্ধ খড়খড়ির দিকে চাহিয়া ছিল—তেমনই রহিল, একটিও কথা কহিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া বলাইয়ের মা সাহস পাইয়া সহানুভূতির সুরে কহিল, "আমরাও সব তাই বলাবলি করি, যে বিয়েটি কর্ত্তা বাবুর সঙ্গে না হ'য়ে দাদাবাবুর সঙ্গে হ'লেই খাসা মানাত। আর বৌ-ঠাক্‌রুণও শয্যা ছেড়ে বরণ-ডালা মাথায় ক'রে বৌ-বেটা ঘরে তুল্‌ত। তা ত আর হবার নয়। হাঁা গা দিদিমণি, দাদাবাবুকে তোমার মনে ধরেচে, বুঝি? কাল যে দেখ্‌লুম, দাদাবাবু একখানা বই হাতে করে তোমার ঘরে ঢুক্‌ল। দাদাবাবু ত তোমায় দেখে পাগল! কিন্তু ও পিত্যেশ ছেড়ে দাও, কর্ত্তাবাবুর খাস খানসামা রেধো সকাল বেলায় রান্নাঘরে টিকে ধরাতে গিয়ে বামুন ঠাক্‌রুণের কাছে চুপিচুপি বল্‌ছিল কি, জান? এই কথা নিয়ে দাদাবাবুর সঙ্গে কর্ত্তাবাবুর নাকি বিকেল বেলায় একটা কুলুক্ষেত্তর হ'য়ে গেছে! দাদাবাবু তোমায় বে কর্‌তে চেয়েছিল বলে কর্ত্তাবাবু তাঁকে বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যেতে বলেচে। দাদাবাবু চিরকাল অভিমানী। সে কি এমন মর্ম্মান্তিক কথা কখনো সইতে পারে—না, সয়েচে? সেই রাতেই বাড়ী ছেড়ে তিনি চলে গেছে। দাদাবাবুর চাকর বিনোদ সকাল বেলা ঘরে গিয়ে দেখে—না, সেখানে যা যা জিনিষ-পত্তর সব অমনি পড়ে আছে। বাক্‌স, বিছানা, মণিব্যাগ, ঘড়িটি পর্য্যন্ত পড়ে, কেবল দাদাবাবুই নেই। শূন্তি শয্যে পর্শ পর্য্যন্ত করে নি। ভয়ে সব চুপ চাপ করে রয়েচে। কর্ত্তাবাবু নাকি সব শুনেছে—কর্ত্তাবাবুকে চিঠি লিখে রেখে গেছে কি না—তাই গুম্ হ'য়ে আছে। যেন কেউ খোঁজ না করে!—কর্‌লেও দেখা পাবে না, এই কথা বলে গেছে। কর্ত্তাবাবু চিঠি পড়ে কারো সাথে কথাটি কয় নি। আগেকার দিন থাক্‌লে এই নিয়ে বাড়ীতে কি

কাণ্ডই না বাধ্‌ত! বৌ-ঠাকৃরুণ মাথা খুঁড়্‌ত, মূর্চ্ছো যেত। মা-ঠাকৃরুণ চীৎকার কর্‌ত। আজ সব চুপ-চাপ। হায় রে, আঁতের টান যে আলাদা জিনিষ! আমরা যে দাসী-চাকর, শুনে আমরাই লুকিয়ে কেঁদে মরি। ছেলে ব'লে ছেলে কি! ছেলের মতন ছেলে। তাই বলি দিদিমণি, যা পাচ্চ, তাই খুসী হ'য়ে নাও, ভাই। রাগ-দুঃখ করে কেবল কষ্ট পাওয়া আর দেওয়া বই ত নয়!"

হিমু মুখ ফিরাইয়া সহসা তর্জ্জনের স্বরে কহিল, "তুমি যাবে কি না বলতে পার? না যাও, বল, আমিই যাচ্চি!" বলিয়া সে সবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় শুনিল, দাসী বলিতেছে, "তোমাদের ভালর তরেই বলি, দিদিমণি। নৈলে বলাইয়ের মা কারো পিত্যেশ রেখে কথা কয় না। ছেলে মানুষ বোঝ না ত কিছুই। এই বিয়েটা চুকে গেলে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফেরে, তা আমাদের তাতেই সুখ!"

ঘরের বাহিরে আসিয়া ছাদের সিঁড়ি চোখে পড়ায় হিমু নির্জ্জনতার আশায় বরাবর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছাদে উঠিল। সেখানে দুই চোখে জল ভরিয়া সে আকাশের পানে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গভীর অভিমানে তাহার বুকখানা মাঝে মাঝে কেবলই ফুলিয়া উঠিতেছিল। মা তাহাকে কোথায় পাঠাইয়াছেন? যেখানে মানুষের মন লইয়া মানুষ কেবল শিকার খেলা খেলে! ওগো, তোমরা হিমুকে ছাড়িয়া দাও। সে বনের পাখী, বনের কোলে উড়িয়া যাক্। অন্ধকার কুঁড়ে-ঘরে মার বুকে মুখ রাখিয়া সে পরম সুখে দিন কাটাইবে। চাহে না সে তোমার এই রাজ-প্রাসাদের আলো, এ আনন্দও চাহে না সে,—মণি রত্ন মুক্তার মালা, তা'ও সে চাহে না।

হিমুর জল-ভরা চোখের উপর অরুণের মুখ ভাসিয়া উঠিল। এ বিপদে সেই তাহার একমাত্র আশা ও ভরসা। কিন্তু সে ত এত তত্ত্ব কিছুই জানে না—সে ত জানে না যে হিমু আজ শত্রু-পুরীতে বন্দিনী হইয়া আছে!

প্রফুল্ল-দা' আশা দিয়াছিলেন, আশ্বাস দিয়াছেন। সে যে একান্ত মনে তাঁহারই পথ চাহিয়াছিল! ভাগ্য-দোষে তিনিও বিরূপ হইলেন! ছি, এমন মতিভ্রম তাঁহার কেন ঘটিল! হিমু যে তাঁহাকে বড় ভাইয়ের মতই মনে করিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। সে মুখে, সে চোখের দৃষ্টিতে হিমু যে অরুণের দৃষ্টিই দেখিয়াছিল। তবে তিনিই বা এমন পাগলের কাণ্ড করিলেন কেন? বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? হিমু গল্পে পড়িয়াছে, এমনই করিয়া কত বড় লোকের ছেলে, কত রাজ-পুত্র গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া কত বিপদে পড়িয়াছিল। কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া দস্যু-হস্তে বন্দী হইয়া পাতাল-পুরীতে বন্ধ থাকিয়াছে। কে জানে, প্রফুল্ল-দা'র অদৃষ্টে আবার তেমনি দুর্ঘটনা লেখা আছে কি না। হিমুর চিন্তার ধারা একভাবে বহিতেছিল না। বালিকার চিন্তা কখনো এক বিষয়ে বদ্ধ থাকিতেও পারে না! সে মার কথা, অরুণের কথা, সত্যদয়ালের ছয়মাসের খোকাটির কথাও ভাবিতেছিল—এবং ভাবনার সহিত কখন যে তাহার চোখের দৃষ্টি আকাশের রঙের ও ঘুড়ির প্যাঁচ খেলায় বদ্ধ হইয়া গিয়া সব চিন্তাই অস্পষ্ট হইয়া মনের দুঃখও হাল্‌কা হইয়া আসিয়াছিল—তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

সহসা সিঁড়ির মাথায় শিকল নড়া ও পায়ের শব্দে হিমু সচকিতে চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে ভীত হইল। যে আসিল, সে আলোকনাথ। প্রায় আট দশদিন হিমু এই দৃষ্টি এড়াইয়া নিজেকে লুকাইয়া কাটাইয়াছে। আজ এমন অসময়ে এখানে যে? নিশ্চয় ইনি আবার জ্বালাতন করিতে আসিয়াছেন। হিমু দমিল না। আলোকনাথকে সে এখন অশ্রদ্ধাই করিত, তা'ই তাহার সঙ্গ এড়াইয়া চলিত। পুরুষের নিকট যে এমন নির্জ্জন অবসর—তরুণী রূপসীর পক্ষে ভয়ের কারণও হইতে পারে, সে অভিজ্ঞতা তাহার জন্মায় নাই। দেখিয়াও যেন দেখিতে পায় নাই, এমনই অনাগ্রহ উদাস দৃষ্টিতে হিমু আকাশের পটেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিল। আলোকনাথের

মুখ আজ বিষণ্ণ। হিমুকে দেখিয়া তাহার ম্লান ওষ্ঠে একটু স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিল। কাছে আসিয়া সে কহিল, "অনেক দিনের পর তোমার দেখা পেলুম। আর তো বাগানে যাও না? তুমি কি আমায় এখন লজ্জা কর, হিমু? এমন ভাবে লুকিয়ে থাক কেন?"

হিমু তেমনি ভাবে রহিল, জবাব দিল না। আলোকনাথ কহিল, "ভাল লাগে না তোমার—আমার সঙ্গ? কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবেসে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছি, হিমু,—আমার যে আর উপায় নেই?"

হিমু অবাক্ হইয়া আলোকনাথের পানে চাহিয়া কহিল, "সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গেছেন? মকদ্দমায় হেরে গেছেন, বুঝি? ওঃ না, না, আমারই ভুল হয়েচে। আপনার ভাইপো চলে গেছেন, তাই বল্‌চেন, বুঝি?" আলোকনাথের কণ্ঠে আন্তরিকতার এমন একটা ব্যথিত সুর বাজিয়াছিল, যাহাতে স্বভাব-কোমলা হিমু মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইল। অনেকগুলি নাটক-নভেলের কাহিনী তাহার জানা থাকিলেও, স্বাভাবিক অজ্ঞ স্বভাবের বশে সে বুঝিল না যে, ইহা প্রণয়ীর প্রণয়-নিবেদন! তাহার মনে হইল, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া খুড়া-ভাইপোয় এই যে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে, এ জন্য ধর্ম্মতঃ সেও ত কতক দায়ী! অনাবিল ভ্রাতৃস্নেহে মৃত্যুরূপিণী হইয়া প্রজাপতির যে মানসকন্যা সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়াছিল, হিমু কি তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারে? না, কখনই না। সে দুর্ভাগিনী ভাগ্য-নিয়োজিতা। তবু হিমু একদিন তাহার কঠিন বিচারই করিয়াছিল।

হিমুর অত্যধিক সারল্যে ও অনভিজ্ঞতায় লজ্জিত হইয়া আলোকনাথ কহিল, "হ্যাঁ, তাই। সে চিরকালই আমায় এমনি করে দুঃখ দিয়ে আস্‌চে। সে যা হোক্, সে এখন বড় হয়েচে, লেখা-পড়া শিখেচে, তার আশা আমি ছেড়েই দিয়েচি। তুমি বুদ্ধিমতী, সবই ত বুঝ্‌তে পার্‌চ—সেই জন্যেই, এই তার অবাধ্যতার শিক্ষা দিতেই আমার আরো দরকার—তাকে জব্দ করে

দেওয়া। দেখ্‌চ ত, আমার স্ত্রী ত মরারই সামিল। সংসারে সব থেকেও—ভগবান্ আমায় সব দিয়েও যেমন দুঃখী করেচেন, রাস্তার একটা মুটে-মজুরও তার চেয়ে সুখী! বুঝ্‌চ ত সবই! তুমি শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, তোমায় ত বেশী বল্‌তে হয় না।"

হিমু আজ নিজেকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বারবার উল্লিখিতা হইতে শুনিয়া একটুখানি খুসী হইতে গিয়াও পারিল না। বুদ্ধির প্রশংসা তাহার একমাত্র অরুণ ছাড়া আর কেহ কোন দিন করিয়াছে বলিয়া মনেও পড়ে না। অরুণও যে টুকু প্রশংসা করে, সেও যেন তাহার নিকট কাজ আদায় করিয়া লইবার ফন্দীর মত। কেবল শীঘ্র মুখস্থ করার শক্তি-মত্তা বা পাঠে অত্যন্ত মনোযোগিনী এমনি সব কথায়। তাহার কতটুকু সত্য আর কতটুকু দুষ্টামি, সে বিষয়ে হিমুর মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু অরুণের মুখে প্রশংসার বাণী এমনি মধুর যে, বিদ্রোহ করিতেও ইচ্ছা হয় না। অবিশ্বাসী পূজকের পূজোপহারের মত সে তাহা অবলীলাক্রমেই গ্রহণ করিয়া থাকে।

আলোকনাথ যে কিসে তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইল, সে চিন্তা তাহার মনে না আসিলেও নিজের বিবেচনার সংবাদ অন্যের মুখে শুনিতে বেশ লাগিয়াছিল, তবু সেই সঙ্গে জড়িত বাকী কথাগুলির স্পষ্ট অর্থ কিছু না বুঝিলেও সে কেমন মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল। আকাশের রঙ্গীন বর্ণ ক্রমে মলিন হইয়া একখানা পাংশু-বর্ণের চাদরের মত দেখাইতেছিল। বাগানের বড় বড় গাছের মাথায় কাটারির মত সরু চাঁদ ম্লান-বর্ণে উদিত হইতেছিল, অন্ধকার অল্পে অল্পে ছায়া বিস্তার করিতেই দূরে ঠাকুর বাড়ীতে সন্ধ্যারতির আগমন-সূচক কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ উত্থিত হইল। হিমু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আপনি বড় লোক। দয়া করে আমায় মার কাছে পাঠিয়ে দিন্। আমি আর একদিনও এখানে থাক্‌তে পার্‌চি না।"

তাহার চোখের জল ও কণ্ঠের কাতরতা মুহূর্ত্তে আলোকনাথকে দ্রবীভূত করিয়া তুলিল। হিমুকে সে যথার্থই ভাল বাসিয়াছিল। তাহার অনেকখানি রূপের মোহ হইলেও, কয়দিন হিমুর সঙ্গ-লাভে, তাহার বাল-সুলভ সরল আনন্দময় স্বভাবের পরিচয়ে একটা স্নেহের ভাবও জন্মিয়াছিল। সে কোমল-কণ্ঠে কহিল, "কেন পাচ্চ না হিমু? সুধু মার জন্যে? তা যদি হয়—বল, মাকে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আস্‌ব। পায়ে ধ'রে হোক্, যেমন করে হোক্, তাঁকে আমি এখানে নিয়ে আস্‌ব। আর কেনই বা তিনি সেখানে একা থাক্‌বেন? তোমার বাড়ী, তাঁর মেয়ের বাড়ী, এ কি তাঁরই বাড়ী নয়?"

"আমার বাড়ী? না,—না গো" হিমু ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল স্বরে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। "আমায় এখনি মার কাছে পাঠিয়ে দিন, নৈলে এই ছাদ থেকে আমি লাফিয়ে প'ড়্‌ব। মা এলেও আমি বাঁচ্‌ব না, কিছুতেই না।" সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাঁফাইতে লাগিল। কাঁদিবার চেষ্টা করিলেও দারুণ ভয়ে কান্না বাহির হইল না।

আলোকনাথ অনেকক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া অত্যন্ত করুণ হতাশপূর্ণ স্বরে কহিল, "আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। তুমি আমায় কখনও কোন কালেও ভালবাসতে পারবে না। তাই আমার দেওয়া উপহার ময়লার গাদায় ফেলে দাও—আমার দেওয়া কাপড়-গহনা ব্যভার কর না। শুন্‌ছিলাম, অসুখের ছুতো করে খাচ্চ না সবদিন! তোমার জীবন ব্যর্থ করে দিয়ে শুধু নিজের সুখ,—থাক্! তার ত..সবই ফুরিয়ে গেছে, এ লোভও না হয় আমি ত্যাগ কর্‌লাম্! জোর করে' বিয়ে কর্‌লে ত সত্যিকার তোমায় আমি পাবনা? ভয় নেই, স্বচ্ছন্দে তুমি তোমার মার কাছে ফিরে যেয়ো। আমার বাড়ী এসে যে দুঃখ পেয়ে গেলে, পারো ত, কখনো তা ভুলে যেয়ো।"

হিমানী মুখের হাত সরাইয়া অশ্রুরুদ্ধ গাঢ়স্বরে কহিল, "আপনার দয়া আমি ভুলে যাব না। সম্বন্ধেও আপনি আমার দাদা হন্। আপনাকে বরাবরই আমি ভাল বাস্‌বো।"

আলোকনাথ এইমাত্র না বলিয়াছিল—সে বুঝিয়াছে হিমু তাহাকে কখনো ভালবাসিতে পারিবে না? মানুষ যতক্ষণ চায়, ততক্ষণই প্রাপ্যের দুর্ল্লভতা! যেই সে ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করিল, অমনি দুর্ল্লভ সুলভ হইয়া দেখা দিল। তা'ই প্রকৃত শান্তি বুঝি বৈরাগ্যেই মিলে!

অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হিমুর ভালবাসার প্রতিশ্রুতি-লাভেও আলোকনাথকে কিন্তু একটুও খুসী হইতে দেখা গেল না। সে আর একটি কথাও না বলিয়া যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে সন্ধ্যার ছায়ান্ধকার-ঢাকা সিঁড়ির পথে নীচে নামিয়া গেল। পরাজয়! আজ বিশ্ব জুড়িয়া শুধু তাহার পরাজয়ের বার্ত্তাই বহিতেছিল। এ ক্ষেত্রে জয়ী হইয়াও, তা'ই সে জগতের কাছে পরাজিতই রহিয়া গেল! জগতে সে আজ একা! তাহার কেহ-ই নাই! সেও কাহারও নয়!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঝড়ের পর

একগাছা মুড়া ঝাঁটা দিয়া বাড়ীর বাগানের অনেক দিনের সঞ্চিত ধূলি-জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া হিমু একত্র জমা করিতেছিল; মধ্যে মধ্যে অদূর-বর্ত্তিনী মায়ের সহিত কথাও কহিতেছিল। মালতী ছোট একটি চেঁচাড়ীর চুপ্‌ড়ি হাতে নোটে শাকের ক্ষেতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শাক তুলিতেছিলেন, এবং "অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া, কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া" ইত্যাদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময় স্নানান্তে মুক্তা ঠাকুরাণীকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া হিমু কথা বন্ধ রাখিয়া দ্বিগুণ মনোযোগে দুই হাতে ঝাঁটা গাছ্‌টা সাপটিয়া ধরিয়া কাজ সুরু করিয়া দিল। দেখিয়া মা আবৃত্তি বন্ধ করিয়া বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ধূলো উড়িয়ে চার্‌দিক্ অন্ধকার করে দিলি যে,—দেখ্‌তো চুলগুলোর কি দশা হলো?"

মুক্তা ঠাকুরাণী কাছে আসিয়া নিজ দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ করতল উল্টারূপে আধ্‌মোড়া ভাবে রাখিয়া, কিছুক্ষণ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়া হিমুর দিকে চাহিয়া, তাহার ধূলিধূসরিত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে শ্লেষের স্বরে কহিলেন, "যারে যা মানায়! হীরে-মুক্তোয় রাজরাণী সেজে সোনার পাটে বস্‌বার যুগ্যি মেয়ে ত তোমার নয়, রাণু! ওর তা রুচ্‌বে কেন?"

হিমু ঝাঁটা-সমেত ডান হাতখানা মাথার উপর ঘুরাইয়া ধরিয়া হাসিয়া কহিল, "বল ত দিদিমা—সত্যি—এ মানাচ্চে না? খোসামুদে কথা বল্‌লে শুন্‌বো না কিন্তু।"

দিদিমা মুখ ভার করিয়া বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে অহিলেন, "খোসামুদে কথা মুক্ত বাম্‌নীর চোদ্দপুরুষে কখনো শেখেনি। মানিয়েচে বৈকি? ধাঙ্গড়নী মেথরানীর মত মানিয়েচে! হাঁারে রাণু, কর্ত্তা যে আমাদের পাঠিয়ে দিলে নিজে হতে, মানেটা কি বল্‌ ত? তারপর একটা খোঁজ না, খবর না, সেই হতে ত দেখি, সবই চুপ্‌চাপ্‌। ঝীয়েরা সব চুপি চুপি বলাবলি কচ্ছিল,—ভাইপো নাকি হিমিকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিল, তাতে কর্ত্তা রাগ করে তাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলে—এ সব কথা ত বলেইচি আগে। তা আমিও বলি, ভাইপোটিই বা কেমন, বাছা? খুড়ো বিয়ে কর্‌তে চাইচে,—বুড়ো না, হাব্‌ড়া না, ধনের সাধবিধি নেই—বেটা হয়নি,—আহা! বেটার সাধ কারই বা না হয়, বল? তা চাচ্ছে যে কর্‌তে, করুক্‌ না? দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে! তোরই কি ঐ মেয়ে নৈলে আর যে জুট্‌তো না? কথায় বলে, বাপ খুড়ো! এ ত সত্যি বাপের কাজ কচ্চে! খুড়ো মানুষ করলে,—ওমা, তিন তিনটে পাশ দিয়ে চারটে পাশের পড়া ছেলে, তোর এই কাণ্ড! তা হলে ছোট লোকের ঘরে কি না করবে, বল্‌ দেখি? বৌ ছুঁড়ির অত রাগ-গোঁসা নেই,—বল্‌লে,—'বাবুর সাধ হয়েছে, ছেলে হবে, করুন না বিয়ে, মাসী-মা! আমি ভাবি কেবল ফুলুর জন্যে—মানুষ করেচি'।"

মালতী মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "কি জানি মামি! রোজই ত মনে করি কোন খবর পাব, অন্ততঃ প্রফুল্লও একদিন আস্‌বেন। তা ত এলেন না, অরুণের এত বন্ধু, শুনি। ওঁর দয়ার কথা অনেক দিন অনেক শুনেছি। নিজে না খেয়েও গরীবকে খেতে দেন। কষ্ট করে থেকে সেই পয়সায় কত গরীবের ছেলের পড়ার খরচ দেন,—অরুণ ত এই সব বল্‌তে অজ্ঞান হতো! অরুনের বই-টই সবই ত উনি-ই দেন, না হলে ওর অত পড়া এতদিন চুকে যেতো!

প্রফুল্লের প্রতি মুক্তা ঠাকুরাণী মনে মনে অপ্রসন্নই ছিলেন। মাঝে পড়িয়া সেই ত তাঁহার পাকা ঘুঁটি কাটিয়া দিল। গরীবের মেয়ে বড় ঘরে পড়িত,—সোনা-দানায় অঙ্গ মুড়িয়া থাকিত। দুই হাতে দান-ধ্যান ব্রত তীর্থ কত কি সব করিত। পাঁচজনকে অন্ন দিয়া, পাঁচের পূজ্যা হইয়া থাকাতেই ত সংসারের সুখ! নহিলে সুখ কিসের? ঠাকুরাণী বক্রমুখে ঠোঁট টিপিয়া কহিলেন, "যা বল আর যা কও, আমি বাছা হক্ কথা কব। ঐ কাঁচা বয়েস ছাড়া আর কোন পিত্যেশ তোমার ওর কাছে নেই। বড় ঘরের ছেলে, দুঃখু-কষ্ট করে যে খেটে খাবে, তাও কিছু পারবে না। কর্ত্তাও যখন জেদ ধরেচে, তখন তা বজায় রাখ্‌তে বিয়ে কর্‌বেই। ছেলের সঙ্গে কি আর কাড়াকাড়ি কর্‌বে? তাই এ-কে দিলে সরিয়ে। মাঝে থেকে পড়্‌লো তারই গুড়ে বালি।"

মালতী বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "আমার ত সেখানেও কোন আশা ছিল না, মামি! আমি ভাবি, আমাদের জন্যে ওঁদের একটা ঘরোয়া বিবাদ হোল,—সেই জন্যেই আমার দুঃখ হয়!"

"সে দুঃখ তোমার অন্যায়, বাছা! কি যে তুমি ভেবে রেখেচ মনে, তা তুমিই জান। আমার পরামর্শ নাও ত বলি, এখনই কর্ত্তাকে চিঠি লিখে গলার কাঁটা উলোও। তুমি কি মনে কচ্চ, ওর চেয়ে ভাল বর তুমি আর পাবে কোথাও?" বলিয়া তিনি ভাগিনেয়ীর বিষণ্ণ নত মুখের পানে বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

মালতী নত মুখে শাকের ডগাগুলি খুঁটিয়া তুলিতে ছিলেন, নিরুত্তরেই রহিলেন। তাঁহার পল্লবে-ঢাকা দু'টি ব্যথিত চোখের নত দৃষ্টি জলে ভরিয়া ঝাপ্‌সা হইয়া গেলেও তাহা মাতুলানীর দৃষ্টিতে পড়িল না; এবং তাঁহার যুক্তিপূর্ণ সদুপদেশের ফল ফলিতেছে কি না, তাহাও ঠিক্ বোঝা গেল না।

হিমুর ঝাঁট দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। ঝাঁটা গাছটি যথাস্থানে রাখিয়া ফিরিবার সময় মুক্তা ঠাকুরাণীর শেষ কথা গুলি তাহার কানে গেল। সে হাসিয়া কহিল, "দিদিমা, বুড়ো হলে মানুষ ভারী পেটুক হয়, না? পরের বাড়ীর ক্ষীর সন্দেশ ভারী মিষ্টি লাগে?"

মুখরা হিমুর যথেচ্ছ আচরণ একেই ত দিদিমার প্রীতিপ্রদ ছিল না। তাহার উপর এখন তিনি তাহার প্রতি মনে মনে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়াই আছেন। সে-ই ত তাহার মাকে বাধ্য করিয়া বিবাহে সম্মতি দিতে দেয় নাই। বুড়া বর বলিয়া মেয়ের আবার মনে ধরে নাই! মেয়ে কি খুকি? বুড়া ছাড়া কে আবার ও বুড়া-হাতী 'দজ্জাল' মেয়েকে বিবাহ করিবে? হিমুর ব্যঙ্গোক্তি তা'ই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি মিশাইল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঠাকুরাণী কহিলেন, "হ্যাঁ, ক্ষীর সন্দেশের লোভেই মরচি আমি। দেখিনি ত কখনো চোখে! আর সেই পাত্রীই তুই বটিস্! থুব্‌ড়ো কলাগাছ, বিকুবি কি দিয়ে, তাই বল্‌তো আগে আমায়, শুনি?"

হিমু হাসিমুখে কহিল, "শুন্‌বে দিদিমা? আমার পরামর্শ যদি নাও ত আমি বল্‌চি,—'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি'—তা'হলে কেউ আর সাহস করে এগুবেও না।"

দিদিমা এবার অসহ্য ক্রোধে হিমুকে ছাড়িয়া মালতীর নত মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, "যত নষ্টের গোড়া ঐ অরুণে! এত বড় দস্যি দজ্জাল মেয়েকে কেউ কখনো লেখা-পড়া শেখায়? মেয়ে আবার ইংরিজিতে অরুণের সঙ্গে কথা কয়! অত বড় বেটা ছেলে, সেই শ্লেন চোরটির মত মুখ রাঙ্গা করে সরে পালায়। দে না গো রাণু, পণ্ডিতনি মেয়েকে একটা টোল খুলে দে না, সংস্কৃত পড়াবে, ন্যায় শাস্তর শেখাবে। ঢের পড়ো জুটবে অথন!"

মালতী এবার মুখ তুলিয়া তিরস্কারপূর্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "হিমু—"

"না মা, দিদিমা সত্যি রাগ করেনি! করেচো দিদিমা? ভারী ত মানুষ আমি, আমার উপর আবার রাগ করা! আমায় যদি দূর করে দাও, তুমিই বা ছাই ফেল্‌বে কিসে, বল ত?" বলিয়া মা ও দিদিমার দ্বিতীয় মন্তব্য শুনিবার আশা না রাখিয়াই সে, "ঐ যা—দিদিমা পুরুত মশায়ের ছাগল তোমার তুলসী গাছটি মুড়্‌লো"—বলিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে দৌড়াইল।

"বলি, আজ কি শুধু শাগসেদ্ধ খেয়েই থাক্‌তে হবে নাকি? ক্ষেতটা যে উজোড় কল্লি, বাছা! সবই কি তোদের বাড়াবাড়ি! এমন ধারা কখনো দেখিনি, বাবা!" বলিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী অনুপস্থিত দুষ্টা হিমুর অপরাধের দণ্ডবিধানে অক্ষমতার ক্রোধের ঝাল একটুখানি তাহার মায়ের উপর ঝাড়িয়া লইয়া গৃহাভিমুখিনী হইলে মালতীও নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

মেয়ের জন্য মামীর কাছে মাঝে মাঝে এমন দুই-চারিটা শ্রুতিকটু মন্তব্য তাঁহাকে প্রায়ই শুনিতে হয়। ইহাতে তাঁহার দুঃখ হইত না। তিনি জানিতেন, মামী তাঁহাকে ভালবাসেন। অবিনীতা নাতনীকে পারিয়া উঠেন না বলিয়াই 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ'র মত এগুলা পরোক্ষে তাঁহারই উদ্দেশে ছুড়িয়া মারা! তা' হউক—তাঁহার কিছুতেই আসিয়া যায় না। কিন্তু হিমু বড় অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অত অবাধ্যপনা তাহার—পরে সহিবে কেন? অথচ বারণ করিয়া ফল হয় না—সে কেবল হাসিয়া জড়াইয়া ধরে, শতবার মাপ্ চায়, দিদিমার পায়ের ধূলা লয়। আবার পর মুহূর্ত্তে তদপেক্ষা কঠিন অপরাধই করিয়া বসে। ইহাকে শাসন করিতেও যে হাত উঠে না। অবুঝ দুরন্তকে শাসন করিবার লোকের অভাব ত

কখনো হয় না ; সে ত চিরদিনের জন্যই পড়িয়া আছে। ক্ষমা করিবার লোকেরই না সংসারে অভাব ! অভাগিনী মা, এমন মেয়েকে ত মনের মত বর দিতে পারিলেন না—শুধু শাসন দিয়াই কি তাহাকে বিদায় দিবেন ? তবে বাকী দিনগুলা তাঁহার কিসের স্মৃতি বহিয়া কাটিতে পারিবে ?

দুপুর বেলার রান্না-খাওয়া চুকাইয়া দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া মালতী চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন। কাছে বসিয়া হিমু তাহার চরকা লইয়া সুতা কাটিতেছিল। মুক্তা ঠাকুরাণী অদূরে কম্বলের আসনে বসিয়া, চোখের উপর টিনের ফ্রেমে বাঁধা চশমাখানি আঁটিয়া কাশীখণ্ড পাঠ করিতেছিলেন, ও মধ্যে মধ্যে মালতীকে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতে ছিলেন। শুনিতে শুনিতে হিমু কহিল, "দিদিমা, একবার কাশী চলনা গা ! কাশী হেন স্থান, তাও জন্মে কখনো দেখ্‌লাম না। পূজোর সময় কন্‌শেসন টিকিট"—হিমুর সহিত দিদিমার কলহ ও সন্ধির কোন বিশেষ পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট ছিল না, কারণ তাহা দিনের মধ্যে কত বারই হইত। সকাল বেলার ঝগড়া কখন মিটিয়া গিয়া এখন সন্ধির কাল চলিতেছিল। মুক্তা ঠাকুরাণী বইয়ের উপর হইতে চোখ তুলিয়া হিমুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি টিকিট, বল্‌লি ? আধা ভাড়া, বুঝি ? তা যাবি রাণু ? তুইও ত দেখিস্‌নি কখনো। চ না, বাবা বিশ্বনাথের মাথায় একটু জল দিয়ে তীর্থের রজে একবার গড়াগড়ি দিয়ে আসি ?"

প্রশ্নটা যত সহজ, উত্তর তত সহজ ছিল না। একেই ত তাঁহারা মা ও মেয়ে বসিয়া বসিয়া বিধবার পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইতেছেন। তাহার উপর এই যে প্রকাণ্ড পর্ব্বতভার, আসন্ন কন্যা দায়—এ দায় উদ্ধারের সামর্থ্যও ত তাঁহার নিজের নাই। সেও যে উঁহারই করুণার উপর নির্ভর ! ইহার উপর আবার তীর্থের সখ ? আধা ভাড়া হউক, তবু সেও ত বড় কম

নয়,—তাঁহারা তিনজন, সেথোও একজন চাই। তীর্থের পথে বাহির হইলেই কত রকম খরচ আছে। এই সব ভাবিয়াই অনাগ্রহভাবে মালতী কহিলেন, "তীর্থ স্থানে বেরুলেই বিস্তর খরচ। থামকা কাজ কি মামি?"

মামীর মন এতক্ষণ যতটা অগ্রসর না হইয়াছিল, ভাগিনেয়ীর আপত্তির কথায় বিরক্তিতে কাশীনাথের প্রতি ভক্তিতে মনটি আরো দ্বিগুণ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তিনি কহিলেন, "খরচ ত পেটে খেলেও আছে, রোগে ধর্‌লেও আছে, সবেতেই আছে। তা বলে মানুষ কি পরকালের কাজও কর্‌বে না? হিমি কুঁদুলে হোক্, ঝগ্‌ড়াটে হোক্, ন্যায্য কথাও বলে। হ্যাঁলা হিমি, অরুণ কবে আস্‌বে লা? ছুটির কি এখনও দেরী আছে নাকি? সেথো একজন চাই ত? আবার—সে ছাড়া আর কাকেই বা ভরসা করি বিদেশ বিভূঁয়ে? যাই হোক্, ঘরের ছেলের মতন আছে, মায়াও বসেচে—"

হিমু ইতঃপূর্ব্বে পাঁজি দেখিয়া ইংরাজী তারিখ মিলাইয়া অরুণের আসিবার দিনটি স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল। মধ্যে কতগুলি দিন এবং রাত্রি এখনও বর্ত্তমান, তাহার হিসাবও তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তবু দিদিমাকে রাগাইবার অভ্যাস-বশে কহিল, "দিদিমার যে আর তর সইচে না? থামো, এখন ছুটির কোথায় কি? তা ছাড়া সে যদি তোমার কাশী বৃন্দাবন কর্‌তে যেতে না চায়? জোর ত নেই বাবু—পরের ওপর!"

দিদিমা মালতীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া মৃদু কণ্ঠে খোঁচা দিয়া কহিলেন, "না ভাই, জোর আর আমার কিসের? আমার সঙ্গে কাশী বৃন্দাবন যেতে সে না চাইতেই পারে—কিন্তু যার সঙ্গে চাইবে, যার জোর চল্‌বে, সেও ত সঙ্গে থাক্‌বে?"

বুদ্ধিমতী মুক্তা ঠাকুরাণী কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটু হিসাবে ভুল করিলেন! আলোকনাথকে হিমুর বিবাহে অসম্মতির কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন,—

হিমুর অরুণের প্রতি অনুরাগ-বশতঃ। সেটা তাঁহার ভ্রম! হিমু অরুণকে ভালবাসিত—সত্য! কিন্তু সে ভালবাসা তাহার কামনাজড়িত নয়। সে তাহার মাকে ভালবাসিত, অরুণকেও ভালবাসিত। সে ভালবাসা আত্মীয়ের নিকট দাবীর ন্যায় অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল। ভাল না বাসিয়া সে অবশ্য থাকিতে পারিত না। সে জানিত, সে যাহাকে ভালবাসে, সেও তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু তাহার অন্য কোন অর্থ সে কথনো কল্পনাও করে নাই। তা'ই দিদিমার শ্লেষপূর্ণ বাক্য ব্যর্থ হইয়াই ফিরিয়া গেল, তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিল না!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অরুণের ভবিষ্যৎ

সেবার বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, অরুণ ফার্ষ্ট ক্লাশ অনারে পাশ হইলেও বৃত্তি পায় নাই। পরীক্ষার কৃতকার্য্যতার যে আনন্দ তাহা সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইল। তা'র পর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অরুণ যেন কূল খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এম্-এ'র গৌরব বহন করিবার জন্য যে বিপুল ব্যয়-সাপেক্ষ পুস্তকাবলীর প্রয়োজন, তাহা অরুণের ন্যায় গরীব ছাত্রের পক্ষে সংগ্রহ করা একেবারেই সম্ভব নয়। পাশ হইলেও—ষাট টাকা মাহিনার চাকুরিও একটা হয় ত হাতে জুটিবে না।

ঝালদায় থাকিতেও এ-সব চিন্তা অরুণের মনে উঠিত। মুখে সে এ বিষয়ে কোন আলোচনাই করিত না। কারণ সে জানিত, এই দয়ালু পরিবারের সামর্থ্য অল্প। তাহার উপর একটা প্রকাণ্ড ব্যয়ের তালিকা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত। মালতী একদিন নিজ হইতে মুখ ফুটিয়া এ বিষয়ে অরুণকে তাহা বলিয়াছিলেন। তাহারই সাহায্য চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, যদি কোন স্ব-শ্রেণীর ছাত্র গরীবের মেয়েটিকে দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়া অনাথার জাতি-মান রক্ষা করে,—সে বিষয়ে একটু চেষ্টা দেখিতেও বলিয়াছিলেন। অরুণ জানিত, প্রফুল্লের সঙ্গে তাহার বিবাহ বাধে না। প্রথমেই তা'ই যোগ্যতা বিচার করিতে গিয়া প্রফুল্লের নামই তাহার মনে পড়িল। কিন্তু সে চিন্তাকে সে উদয়েই চাপিয়া ফেলিল—কারণ হিমু-হীন ঝালদা, এ যেন কল্পনা-ই করা যায় না! হিমু

চলিয়া গেলে এ সংসারে সব দেনা-পাওনাই যে তাহার চুকিয়া যাইবে? তখন শুধু কলেজের রসহীন বইগুলা কি এই একঘেয়ে জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে? অরুণ ভাবিল, মা মনে করেন, হিমু বড় হইয়া গিয়াছে। কোথায় সে বড় হইয়াছে? এখনও অনেক দিন তাহার বিবাহ না দিলে চলিতে পারে। তা' পারে যখন, তখন এত তাড়াতাড়িই বা কি? হইবে—এখন! তা'ছাড়া প্রফুল্লকে নিজ হইতে সে ত কোন কথাই বলিতে পারিবে না। তাহার বাড়ীর ঠিকানাও সে জানে না—সুবিধা-মত যখন তাহার কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা হইবে, তখন এ কথা তুলিবে। অরুণ মালতী দেবীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, হিমুর জন্য ভাবনা কি? সে যথাকালে যোগ্যপাত্র নিশ্চয়ই আনিয়া দিবে। মালতী আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেও অরুণ যখন যোগ্য জনের দর্শন দেওয়াইতে পারিল না, তখন অগত্যা তিনি নিজের হাতে সে সমস্যার ভার গ্রহণ করিলেন। সে কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আপাততঃ আমরা অতীতের অনুসরণেই প্রবৃত্ত রহিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমেই অরুণ প্রফুল্লের সংবাদ লইল। শুনিল, সে দেশে নাই, খুলনায় গিয়াছে। ক্লাশ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া অরুণ হতাশ হইয়া পড়িল।

প্রফুল্ল খুলনা, বরিশাল ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল। অরুণকে নিরুদ্যম ভাবে ঘরে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "ব্যাপার কি? ভর্ত্তি হও নি যে?"

অরুণ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "মনে কচ্চি, আর পড়্‌বো না। যদি একটা কাজ-কর্ম্ম জুটিয়ে নিতে পারি, তারি চেষ্টা কচ্চি। পড়া ত যা-হোক্ এক রকম হল!"

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, "বিদ্যা-সমুদ্রের তল দেখতে পেয়েচ, তা হলে? আর না হলেও চল্‌বে? না হে না, ও-সব বাজে কথা রেখে কালই ভর্ত্তি হয়ে পড়। ডাক্তারখানায় শুনে এলুম, কাল নাকি সর্ব্ব-সিদ্ধিযোগ! তার পর আবার অশ্লেষা মঘা, এড়াবি ক' ঘা? কালই ভর্ত্তি হও, আর একদিনও দেরী নয়।"

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "তাতে আমার দাম আর কত বাড়্‌বে, প্রফুল্ল দা? এটা গরীবের পক্ষেও ঠিক সঙ্গত কি?"

অরুণ যে এবার স্কলারশীপ পায় নাই, আর তা'র অবস্থাও কত অসচ্ছল, প্রফুল্ল তাহা জানিত। সে তা'ই লজ্জিত মুখে "ওঃ" বলিয়া ঘরটা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া অরুণের খুব কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "অরুণ, তুমি আমায় দাদা বল। আচ্ছা, এটা শুধু ভদ্রতার পাতানো সম্বন্ধ, না, এর মধ্যে সত্যিও কিছু আছে?"

প্রফুল্লের বক্তব্য বুঝিয়া আনন্দে ও অভিমানে অরুণের দুই চোখে জল ছলছল করিয়া উঠিল। সে কুণ্ঠা-মলিন মুখে কহিল, "তুমি ত সবই জান প্রফুল্ল দা!"

"জানি ভাই। জানি বলেই বল্‌চি। পয়সার ভাবনাটা—পরীক্ষা পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আমার উপরই ছেড়ে রেখে দাও না?"

অরুণ অপরাধীর ভাবে জড়িত কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তুমি ত আমায় কখনো তোমার সংসারের কোন কথা জানাও নি। তোমার কাকা তোমায় অনেক দেন, বল, কিন্তু সে কি—" বলিয়া অরুণ চুপ করিল।

প্রফুল্ল কহিল, "দু-জনের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়, এই ত বল্‌চো? না—অরুণ! কাকা ইচ্ছে কল্লে, অনেক ছাত্রকেই পড়াতে পারেন। তা ছাড়া আমার কাজে তিনি কখনো কৈফেৎ চান না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে,

তুমি মন স্থির করতে পার নি। বেশ, ভাইয়ের আদর না নাও, ধারই না হয় নিয়ো।"

অরুণ হাসিয়া কহিল, "শুধ্‌ব কিসে? নবডঙ্কা যে! তুমি কি মনে কর, পাশ করলেই তার দাম আমি তুলতে পারবো?"

"করি বই কি! আর কোন ওজোর করো না! তোমার ঋণে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যে বাঁধা, ভাই—কিছু আমায় করতে দাও, তোমার জন্যে।"

প্রফুল্লের কথার ভাবার্থ যদিও হেঁয়ালিপূর্ণ, তবু অরুণ তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা মাত্র করিল না।

অরুণের মনে পড়িল, সেবার নিউমোনিয়া রোগে কাতর হইয়া প্রফুল্ল যখন ছুটিতে বাড়ী গেল না বা খবর পাঠাইতেও দিল না, তখন তাহার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া মেসের সকল ছাত্রই বাড়ী চলিয়া গেল। গেল না কেবল অরুণ। সারাদিন ও রাত অক্লান্ত যত্ন ও সেবায় সে তাহার প্রফুল্লদা'কে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিল। ভাল হইয়া প্রফুল্ল কিন্তু একবারও সে কথার উল্লেখ করিয়া অরুণকে ধন্যবাদ দেয় নাই। আত্মীয়ের জন্য আত্মীয়ের যা' কর্ত্তব্য, এ যেন তেমনই কর্ত্তব্য-পালনের ব্যাপার। অরুণ ইহাতে খুসীই হইয়াছিল। প্রফুল্ল যদি পরের মত তাহার কাছে ভদ্রতার ত্রুটি স্বীকার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত, তবে তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না। বরং কেহ পরে এ কথার আর উল্লেখ করিলে লজ্জায় তাহার মুখ কাণ রাঙ্গা হইয়াই উঠিয়াছে! তবু অনিচ্ছাতেও সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া অরুণের মনে হইল, এ বোধ করি সেই ঋণেরই কথা! প্রফুল্লের কণ্ঠে যে ব্যথার সুরটুকু ধ্বনিত হইয়া অরুণের মনে বাজিল, তাহাতে বাদ-প্রতিবাদ করা চলে না। অরুণ প্রফুল্লের প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

অপরাহ্ণে প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ী পড়াইতে গেলে এ-কথা সে-কথায়

পর তিনি নিজ হইতেই কহিলেন, "স্কলারশিপটা না পেয়ে এবার ত একটু অসুবিধা হলো তা হলে। পরীক্ষার সময় যা মাথার যন্ত্রণা গেল, তাতে ত ফাষ্ট ক্লাসই আমি আশা করতে পারিনি। বড় খুসী হয়েচি! কিন্তু দেখ হে, আমি একটু গোলে পড়ে গেছি। দিদিমণিটা ত শীগ্‌গিরই পরের বাড়ী চলে যাচ্চে। তখন খোকার দিন কাট্‌বে কি করে? আমাদেরও বড় ফাঁকা ঠেক্‌বে। তুমি বাপু বাসাটি ছেড়ে দিয়ে এবার এখানে এসে থাক। ঘরও মেলা খালি রয়েচে। কোন অসুবিধা হবে না তোমার—কোন ওজোর আমি শুনব না বাপু। এ উপকারটি তোমায় করতেই হবে।" প্রিয়নাথ বাবুর কণ্ঠস্বর স্নেহ ও সহৃদয়তা-পূর্ণ। অরুণ বুঝিল, প্রয়োজন কা'র; তা'ই তাহার স্নেহপিয়াসী চিত্ত, সহজেই গলিয়া গেল। অযাচিত করুণা, সে বিধাতারই দান! নহিলে প্রয়োজন-কালে এমন স্নেহময় হৃদয়ের স্পর্শ, অযোগ্য সে—কোন্ গুণেই বা বার বার লাভ করে!

প্রিয়নাথ বাবুও তাহাকে এম্-এ পড়িবার পরামর্শ দিলেন। একটা প্রোফেসারি অন্ততঃ পাওয়া সম্ভব হইবে—আইন পড়িয়া উকীলদের যা' অবস্থা! ঘরে সচ্ছলতা থাকিলেও ঝকমারির ব্যবসায় না করাই ভাল। ছিপ ফেলিয়া অটুট ধৈর্য্যে বসিয়া থাকিতে পারিলে হয়ত জীবনের সন্ধ্যা বেলায় রুই কাতলা পড়িতে পারে! কিন্তু সে অটুট ধৈর্য্য—যাহাকে এখনই সংসার চিন্তা করিতে হইবে—তাহার জন্য নয়।

মাষ্টার মহাশয় বাড়ীতেই থাকিবেন শুনিয়া প্রদ্যুম্ন ও বরুণা খুসী হইয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষের সজ্জাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

অরুণ জানিত না, ছুটির সময় বরুণার বিবাহের দিনস্থির হইয়া গিয়াছে। ২২শে শ্রাবণ তাহার শুভ-বিবাহের দিন। পাত্র চন্দনার জমিদারের ছেলে সত্যব্রত। সত্যব্রতের সম্বন্ধে অরুণ বেশী কিছু জানিত না। যেটুকু জানিত, তাহাতে তাহাকে আত্মম্ভরী, রূপ ও ধনগর্ব্বিত যুবা বলিয়াই

তাহার ধারণা ছিল। ইন্‌টার-মিডিয়েট্ ফেল করিয়া সে কলেজ ছাড়িয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তা'র পর এ কয় বৎসরের মধ্যে তাহার কোন সংবাদই আর সে পায় নাই—লয়ও নাই। এমন শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়েটির স্বামী-নির্ব্বাচন উপযুক্ত রূপ হয় নাই বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় অরুণ এ সংবাদে মন খুলিয়া তেমন আন্তরিক আনন্দ জানাইতে পারলি না।

বরুণার সহিত দেখা হইলে সে তাহাকে প্রণাম করিয়া নত মুখে একটুখানি লজ্জা-বিজড়িত মিষ্ট হাসি হাসিল। এই কয় দিনের ব্যবধানে সে যেন অনেকখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে। আনন্দের ফাগুণ-রাগ তাহার দেহে-মনে ইহার মধ্যেই যেন রাঙ্গা আলো ছড়াইয়া দিয়াছে। হাসিতে, ভঙ্গিমায়, কথায় তাহারই ঝল-মল কিরণ ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। হাতে গড়া স্নেহ-পাত্রীটির জন্ম মনে মনে সে একটু উদ্বিগ্নও হইল। সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মনে মনে কহিল,—'তোমার কল্পনার স্বর্গ যেন মিথ্যা না হয়! ভগবান্ তোমার ভবিষ্যৎ সুখময়, আনন্দময় করুন'! বরুণার লজ্জা-জড়িত মৃদু হাসিটুকু তাহার মিষ্ট লাগিলেও—সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও দিল। কৈশোরের সুখ-নিকেতন ছাড়িয়া এবার যে অজানা স্থানে সে সত্যের সংগ্রামে চলিয়াছে, সেখানে জয়ী হইতে পারিবে কিনা, কে জানে? অমনি মধুর হাসিটি ভবিষ্যতেও তাহার থাকে যেন, ভগবান্!

অরুণের মনে হইল, এবার 'ফিরিয়া গিয়া হয়ত দেখিবে, হিমুও এমনই করিয়া তাহার কাছ হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে!

ভাগ্য-নির্ণয় হইয়া গেলে সে নিশ্চিন্ত মনে পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। প্রফুল্ল প্রথমটা এ ব্যবস্থায় বাধা দিয়াছিল। কিন্তু যখন শুনিল, প্রত্যুম্নের তত্ত্বাবধান ও প্রিয়নাথ বাবুর লোক-সঙ্গস্পৃহা শুধু ছলের কথা, আসলে এ ব্যবস্থা অরুণেরই জন্য—তখন সেও আর আপত্তি করিল না। গৃহস্থ ঘরে, বিশেষ এমন সহৃদয় পরিবারে, থাকায় অরুণের শরীরের পক্ষেও

উপকার হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়াই সে আরও মত দিল। মানুষের ভালবাসা পাওয়া মানুষের কাছে যে কত মূল্যবান, তা' সে বেশ জানে।

এই সময় জলদ ডেপুটির পদ পাইয়া চট্টগ্রামে গেল। বন্ধুর উন্নতিতে আন্তরিক আনন্দ জানাইয়া অরুণ তাহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিল। বিদেশে দুদ্দিনে সে জলদের কাছে অযাচিত অনেক সাহায্যই পাইয়াছে। আজ তাহার একজন প্রকৃত বন্ধু দূরে চলিয়া গেল—কে জানে আবার কবে তাহার সঙ্গে দেখা হইবে!

তাহার কোন উল্লেখও সে অস্থানে প্রকাশ করিল না। মন যদিও তাহার প্রফুল্লর অনুসন্ধানের জন্য ব্যগ্র হইতেছিল—তবু এতগুলি দেবদর্শনাশাব্যাকুল চিত্তের অনুরোধ সে প্রত্যাখান করিতেও পারিল না। ইহারা যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বসিয়া আছেন—এখন সে আর না বলে কেমন করিয়া? ফিরিয়া আগে বন্ধুর সংবাদ লইয়া তবে সে নিজের কাজে মন দিবে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীতে

কাশী আসিয়া হিমুর আর আনন্দের সীমা ছিলনা। চারিদিকে দেব-মন্দির, সকাল সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে নহবৎ বাজে। বোম্ বোম্ হর হর শব্দে গঙ্গাস্নানার্থীরা পথ চলেন। চারিদিকে ভক্তি ও আনন্দের সুর। গঙ্গার স্নিগ্ধ নির্ম্মল জলে গা ডুবাইয়া চারিদিকের উন্নত মন্দিরচূড়ার পানে চাহিয়া কি একটা অভিনব আনন্দ ও ভক্তির ভারে হিমুর সারা দেহ ভাবতরঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ হইয়া উঠিত। মনে হইত অরুণদার ছুটি যদি খুব—খুব দীর্ঘকাল হইত—কেমন মজাই তবে হইত। কাশী ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিতেও তাহার যেন ভাল লাগিত না। অরুণকে সঙ্গী করিয়া সকাল বিকাল ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইত।

"কাশীখণ্ড" পড়া থাকায় দেব দেবীদের নাম, ধাম,, অবস্থা, ইতিহাস অনেক বিষয়ই মুক্তাঠাকুরাণীর কণ্ঠস্থ ছিল। তাছাড়া পূর্ব্বেও তিনি আর একবার এই দেবধামে ঘুরিয়া গিয়াছেন। অরুণ তাহাদের অভিভাবক রূপে ব্যবহৃত হইলেও আসলে 'সেথোর' কার্য্য তিনিই করিতেছিলেন। হিমুর দেখিয়া দেখিয়া আর আশা মিটিতেছিল না। একই মন্দির দুইবার তিনবার করিয়া সে দেখিতে যায়। ক্রমে অরুণের ছুটি ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া মুক্তাঠাকুরাণী ত্বরা দিয়া কহিলেন, "চট্‌পট্ এইবার সেরে নাও বাছা, এখনও ওদিকটা সবই বাকী রইল যে। দুর্গামন্দির, মনস্কামনেশ্বর, জগন্নাথদেব, অসিমাধব বড় বড় ঠাকুরই সব বাকী রয়েছেন। এমন করে খুঁটিয়ে দেখ্‌তে গেলে কি ফুরাবে কখনও!"

স্থির হইল পরদিন দুর্গাবাড়ী হইয়া জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া যাইবে। তাঁহাদের বাসা বাঙ্গালীটোলায়, পথ অনেকখানি, একটু সকাল সকাল বাহির হওয়া চাই।

কাশী সহরটি যথেষ্ট বড়—চকে বিস্তর দোকান, পাথরের বাড়ী, মন্দির। রাজপথের দু'ধারে সারিবন্দী বিপনি শ্রেণী। ইহাদের কোথাও বর্ণ-বহুল ফল, ফুল, ফুলের মালা সাজান। কতকগুলি জুতার দোকান। কাপড়ের দোকানে নানাবিধ পাড় ও খোলের চুনরী, বেনারসী, বৃন্দাবনী—কত রকমারি সাড়ী ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। ছিটের ফ্রক, ব্লাউস্, সার্ট্, কোট, পিনাফোর, রঙ্গিন পাতলা কাপড়ের কৃত্রিম পত্রপুষ্প-খচিত বিলাতী বনেট ও এখানকার দোকানদার ও খরিদ্দারের হাত এড়ায় নাই। যে দিকে চাও চোখ যেন ঝলসাইয়া যায়—কিন্তু যথার্থ আনন্দ হয় কি না বোঝা যায় না! সুদৃশ্য সুমার্জ্জিত পিতলের সিংহাসন, বাক্স, গালার চুড়ি, সুগন্ধি জরদা, দোক্তা, সুরতীর গুলি, কাঠের খেলনা—এই গুলিই কাশীর বিশেষত্ব। পথিকেরা সব হর্ষোৎফুল্ল—অধিকাংশ লোকেরই হাতে জল-পাত্র, পরণে ক্ষৌমবস্ত্র, দেখিলেই দেবমন্দিরের যাত্রী বলিয়া বুঝা যায়। হিমু স্বপ্নপূর্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে সবটুকুই লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, তাহার চক্ষে এ সমস্তই অদৃষ্টপূর্ব্ব!

মুক্তা ঠাকুরাণী প্রত্যেক ছোট খাট মন্দিরে ঢুকিয়া পথের ধারে জড় করা নোড়া নুড়িতেও একটুখানি জলের ছিটা দিয়া মালতীকে বলিতে ছিলেন—"যদি মানস কর্‌বার কিছু থাকে ত এই বেলা ভাল করে করেনে, রাণু! এঁরা এক এক জন সকলেই জাগ্রত দেবতা! দেখিস্ বাছা কাউকে যেন ছোট বড় করিস্‌নে—বাবা, মা, তোমরা সব আমার রাণুর মনস্কামনা পূর্ণ কর। আমরা আবার এসে তোমাদের পূজো দিয়ে যাব।"

মনস্কামনা পূর্ণের এ ইঙ্গিত মালতীরও বেশ জানাই ছিল। মেয়ের

জন্য বর প্রার্থণাই যে তাঁহার উপস্থিত কাম্য, কর্ম্মের মধ্যে প্রধানতম, তাহা তিনি ভালই জানেন। তবু সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে বিরক্ত বিষন্ন চিত্ত—এ আনন্দ ধামে—তাহার সে দুঃখের পশরা যেন নামাইতে চাহিতেছিলনা। তৃপ্তমন পরিপূর্ণ আনন্দে কেবলি যেন বলিতে চাহিতেছিল, 'আর কিছুই চাহিনা, কিছুই না—শুধু তোমাকেই যেন চাহিতে পারি। সব অভাব মন হইতে দূর হইয়া যাক! এ শান্তির সিংহাসনে শুধু তুমি থাক—আমার অন্তঃকরণের সবখানি জুড়িয়া!' তা'ই মামীমার আদেশ অনেক সময় কাণে পৌছাইলেও মনে ঠিক পৌছিতেছিল না। প্রার্থণার ভাষা হারাইয়া গিয়া মন যেন নিঃসংজ্ঞ হইয়া গিয়াছিল।

অরুণ তাঁহাদের একস্থানে অযথা বিলম্বে ব্যস্ত হইতেছিল। দুর্গা-মন্দিরে অঞ্জলি প্রদানান্তে মালতী তন্ময় হইয়া দেবী-মুখপানে চাহিয়া যুক্ত করে বসিয়া থাকায়, মুক্তা ঠাকুরাণী দ্রুত অঙ্গুলি চালনায় নির্দ্দিষ্ট জপ সংখ্যার কতকটা সারিয়া লইতে ছিলেন ও ভাবিতেছিলেন—আবার বাড়ী ফিরিয়া রান্না খাওয়ার অয়োজন ত আছেই। আজ আবার ফিরিবার পথে কিছু আনাজ পাতিও কিনিয়া লইতে হইবে। ঘরে যাহা আছে 'অকুলান' হইবে। হিমানী মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একদল যাত্রী মন্দির প্রদক্ষীণ করিয়া ফিরিতেছিল,—সেও তাহাদের দলে মিশিল দেখিয়া অরুণকেও অগত্যা তাহার অনুসরণে বাধ্য হইতে হইল। যে মেয়ে সে—এখনি ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিবে—কাণ্ডজ্ঞান ত কিছুই নাই তাহার?

মন্দির প্রদক্ষিণ হইলে অরুণ চাহিয়া দেখিল মন্দির-দ্বারে জনতা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সিন্দুর ও গাঁদাফুলের মালায় চর্চ্চিত হিমুকে বাহিরে যেখানে দোকানীরা ফুলেরমালা, ফুল, বেলপাতা ও বাতাসা, কলা, সিন্দুর, পেঁড়া, ছোট ছোট মাটির খুরি ও সরায় পূজার উপকরণ 'ডালি' সাজাইয়া

বসিয়াছিল,—সেইখানে শিষ্টভাবে অপেক্ষা করিবার অনুরোধ করিয়া সে পুনরায় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল।

মালতী ও মুক্তা ঠাকুরাণীকে ভিড়ের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া বাহিরে আসিয়া অরুণ দেখিল হিমু তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া যথানির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া নাই। দেখিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী 'পুরুষালী' মেয়ের বিরুদ্ধে মালতীকে শুনাইয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর এই অন্যায্য স্বভাবের জন্য ভবিষ্যতে কোনদিন যে তাহার ললাটে বিস্তর দুঃখ সঞ্চিত আছে—তাহারও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া চিন্তাভারাতুর মায়ের মনে আশঙ্কা উদ্দীপিত করিবার প্রয়াসে সচেষ্ট হইলেন।

অরুণ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দুর্গাকুণ্ডের দিকে তাঁহাদের দেখাইয়া দিয়া কহিল, "আপনারা ঐখানে গিয়ে দাঁড়ান একটু, আমি তাকে এখনি খুঁজে আনচি। খুব সম্ভব সে ঐ ভিড়ের মধ্যে গান শুন্‌তে ঢুকেচে।" মুক্তা ঠাকুরাণী মালতীকে অগ্রবর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়া হিমুর উদ্দেশে বিরক্তিপ্রকাশ করিতে করিতে কুণ্ড অভিমুখে চলিয়া গেলে অরুণ হিমুর সন্ধানে মন্দির পার্শ্বে যেখানে জনতামধ্য হইতে গানের শব্দ আসিতেছিল সেইদিকে চলিল।

এক জায়গায় দুইজন লোককে দাঁড়াইতে দেখিলে তৃতীয়ব্যক্তিকেও অকারণেও একবার সেখানে দাঁড়াইতে হয়—ক্রমে চতুর্থ পঞ্চম করিয়া জনতা যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে, দ্রষ্টব্য যতই অদৃষ্ট হয়—মানবের দেখার বা শুনার কৌতূহল সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটিয়াছিল। গায়ককে দেখা যাইতেছিল না, কেবল ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির ধুম লাগিয়া গিয়াছিল। যে গান করিতেছিল, সে একজন অন্ধ গায়ক। যদিও সে বাংলা গান গাহিতেছিল, তবু কণ্ঠস্বরে তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইতেছিল না। গায়ক বেহালা বাজাইয়া গাহিতেছিল,—

"শুধু আসনপাতা হ'ল আমার সারাটি দিন ধ'রে।
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা তারে ডাক্‌ব কেমন ক'রে?
আছি পাবার আশা নিয়ে তারে হয়নি আমার পাওয়া—"

গায়কের কণ্ঠস্বর যেমন মিষ্ট,—স্বরবোধও তেমনি অসাধারণ। শিক্ষিত-কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রোতৃ-বর্গকে মন্ত্র মুগ্ধ করিয়া কখনো নিম্নে গড়াইয়া কখনো ঊর্দ্ধে উঠাইয়া আকাশ বাতাসকে যেন প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিল। অরুণ ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন নিজের প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়াছিল। গায়কের সম্মুখে একখানি মাটীর সরা—তাহাতে পয়সা, আধ্‌লা, দু'চারিটি আনি দুয়ানিও জমিয়াছে।

হিমুও এই ভিড়ের মধ্যে একপাশে স্থান করিয়া লইয়া গান শুনিতেছিল। এইবার ফিরিবার কথা মনে পড়ায় সে অগ্রসর হইয়া হাতের অবশিষ্ট দুয়ানিটি গায়কের মৃৎ-স্থালীতে ফেলিয়া দিয়া দেবতার প্রসাদী শালপাতা মোড়া পেঁড়া দুইখানিও তাহার মধ্যে রাখিয়া দিল। সে ফিরিতে গিয়া শুনিতে পাইল, "আহা মেয়েটি ত বড় দয়াময়ী? মা! ভগবান তোমার মঙ্গল কর্‌বেন।"

এ আশীর্ব্বচন কাহার? ভিক্ষাপ্রাপ্ত অন্ধের ত নহে? হিমু বিস্মিত-ভাবে চাহিয়া দেখিল, এক গেরুয়াধারী সৌম্যদর্শন পুরুষ ও এক বিধবা নারী তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। সঙ্গীত-মুগ্ধ হিমু এতক্ষণ তাঁহাদের অবস্থান উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

প্রথম প্রথম সে সন্ন্যাসী দেখিলে ভয় পাইত। তাহাদের গ্রামে সন্ন্যাসী বড় একটা দেখা যাইত না। ছোট বেলায় সে শুনিয়াছিল জটাধারীরা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখিলেই ধরিয়া নিজেদের ঝুলির মধ্যে পুরিয়া লয়েন। হিমু তখন বস্তুতত্ত্ব জানিত না। সুতরাং একটিমাত্র সাধারণ ঝুলির ভিতর কেমন করিয়া যে ক্রমাগতই ছেলে ভর্ত্তি হইতেছে—এ সংশয় বা তৎসংক্রান্ত

বিতর্ক ইহার কিছুরই সে আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ এ ভ্রম তাহার ভাঙ্গিয়া গেলেও ভক্তির সহিত ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ভয়েরও আধার—এ বিশ্বাস এখনও তাহার বলবৎ রহিয়াছে। এখানে পথে ঘাটে মন্দিরে সর্ব্বদা সন্ন্যাসী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, পরমহংস প্রভৃতি দেখিয়া দেখিয়া তাহার ভয়ের ভাব অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল। মা দিদিমার অনুকরণে সুবিধা পাইলে সেও এখন সন্ন্যাসী দেখিলে গলবস্ত্রে প্রণাম করে। তবু এই গেরুয়াধারী সৌম্যসুন্দর মূর্ত্তির পানে বারেক চাহিয়া দেখিয়াই হিমুর মনে কেমন একটা ভক্তির সহিত আনন্দের ভাবও জাগিয়া উঠিল। সে গলায় আঁচল বেড়িয়া জনতার মধ্যেও কোনমতে সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় মাথা ঠেকাইল। পার্শ্ববর্ত্তিনী বৃদ্ধার সাদা কাপড়ের জন্য সে তাঁহাকে প্রণাম করা প্রয়োজন বোধ করিল না। ভক্তির আবশ্যকতা যে আমরা অনেকখানি বাহিরের পরিচ্ছদ দেখিয়া নির্দ্ধারন করি? গেরুয়াধারী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহমধুরস্বরে কহিলেন,—"মা—লক্ষেশ্বরী হও। দীনের প্রতি চিরদিন যেন তোমার দয়া থাকে!"

বৃদ্ধা কহিলেন,—"মেয়েটি বড় সুন্দরী!"

গেরুয়াধারী কহিলেন, "শুধু সুন্দরী নয়—মা সর্ব্বসুলক্ষণা!"

হিমু ঘন ঘন বাহির হইবার পথপানেই তাকাইতেছিল। অভিপ্রায় দু'একজন সরিয়া একটু স্থান করিয়া দিলেই সে বাহির হইয়া পড়িবে। অরুণ ফিরিয়া তাহাকে না দেখিয়া না জানি কতই বিরক্ত হইয়াছে। তা' ছাড়া অপরিচিতের মুখে আত্মপ্রশংসা শুনিতে তাহার লজ্জাও করিতেছিল। হিমুর আবার এত লজ্জা জন্মিল কবে? অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রকৃতিঠাকুরাণীর অসাধ্য কিছুই সংসারে নাই। বয়োবৃদ্ধি জনিত মনোভাবের পরিবর্ত্তনের সহিত আলোকনাথের ব্যবহারে এবার স্বভাবচঞ্চলা

বালিকা হিমুকেও অনেকখানি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। বাহিরে তাহার বালিকাভাবের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা না গেলেও মনে মনে সে এখন সংসারকে চিনিতে ও বুঝিতে শিখিতেছিল।

হিমুর উদ্বেগ-চঞ্চল দৃষ্টি অরুণের উপর পতিত হইতেই সে তাড়াতাড়ি আগাইয়া ভিড় ঠেলিয়া তাহাকে বাহির হইবার পথ করিয়া দিল। বাহিরের মুক্ত বায়ুতে আসিয়া ভিজা চুলের গোছা হাত দিয়া জড়াইয়া লইয়া হিমু হাসিমুখে কহিল, "ভাগ্যে তুমি এলে অরুণদা! নৈলে গিয়েছিলেম্ আর কি? কেমন করেই যে বের হতাম!"

"কেন! যেমন করে ঢুকেছিলে!" বলিয়া অরুণ তাহার পরিশ্রমের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুখ ভার করিয়া রহিল। কিন্তু তা' দেখিয়া হিমুর মনে যা'ই হোক্ মুখে সে তাহা ফুটাইল না, তেমনি সপ্রতিভ হাসি-মুখেই কহিল,—"বাঃ রে, তখন বুঝি এমন ভিড় ছিল! অরুণদা, ঐ সন্ন্যিসী আর বুড়ীটি আমাদের দিকে কি রকম করে দেখ্‌চেন দেখ!"

হিমুর দৃষ্টির অনুসরণে অরুণ চাহিয়া দেখিল—রাস্তার অপর দিকে দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধা-নারী অনিমেষ বিহ্বলদৃষ্টিতে তাহার পানেই চাহিয়া আছেন। সে চোখের পানে চাহিয়া অরুণের সারাদেহ কি এক ভাবাবেগে কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল—এ দৃষ্টি যেন তাহার বড় পরিচিত। সে যেন যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অমনি করিয়া উহারই ঐ দু'টি স্থির শান্ত অথচ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির লক্ষ্য হইয়াই আসিতেছে! স্বপ্নময়, ভাবময়, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময়, দুঃখ—বিস্ময়—বিস্মরণময়—সে দৃষ্টি যে কি তাহা সে যেন বুকের ভিতর দিয়া প্রাণের ভিতরে অনুভব করিতেছিল অথচ কিছুই বুঝি অনুভব করিতেছিল না। মানুষকে মেস্‌মেরাইজ্ করিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়—হয় ত এও সেই একই ভাব! তেমনি অননুভূত স্বপ্নপূর্ণ অভিনব আনন্দ ও বিষাদের শীতল আক্রমণ সারাদেহে মনে যেন ধীরে ধীরে বেষ্টন করিয়া

ধরিতেছিল। বৃদ্ধার দক্ষিণপার্শ্বে পিতলের কমণ্ডলু হস্তে ঐ যে গেরুয়াধারী সৌম্য-সুন্দর মূর্ত্তি! কে ইনি? অরুণের পরিচিত কেহ কি হইবেন? কে জানে কে—স্মরণ ত হয় না! তবু মন কেন ছুটিয়া ঐ দু'খানি ধূলি-ধূসরিত চরণতলেই লুটাইতে চাহিতেছে? অরুণ ব্যাকুলভাবে নিজ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। মনকে বুঝাইতে চাহিল, হয়ত এই কাশীর পথেই আর কোনদিন ইঁহাদের সে দেখিয়া থাকিবে। হয় ত তেমন করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। এমনি আবছায়ার মত সেদিন ভাসা ভাসা দেখিয়াছিল, তা'ই ভাল স্মরণ হইতেছিল না। তাহাই হইবে। কি আশ্চর্য্য! এই সহজ তথ্যটি বুঝিতেও এত সময় লাগে? কিন্তু কাশীর পথে ত সন্ন্যাসীর অভাব নাই। পথের ধূলায় পড়িয়া কয়জনের পায়ে লুটাইবার তাহার সাধ হইয়াছে? এ চিন্তাটিকেও সে প্রশ্রয় দিলনা। পথে 'নোড়ানুড়ী' অনেক থাকে। তা'ই বলিয়া সকলকেই ত আর 'বিশ্বনাথ' বলিয়া অন্তরের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য রচনা করিয়া দিতে সাধ হয় না,—ভক্তি তাহার যোগ্য আধারেই আশ্রয় লয়। হয় ত ঐ মহাপুরুষে ভগবানের কিছু বিভূতি আছে। নহিলে এমন ভাবই বা অনুভব হইবে কেন?

হিমুকে ত্বরা দিয়া সে অগ্রসর হইল।

রৌদ্রের তাপ বাড়ায় মুক্তা ঠাকুরাণী মালতীকে লইয়া দুর্গা-কুণ্ডের অনাবৃত ভূমি ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আজ তাহাদের অযথা বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে সারাটা দিনই হয়ত বকুনি খাইয়া কাটিয়া যাইবে—মনকে এই সব বিভিন্ন-চিন্তার অবসর দিবার চেষ্টা করিয়াও অরুণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিল না। চলিতে চলিতে ক্ষণে ক্ষণে সে মুখ ফিরাইয়া চকিত-দৃষ্টিতে পূর্ব্ব-দৃষ্টদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে যে ঠিক ইচ্ছা করিয়াই চাহিতেছিল তাহা নয়—সে যেন না চাহিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। সে দেখিল—সেই বৃদ্ধা নারীও তেমনি করিয়াই অপলক-নেত্রে তাহারই

দিকে চাহিয়া আছেন। গেরুয়াধারীরও কোমল স্নেহময়-দৃষ্টি তাহার উপরেই সংন্যস্ত। সে দৃষ্টির লক্ষ্য হইতে সুখ কি দুঃখ, আনন্দ বা বিষাদ—কি যে তাহার মনে উঠিতেছিল, সে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কেবল এইটুকু বুঝিতেছিল, যে ইঁহাদের সান্নিধ্য সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। এখান হইতে পলাইয়া যাওয়াই তাহার এখনকার একমাত্র কাম্য কিন্তু তবু পা যে চলিতে চাহে না? দৃষ্টি সেই অনীপ্সিতদেরই পুনঃ পুনঃ দেখিতে চাহে। অরুণ লক্ষ্য করিয়াছে—সুন্দরী হিমু-ই তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। তা' যদি হইত,—তবু কিছু অর্থ বুঝা যাইত! কিন্তু দীনহীন অরুণের পানেই যে উঁহারা চাহিয়া আছেন ইহারই বা অর্থ কি? কি আছে তা'র? কেনই বা তাহাকে দু'জন অপরিচিত লোকে অমন করিয়া দেখিতেছেন?

চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী অরুণের উদ্দেশ্যে হিমু কহিল,—"হোলো কি তোমার অরুণদা? তুমি যে আজ চলতেই পাচ্চ না! আমি ত ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলেছি, তবু তুমি পেছিয়ে পড়চো যে? শোধ নিচ্চ নাকি আমার গান শোনার?"

উত্তর না পাইয়া—এবার সে অরুণের বিবর্ণ ম্লান-মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "ওমা! তোমার মুখ চোখ অমন হয়ে গেছে কেন? অসুখ কচ্চে না কি? পায়ে লাগ্‌লো বুঝি, কিছু—দেখি?" বলিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইতে, অরুণ গম্ভীর আদেশব্যঞ্জকস্বরে কহিল,—"এগিয়ে চল—মা ব্যস্ত হচ্চেন কত।" নিজের সম্বন্ধে সে কোনই উত্তর দিল না। তাহার গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া হিমুও দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। সদা প্রসন্নচিত্ত শান্ত-মূর্ত্তি অরুণদা'র মুখের এ ভাব ও কণ্ঠের এ সুর যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত—তা'ই সে বিস্মিতের অপেক্ষা ভীতই হইয়াছিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সংশয়-দোলায়

"মা! শরীর কি বড় বেশী খারাপ মনে হচ্ছে? আর খানিকটা যেতে পারলে স্বামী-ভাস্করানন্দের মন্দির দেখে সেখানেই একটু বিশ্রাম করেনিতে পারতে। পারবে কি তা?" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত গেরুয়াধারী পুরুষ সঙ্গিনী বৃদ্ধার পানে চাহিয়া দেখিলেন।

রমণীর বিস্ময়-মথিত ব্যাকুল অনিমেষ-দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্ট-পদার্থের পানেই তখনও অচল হইয়া বাধিয়াছিল। ছেলের কথা যে তাঁহার কাণে গিয়াছে এমন বুঝাইল না। ইহা দেখিয়া তিনি মাতৃ-দৃষ্টির অনুসরণে চাহিয়া দেখিলেন—ক্ষণপূর্ব্বদৃষ্টা সেই সুন্দরী মেয়েটির পাশে দাঁড়াইয়া সেই সুন্দর তরুণ যুবা তাঁহাদের দেখিতেছে। সংসারে সৌন্দর্য্যের উপাসক কে নয়? রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় সকলেই। রূপ বিধাতৃ-সৃষ্টির উৎকৃষ্ট অংশ। মানুষ সুন্দরকে ভালবাসিয়াই চিরসুন্দরকে লাভ করিতে পারে!

এই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিনাশী শক্তি দেখিয়া যদি তাহার নিন্দা করিতে চাও তবে ভুল করিবে। মানুষ নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে আপন আপন দুঃখের সৃষ্টি করে। যে নারী-সৌন্দর্য্যের মোহে জগতে কত বিপ্লব বাধিয়াছে, কত সুখের রাজ্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কত শত দুরপনেয় মসীরেখা আঁকিয়া দিয়াছে—সেই নারীরূপই আবার শুদ্ধচিত্তের দৃষ্টিতে বিশ্বজননীর সাক্ষাৎ কল্যাণময়ী-মূর্ত্তি বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। সংসার-বিরাগী ও সংসার-অনুরাগীর রুচির পার্থক্য

যত বড়ই থাক, তবু দু'জনেই সুন্দরকে দেখিতে ভালবাসেন—দেখিলে আনন্দলাভ করেন। সাধক তাঁহার চিরসুন্দরের মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়াই অনুভব করেন। সংসার-বিরাগীর শান্ত-দৃষ্টি দুইটি সুন্দর মুখের পানে নিবদ্ধ হইয়া সহসা যেন প্রীতিরসে সিক্ত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "কি দেখ্‌চ মা—হরগৌরী-মূর্ত্তি? কিন্তু আমি বোধ করি ভুল কল্লেম। মেয়েটির মাথায় সিন্দুর দেখ্‌চি না ত! ভাই বোন হবেন।"

মা'র দৃষ্টি এতক্ষণে স্বপ্নরাজ্য হইতে যেন ধীরে ধীরে বাস্তবে ফিরিয়া আসিতেছিল। গভীর আবেগপূর্ণ-স্বরে মা কহিলেন, "চব্বিশ বছর আগের চোখ নিয়ে এ আমি কাকে দেখ্‌চি—গৌরি? মাঝখানের কুড়ি বছর তার প্রত্যেক ভয়ানক দিনটি নিয়ে কি সত্যি সত্যিই কেটে যায় নি?"

রমণীর দেহ হৃদয়াবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। মনে হইল তিনি তখনই পড়িয়া যাইবেন।

পথে কাছাকাছি কোথাও ছায়া-শীতল স্থান নাই। রাস্তার ওপারের বড় বড় বাগান-বাড়ীগুলির পশ্চাদ্ভাগ রাস্তার দিকে থাকায় বাগানের প্রাচীর-বেষ্টনীর উপর দিয়া কোন কোন গাছের শাখা রাস্তার দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহারই অল্প একটুখানি ছায়া রৌদ্র-তপ্ত-পদ পথিককে সময় সময় আপনার শীতল আকর্ষণে টানিয়া আনিত। মন্দিরে ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া কাছে আর কোথাও ছায়াময় আশ্রয় স্থান ছিল না। পুত্র মনে মনে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "মা, আমার কাঁধে মাথা রাখ। আস্তে আস্তে চল, আমরা 'ঐ পাঁচিলের ধারে একটু বসি। কাল একাদশী গিয়েছে, আজ এতখানি পথ তোমায় হাঁটিয়ে এনে ভাল কাজ করি নি। চল্‌তি গাড়ী পেলেই একখানি ডেকে নেব।"

রমণী তেমনি কাঁপিতে কাঁপিতেই কহিলেন "ওকে তুমি জিজ্ঞাসা কর

গৌরি—ও কে? অনেক বছরের অনেক চোখের জল পড়ে চোখ আমার দৃষ্টিহারা,—তবু সে ভুল করবে না। হয় আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি,—নয়—নয়—জানি না আমি কি বল্‌বো তোমায়!"

"মা—শান্ত হও! বসো। এইখানেই তুমি আমার কাঁধে মাথা রেখে বসো। স্বপ্নই তুমি দেখ্‌চো মা! যা চিরকালের জন্যে চলে গেছে, তা ফিরে আস্‌বে না। যা বিশ্বনাথকে দিয়েচ, তা আর ফিরে চেও না। সে এখানে না থাক্—সেখানে আছে। ফিরে তাকে আমরা একদিন পাব বইকি? মিথ্যে আশা করে দুঃখ পেও না!"

"গৌরি! গৌরি! ওরে না রে,—সে আছে—সে এই খানেই আছে! সেই চোক, সেই মুখ—সেই তোর মতন মিষ্টি হাসিটি"—

ধীরে ধীরে তাঁহার মাথাটি গৌরীপতির কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। গৌরীপতি দেখিলেন—মা'র সংজ্ঞা নাই। ধৈর্য্যশালী পুত্র বিচলিত হইলেন না। কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া অল্প অল্প চোখে ও মুখে ছিটা দিয়া উত্তরীয়ের বাতাস দিতে দিতে অল্প কিছুক্ষণ পরে রমণীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। চোখ মেলিয়াই ব্যাকুল-দৃষ্টিতে যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। পুত্র নত হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "তারা চলে গেছে মা!"

মা একটা গভীর পরিতাপের নিশ্বাস ফেলিলেন। অনেকক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেল।

মন্দির-ফেরৎ যাত্রীর দল, পথবাহী লোকেরা অনেকেই তাঁহাদের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। যাহাদের কৌতূহল অধিক তাহারা কাছে আসিয়া বৃদ্ধার কি হইয়াছে খবর লইতেছিল। কেহ সহানুভূতি দেখাইয়া, "আহা, বুড়ো মানুষ, রোদটা আজ হয়েচেও তেম্‌নি" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কেহ গৌরীপতির বুদ্ধির নিন্দা করিয়া, দ্বাদশীর দিন উপবাস-পীড়িতাকে টানিয়া আনা ভাল হয় নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চলিয়া

যাইতেছিল। এমনভাবে পথের ধারে লোকের কৌতূহলোদ্রেকের বিষয় হইয়া বসিয়া থাকা গৌরীপতিরও ভাল লাগিতেছিল না। এতক্ষণের পর একখানা ভাড়াটিয়া খালি গাড়ী যাইতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে ভাড়া যাইবার জন্য বলিলেন। গাড়ী আসিলে মাকে সাবধানে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া নিজেও উঠিয়া বসিলেন।

কিছু পথ দু'জনেই চুপ্ করিয়া ছিলেন। গাড়ী দশাশ্বমেধের রাস্তা ধরিলে মা একটা ক্লান্ত-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তারা চলে গেল—কিছু জিজ্ঞাসা কল্লিনে গৌরি!"

"না মা" বলিয়া গৌরীপতি রৌদ্র-পূর্ণ ধূলি-ধূসরিত রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সারা-পথ মা ও ছেলের মধ্যে আর একটিও কথা হইল না। গৌরীপতি ভাবিতেছিলেন—মা ভ্রান্ত হইয়াছেন, যা' হারায় তা' আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। বৃথা আশায় মানুষ নিজের দুঃখকে কেবল বৰ্দ্ধিতই করে। তা'ই দুরাশা সকল সময়েই পরিত্যজ্য!

মা ভাবিতেছিলেন—"সে আছে, সে আছে। একদিন সে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে,—বিশ্বনাথ তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্যই বুঝি তাঁহাদের আহ্বান করিয়া এতদূরে আনিয়াছেন। নহিলে একি অচিন্তনীয় দর্শন! এমন অভিন্ন পিতৃ-মূর্ত্তিতে দেখা না দিলে তিনিও ত তাহাকে চিনিতেন না? কিন্তু হাতে পাইয়াও হারানিধি কি তাঁহারা ছুড়িয়া ফেলিলেন? হে বিশ্বনাথ! দয়াল! দিনবন্ধো! যদি চোখের দেখা দেখিতে দিলে, তবে সত্য যে কি তাহাও বুঝাইয়া দাও। প্রভু! হাতে না দাও—নাই দিও, তবু জানিতে দাও—সে আছে। তোমার এত বড় বিশাল-রাজ্যে মাতৃহীন ক্ষুদ্র শিশুর স্থানাভাব হয় নাই! এইটুকু,—শুধু এইটুকু সান্ত্বনাই তুমি ফিরাইয়া দাও!"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হারানিধি

সেদিন বাড়ী ফিরিবার পথে অরুণ এমনই অন্যমনস্ক হইয়া রহিল যে 'আনন্দ বাগ' কখন ছাড়াইয়া আসিল সে জানিতেও পারিল না। মোড়ের মাথায় অপ্রসন্ন-মুখে মুক্তা ঠাকুরাণী ও মালতী দেবী অপেক্ষা করিতে ছিলেন। তাহাদের আসিতে দেখিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী কহিলেন,—

"তবু ভাল! আমি ভাব্‌ছিলেম—ঘরবাড়ী পেতেই বা বসে গেলে কোথাও? ভ্যালা মেয়ে যা হোক্ তুই,—হিমি! তোর খুরে খুরে দণ্ডবৎ! সবই কি সৃষ্টিছাড়া তোর?"

অরুণ নিরুত্তরে চলিতে লাগিল। হিমু কহিল, "তুমি এগিয়ে চল ত দিদি-মা, ভাল ভাল সন্ন্যাসী দেখ্‌ছিলেম, দেরী হয়েচে, তার জন্যে আর হয়েচে কি? তুমি সন্ন্যাসী দেখ্‌লে দাঁড়াও না? সেদিন বেনীমাধবের ধ্বজায় ওঠাই হোল না—কার জন্যে?"

মুখরা নাতিনীর সহিত পথে কলহ করিবার ইচ্ছা না থাকায় মুক্তা-ঠাকুরাণী মালতীর উদ্দেশ্যে ক্ষোভপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন,—"শোন্ রাণু! তোর মেয়ের বাক্যি শোন্!"

মালতী মেয়ের পানে বারেক ফিরিয়া মৃদু অনুযোগের সুরে কহিলেন, "হিমু!"

"এই ত যাচ্চি মা" বলিয়া হিমু এবার 'হন্ হন্' করিয়া সকলের আগে আগে চলিতে সুরু করিল। কিন্তু পণ রক্ষা তাহার ঘটিয়া উঠিল

না—তাহা কোন দিনই প্রায় ঘটে না। তাহার মনে হইতেছিল—'মা গো! এমন করিয়া মুখ বুজিয়া—না-জানা বিষয়ে প্রশ্ন না করিয়া মানুষ না কি কখন কলের পুতুলের মত কেবলই চলিতে পারে?' মুক্তা ঠাকুরাণী বাঁ' হাতে ফুলশূন্য সাজিটি ঝুলাইয়া ডা'ন হাতে হরিনামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে পথের দুই ধারে চাহিয়া চলিতেছিলেন। কোন দোকানে কি জিনিষ বিক্রয় হইতেছে, কে কি দর করিতেছে, পথ চলিতে কোন দুষ্ট বালক কি অস্পৃশ্য দ্রব্য মাড়াইয়া গেল—এ সকলের কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছিল না। মালতী মৃদুতর স্বরে স্তব আবৃত্তি করিয়া চলিতেছিলেন। হিমু বারকতক মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদের পানে চাহিয়া, যখন উত্তর পাইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিল, তখন পিছাইয়া অরুণের সঙ্গ ধরিল। কিন্তু আজ অরুণও তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না। তাহার অনর্গল প্রশ্নের উত্তর ত দিলই না, যদিই কোনটার দিতেছিল—তাহাও এত সংক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন যে হিমু হাসিয়া কহিল,—"হোলো কি তোমার অরুণ দা! কাণেও কি তুমি আজ শুনতে পাচ্ছ না? বুঝতে ত কিছুই পাচ্চ না দেখ্‌চি। সন্ন্যাসী তোমায় যাদু করে দিলেন না কি?"

সম্বিত-শ্বাসে অরুণ কহিল, "কি জানি কি কল্লেন। তবে কিছু যে করেছেন তা সত্যি। আমার মনে হচ্চে কি জান? পালিয়ে না এসে যদি ছুটে গিয়ে ওঁদের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে চারখানি পা চোখের জলে ভিজিয়ে দিতেম—তা'হলেই বেশ কর্ত্তেম। হয় ত জন্মান্তরের আমার কেউ ছিলেন ওঁরা!"

হিমু একটুখানি ভাবিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কিন্তু যদি এ জন্মেরই হন্,—তাও ত হতে পারেন?"

"অ্যাঁ! পারেন তা?" বলিয়া হঠাৎ যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বিস্ময়ব্যাকুলকণ্ঠে অরুণ কহিল "কই সে কথা ত আমার মনে হয়নি?

'এ জন্ম' বল্‌তে আমার যে বাবার মুখ, মা'র মুখ, বীরগঞ্জের বাড়ী, সেখানকার মানুষদের—গাছপালা,—মন্দির, অতিথিশালা,—সেখানকার রাস্তা, ঘাট, এই সবই মনে পড়ে। তারও পেছনে যে আর একটা জন্ম ছিল—সে যে আমি ভুলেই গেছি। চেষ্টা করেও ত কিছু মনে আনতে পারিনা। কিন্তু কিযে ছেলেমানুষি কচ্চি আমি! চল হিমু, ওঁরা এগিয়ে গেলেন আবার" বলিয়া সে জলভরা চোখ লুকাইবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া হিমুকে পিছনে রাখিয়া অগ্রসর হইল। পিছনে থাকিলেও তাহার বুক-ফাটা চাপা-নিশ্বাসের শব্দটা হিমুর কাণ এড়াইল না। সে দ্রুত চলিয়া কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল "এবার থেকে রোজ আমরা দুর্গাবাড়ী আস্‌বো, কেমন? হয়ত একদিন না একদিন আবার তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। এবার দেখা হলে তাঁদের আমি সব জিজ্ঞাসা কর্‌বো—কে তাঁরা, কোথায় বাড়ী—এইসব?"

অরুণের বিষাদাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া সমবেদনায় তাহারও চোখদুটি জলে ভরিয়া গিয়াছিল। ইচ্ছা করিতেছিল আগেকার মত পাশে গিয়া অরুণের ডান হাতখানা সে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সান্তনার কোন কথা কিছু বলে। কিন্তু মনের ঐ ইচ্ছাটিকে সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। এবার দিদিমার বোনঝীর বাড়ী গিয়া সে যে নব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছে যে—সে এখন আর বালিকা নাই, এবং যে কোন পুরুষ সম্বন্ধে ঐ প্রকার কার্য্যগুলা তাহার অনুচিত, লোক তাহা পছন্দ করে না। আর-কেহ না হউক—দিদিমাই এখনি হয়ত বিরক্ত হইয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিবেন।

হিমুর চিন্তা অন্যদিকে ফিরিল,—সে মনে করিল—আহা—উঁহারা যদি সত্যই অরুণদা'র কেহ হন,—কেমন আনন্দ হয়! হিমু মনের আবেগে এককালীন পাঁচপয়সার হরিরলুট মানসিক করিয়া ফেলিল। "হে হরি,

উঁহাদের অরুণদার আপনজন করিয়া দাও ঠাকুর! হিমু তোমায় পাঁচপয়সার হরিরলুট দিবে। অরুণদা' বড়দুঃখী, উহার কেহ আপনজন নাই। মানুষের কেহ না থাকা বড় কষ্ট। উহাকে তুমি কষ্ট দিও না। মা বলেন—যে ভাল হয়, তুমি তা'কে ভালবাস। অরুণদা' বড় ভাল। সুতরাং তাহাকে দুঃখ দেওয়া তোমার উচিতও নয়, এবং তুমিও তাহাকে ভালবাসিতে বাধ্য।" এইরূপে ঠাকুরের কর্ত্তব্য মীমাংসা করিয়া দিয়া মনে মনে খুসী হইয়া সে এইবার প্রফুল্লমনে পথ চলিতে লাগিল। যে ভগবানে যথার্থ নির্ভর করিতে পারে—সেই সুখী। সরলা হিমু নির্ভরের আনন্দ জানিত তা'ই তাহার চির-প্রসন্ন মুখে বিষাদের ছায়াটিও কখন পড়িতে পারিত না।

কয়েকদিন পরে একদিন সকালবেলা দুর্গামন্দির হইতে ফিরিবার কালে ভাস্করানন্দ-স্বামীর সমাধি-মন্দির-বেষ্টিত উদ্যানদ্বারে দাঁড়াইয়া হিমু কহিল—"অরুণদা, মন্দির দেখে যাবে না?"

মুক্তা ঠাকুরাণী কহিলেন, "চল্ চল্ বাপু,—আর দাঁড়ায় না, আজ আবার হাট-বাজার 'উন্কুটি চৌষট্টি' সব কর্‌লে তবে রান্না খাওয়া। রোদ চড়ে উঠ্‌ল মাথার ওপর। এই ত সেদিন দেখে গেলি বাগান—বাগানের আবার দেখ্‌বি কি রোজ রোজ?"

দিদিমা বারণ না করিলে হয়ত হিমুর জেদ এতটা চাপিত না। বাধা পাইয়া সে নিজ অভ্যাস মত হাসিয়া কহিল, "দিদিমার কেবল বাড়ী আর বাড়ী! তবু যদি সে বাড়ী স্যাঁতানে অন্ধকূপ না হোতো! আরসোলা, ইঁদুর, ছুঁচো, বাঁদর, রামঃ,—ও বাড়ীতে মানুষের একদণ্ডও থাক্‌তে ইচ্ছে করে? চল একবারটি—রান্না খাওয়া ত চিরদিন ধরেই আছে?" এই বলিয়া সে চৌকাটের ভিতর পা গলাইতেই মালতী ডাকিলেন—"হিমু!"

হিমু বুঝিল মা বিরক্ত হইয়াছেন। এ আদেশ তাহাকে পালন করিতেই হইবে। তা'ই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুণ্নঃস্বরে কহিল, "আমরা তবে এগুই—তুমি পরে যেও অরুণদা! দেখগে দেখি সেই সন্নেসীদের যদি দেখ্‌তে পাও ওখানে ?"

মুক্তা ঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন,—"হিমি যে সন্নেসীর জন্যে পাগল হয়ে উঠ্‌লি দেখ্‌চি—মন্তর তন্তর নিবি নাকি লো? না,—আর কিছু? বর তো জুট্‌লো না,—বলি তপস্বিনী হবি ঠিক করেছিস্ নাকি ?"

হিমু কহিল,—"পাগল আমি হইনি দিদিমা, অরুণদাই হয়েচে। তোমরা যে চোখ চেয়ে ঘুমোও কিনা—তাই দেখ্‌তে পাওনা, কেবল রান্না আর খাওয়া বুঝ্‌তে পার। দেখ দিদিমা—বলা মুখ আর চলা পা—এরা কক্ষনো থামেনা। যখন থামে সেই—" বলিয়া সে অত্যন্ত দ্রুতপদে চলা আরম্ভ করিয়া দিল। সে জানিত এইমাত্র রসনার যে সুব্যবহার সে করিয়াছে তাহাই যথেষ্ট, তাহার অনেকখানি ভাষা উহ্য রাখিলেও যতটুকু প্রকাশ করিয়াছে, তাহার একটা প্রতিক্রিয়াও বাকি—কিন্তু সেটা আর ঘটিল না। মুক্তা ঠাকুরাণী উদ্দেশে 'ষাট্ ষাট্' বলিয়া বারদুয়েক ষষ্ঠীদেবীর কৃপা ভিক্ষা করিয়াই আপাততঃ বিধবার একমাত্র স্নেহাধারকে ক্ষমা করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনজনেই নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলেন।

অরুণ সঙ্গে না থাকায়, আর কল্পনায় তাহারই অনুকূলে দিবাস্বপ্ন দেখিতে ব্যস্ত থাকায়—হিমুর বলা-মুখও বন্ধ রহিয়া গেল।

কাশী আসিয়া পর্য্যন্ত অরুণ বরাবরই তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। কদাচিৎ মুক্তা ঠাকুরাণী একা কোথাও গিয়াছেন। কিন্তু মালতী ও হিমু সঙ্গে থাকিলে অরুণকে না লইয়া তিনি পথে চলিতে সম্মত হইতেন না। কাশীর পথ তাঁহার অনেকখানি পরিচিত হইলেও,—

বাঙ্গালীটোলার একরকমের গলি ও একরকমের বাড়ীগুলি চিনিয়া বাহির করা তাঁহার নাকি বড়ই মুস্কিল মনে হইত।

আজও তিনি বা মালতী কোন কথা বলেন নাই। অরুণকে তাঁহারা পথিমধ্যে ছুটিও দেন নাই, দিবার ইচ্ছাও তাঁহাদের বিশেষ ছিল না। হিমু তাহাকে মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল মাত্র। হিমু ত এমন অনেক কথাই বলে, সবই যে অরুণ নির্ব্বিচারে পালন করে এমন নহে। কিন্তু আজ হিমুর অনুরোধ যেন কাহার অলঙ্ঘ্য আদেশের ন্যায় অরুণের কাণে শুনাইল। এর পর যে কাহারও অনুমতি লওয়ার কোন প্রয়োজন আছে, সে কথা আর তাহার মনেও হইল না।

তাহাকে ব্যাকুলভাবে বাগানে ঢুকিতে দেখিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী বিরক্ত-ভাবেই পথ চলিতে লাগিলেন। তবু মনে মনে তাঁহার বিশ্বাস ছিল—অরুণ শীঘ্রই তাঁহাদের অনুসরণ করিবে। সত্যই কি আর সন্ন্যাসীর লোভে মধ্য-পথে তাঁহাদের ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে?

ঠাকুরাণীটি আজ কিন্তু তাঁহার অনুমানে ভুল করিয়াছিলেন। অরুণের মুখ দেখিলে হয় ত এ ভুল তাঁহারও হইত না। সে সময় অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই তিনি তাহার প্রকৃতিস্থতায় সন্দিহান হইতেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তখন পথের দিকে বিরাগভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চলিতে ছিলেন।

বাগানের মাঝখানে শ্বেত-পাথরের চত্বরবেষ্টিত শ্বেত-পাথরের মন্দির-চূড়ার উপর সুবর্ণরঞ্জিত কলস। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ। পূজারী ক্ষণঃপূর্ব্বে কয়েকটি ফুল বিল্বপত্রের সহিত গোটা কতক আতপচাউল ছড়াইয়া দিয়া পূজা সারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দ্বার খোলাই ছিল। একজন গেরুয়া পরা নামাবলী গায়ে পুরুষ বাহিরের দিকে পিছন করিয়া মন্দির মধ্যে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। জপ-নিমগ্নের শান্তিভঙ্গ না করিয়া অরুণ নীচে জুতা

খুলিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে প্রণাম করিয়া তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল, পশ্চাৎ হইতে শুনিতে পাইল, "একটু বসে যেও বাবা! আমি তোমারই প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম এতক্ষণ!"

অরুণ বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। মন্দির মধ্যস্থ ঐ জপ-নিমগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কাছাকাছির মধ্যে কেহ কোথাও নাই। এ কি তবে উঁহারই আদেশ? উনি অরুণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন? কে উনি? কিই বা উঁহার বক্তব্য? অরুণের সহিতও তবে লোকের প্রয়োজন থাকে? মানুষটি যেন চেনা মনে হইতেছিল—সম্মুখভাগ ভাল দেখা না যাওয়ায় স্পষ্ট বুঝা গেল না। বিস্ময় ও সংশয়ান্দোলিত চিত্তে সে চুপ করিয়া বাহিরেই বসিয়া রহিল। যত্ন-রক্ষিত উদ্যানে নানাজাতি পুষ্পে রমণীয় শোভা বিস্তার করিয়াছিল। দুইধারে বৃত্তাকার গঠন মধ্যে এক এক শ্রেণীর ফুলের গাছ। মাঝখানের চলন পথের দুইধারে ঘনবিন্যস্ত সমান মাপে ছাঁটা মেহেদির বেড়া। চলন পথগুলি পাথর বাঁধান—দিকে দিকে পথ গিয়াছে। গোলাপের ক্ষেত্রে অজস্র গোলাপ ফুটিয়া আছে। অপর অংশে তেমনি গাঁদা, জিনিয়া, রজনীগন্ধার বাহার। চন্দ্রমল্লিকায় সবে কুঁড়ি ধরিতে সুরু হইয়াছে, এখনও ফুল ফুটে নাই। মালীরা কূয়া হইতে জল তুলিয়া নালীতে ঢালিতেছিল। সেই জল প্রত্যেক ক্ষেত্রের ধারে ধারে সরু সরু নালীপথ দিয়া পুষ্পক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইতেছিল। সদ্যধৌত গাছগুলির শ্যামবর্ণ—ফুলের সহিত মিলিয়া সুন্দরতর দেখাইতেছিল। অন্যদিন হইলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অরুণ এ সব শোভা-সম্পদ দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার মনের অবস্থা অন্যরূপ থাকায়, চোখ মেলিয়া সে চাহিয়া সবই দেখিতেছিল বটে, কিন্তু চোখে তাহার কোন কিছুই পড়িতেছিল না।

কিছুক্ষণ এমনি কাটিয়া গেলে সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহিরে আসিলেন।

অরুণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়াই বিস্মিত হইয়া গেল। এ যে সেই তিনি—যাঁহাকে দেখিয়া অরুণ আত্মহারা হইয়াছিল! যাঁহাকে দেখিবার আশায় আজ এক সপ্তাহ ধরিয়া সমস্তদিন পথে পথে উদ্ভ্রান্তের মত সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে! আজও এখানে এই ইঁহারই দর্শনাশাই কি তাহাকে টানিয়া আনে নাই? সেই ঈপ্সিত জনের দেখা এমন অবলীলায় ঘটিয়া যাওয়ায় সে কেবল বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। কারণ—কি যে তাহার কাঙ্ক্ষিত,—সে ত তাহা স্পষ্ট করিয়া নিজেই জানিতনা।

গৌরীপতি তাহার হাত ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে বসাইয়া নিজেও কাছে বসিলেন, কহিলেন,—"বাবা! আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়! যদি কিছু জিজ্ঞাসা করি রাগ কর্‌বে না ত?"

অরুণ মাথা নাড়িয়া জানাইল,—না! রাগ সে করিবে না। চেষ্টা করিয়াও সে কণ্ঠে শব্দোচ্চারণ করিতে পারিল না।

গৌরীপতি কহিলেন,—"বাবা, তোমার নামটি কি জান্‌তে পারি কি?"

অরুণ জড়িতস্বরে কহিল,—"অরুণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।"

"গঙ্গোপাধ্যায়?" বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ম্লান আকাশের পানে তেমনি বিষন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কণ্ঠেও তাঁহার যেন একটা নিরাশা ব্যঞ্জক ক্ষুন্নস্বর ধ্বনিত হইল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"নিবাস?"

অরুণ কহিল,—"আপাততঃ ঝাল্‌দা! কল্‌কাতায় থেকে পড়ি, ছুটিতে ঝাল্‌দায় একজনদের বাড়ী থাকি।"

গৌরীপতি আর একটু কাছ ঘেঁসিয়া উৎসুক কণ্ঠে কহিলেন,—"সে তবে তোমার দেশ নয়? নিজের দেশ? পৈত্রিক নিবাস? বাবা! বুড়োমানুষের অন্যায় কৌতূহলে অসন্তুষ্ট হচ্চ কি? তোমার বাবার নামটি কি বল ত বাবা!"

অরুণের বিষন্নমুখে লজ্জার অরুণ আভা ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ নামাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"৺ইন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় —বীরগঞ্জের জমীদার। তিনি আমার পিতা নন্—পালক-পিতা। আমি জানি না, কেন আপনি আমার পরিচয় চাইচেন। আমি হতভাগ্য, এ পৃথিবীতে আমার কোন সত্যকার পরিচয়ই নেই! ভয় হয়—যা অন্ধকারে আছে—তা জানতে! জানি না আমি কে,—বা কি?"

এমন করিয়া মনের স্পষ্ট কথা সে কখন কাহাকেও জানায় নাই। আজ ইচ্ছা না থাকিলেও 'কেমন' আত্মবিস্মৃতের মতই এত কথা বলিয়া ফেলিল।

সন্ন্যাসী ধীরে তাঁহার কম্পিত হাতখানি দিয়া অরুণের মাথায় স্পর্শ করিয়া কহিলেন,—

"তোমার মুখ-ই তোমার পরিচয় দিচ্চে যে? ভয় কিসের বাবা? কিন্তু একি সত্যি? এ—কি শুনচি? তুমি কি তবে নদী-জলে ভেসে ঐ মহাপুরুষের কোলে আশ্রয় পেয়েছিলে? কিন্তু বীরগঞ্জ সে দেশ থেকে যে অনেক দূর—বহুদূর যে!" আত্মগত ভাবে এইরূপ বলিয়া গৌরীপতি চিন্তাবিষ্ট হইলেন।

অরুণ ব্যাকুলভাবে কহিল,—"বাবা নৌকা-পথে—বিদেশ থেকে ফির্‌ছিলেন, পথে সন্ধ্যা থেকে ঝড়-বৃষ্টির জন্য আঘাটায় নৌকা বেঁধে রাতে থাক্‌তে হয়েছিল। সকালবেলা জলের ধারে গাছের তলায় মরার মত অবস্থায় আমায় তিনি কুড়িয়ে পান। বাবা মারা যেতে আজ ছ'বছর আমি সে শান্তির আশ্রমও হারিয়েছি! তিনি থাক্‌তে যদিও আমি জান্‌তে পারিনি যে আমি তাঁর ছেলে নই!" ইন্দ্রনাথের স্মরণে অরুণের চোখে জলের আভাস দেখা দিল।

গৌরীপতি কহিলেন,—"পূর্ব্বজীবনের কোন নিদর্শন কি তোমার ছিল

না তা হলে? গলায় ত্রিকোনাকৃতি সোনার পদক—ভিতরে ভূর্জ্জপত্রে লেখা—এমন কিছু? তিনি বোধ হয় তোমার আত্মীয়দের কোন সন্ধানের চেষ্টাও করেন্‌নি—তেমন করে?"

"না,—না! অনেক চেষ্টাই তিনি করেছিলেন বইকি! বহুকাল বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কখনো আমার খবর নিতে আসেনি; হয় ত তাঁদের কেউ বেঁচেও ছিলেন না। নৌকা-ডুবিতে সকলেই বোধ হয় মারা গেছ্‌লেন। বাবা তাই অনুমান করে আমার অতীত আমায় জান্‌তে দেন্‌নি। তিনি না দেখ্‌লে,—তাঁর অসীম যত্ন চেষ্টা না পেলে—সবাই বলে—আমারও বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। হ্যাঁ, ত্রিকোণাকৃতি সোনার কবচ একটা গলায় ছিল বই কি! ভূর্জ্জপত্রে লেখা—কিছু পড়া যায়নি, শুধু 'শর্ম্মা' কথাটুকু জানা গেছ্‌ল, তাই বাবা আমায় ব্রাহ্মণ বলে, প্রচার করেছিলেন।"

গৌরীপতি অশ্রুসিক্ত চোখে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া যুক্ত-করে প্রণাম করিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন,—"সত্যই তিনি তোমার পিতা ছিলেন। তাই তোমার মৃত-দেহে জীবন সঞ্চার করে নিজের করে নিয়েছিলেন! কিন্তু তোমার হতভাগ্য জন্মদাতা,—সেই দুর্য্যোগ রাত্রে একমাত্র স্নেহের ধনকে ঘরের ভিতর বন্ধ করে নিরাপদে রাখ্‌তে পারেনি,—নদী-জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল!"

অরুণ সহসা গেরুয়া-ধারীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ব্যাকুলভাবে কহিল,—"এ সব কি বল্‌চেন আপনি—কেন বল্‌চেন আমায়? আমার মনে হচ্চে আপনি সব জানেন! আমার এ—কি মনে হচ্চে? যা কখনও হয়'নি—তাই হচ্চে। আর—আর—এ সব আমি কি দেখ্‌চি! গাছের ছায়ায় ঢাকা একতালা বাড়ী, পাশে পুকুর, মন্দির, বিগ্রহ,—কি ঠাকুর? কালী না শিব? উঁহুঁ—রাশ-ফুল দিয়ে ঘর সাজানো—গোপাল-মূর্ত্তি,

তুলসীমঞ্চ! বায়স্কোপের মত এ কোন দেশের ছবি আমি দেখ্‌তে পাচ্চি—মন্দিরের ধারে কুর্চ্চি-ফুলের গাছ, সাদা ফুলে সব্‌টা ভরা, পাতা দেখা যায় না!" অরুণ তাহার স্বপ্নাভিভূত দৃষ্টি তুলিয়া পুনরায় কহিল—"জ্বলন্ত-চিতায় দাহ হচ্চে—কার সে দেবী মূর্ত্তি? আপনি—আর তিনি—সে দিন যাঁকে আপনার সঙ্গে দেখেছিলেম—আপনি আর তিনি—আমার কোনো—কোনো জন্মের কেউ কি? আমায় বলুন—বলুন আমায়!"

অরুণের দেহ কাঁপিতেছিল। গৌরীপতি অভিভূতপ্রায় অরুণকে বুকের খুব কাছে টানিয়া ব্যথাবিজড়িত মৃদু-স্বরে কহিলেন,—"তোমার এ জন্মেরই সন্তান-হারা অভাগা বাপ—আমি। আর আমার দুর্ভাগিনী মা,—তিনি তোমার ঠাকু'মা গোপাল! গোপাল! অরুণ,—বাবা আমার,—চোখ চাও বাবা! মা যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন। আমি বাপ হয়েও চিন্‌তে পারিনি। তিনি যে একবার দেখেই কুড়িবছর পরেও তোমায় চিনেছিলেন। মা আমায় ভোর হতেই এখানে পাঠিয়ে দিয়েচেন। বলেছিলেন—তুমি আজ এখানে নিশ্চয়ই আস্‌বে। বাবা আমার—কথা কও! আজ তুমি পরিচয়-হীন গৃহ-হারা—আর আমি সর্ব্বস্বহারা হয়েও সম্মানিত গৃহী!—হা জগদীশ্বর!"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিয়ের চিঠি

একদিন সকাল বেলার ডাকে সুনীতি শৈলাঙ্গিণীর একখানা চিঠি পাইল—ভাঁড়ার ঘরের সাম্‌নে দালানে বসিয়া সে তখন আনাজ কুটিতেছিল। জলদের চা জলখাবার দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এখন আর কাজের তেমন তাড়াতাড়ি নাই। ছেলেরা দুধ খাইয়া চাকরদের কাছে বাহিরে গিয়াছে। তা'ই নিশ্চিন্ত মনে সে তরকারী কুটিতে কুটিতে অনেক কথাই ভাবিতেছিল। অতীত ও বর্ত্তমানের অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতিই তাহার মনে উঠিতেছিল। মানুষের আশাপূর্ণ নবীন জীবনে যদি অতর্কিত দুঃখের আঘাত লাগে তাহার বেদনা বুঝি সারাজীবনেও আর দূর হয় না! সুনীতির মনে পূর্ব্বের স্বচ্ছন্দভাব আর ফিরিয়া আসে নাই। প্রকৃত দুঃখের হেতু কিছু বর্ত্তমাই না থাকাতে—কল্পিত দুঃখের মধ্যে সে নিজ বর্ত্তমানকে অনেক সময় ডুবাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। স্বামীর বর্ত্তমান ব্যবহারে অভিযোগের যোগ্য কোন কিছু নাই থাক, তবু তাঁহার নিরালা মনটি কি সে আর ফিরিয়া পাইয়াছে? মন কি মানুষের ব্যবসায়ের জিনিষ? অনেক সময় শৈলের অভাবও তাহার অনুভব হইত। এ সময় তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পাইলে হয় ত মনের এ উৎসাহহীন উদাসভাবটিকে সরাইয়া দিতে পারিত। সেও দূরে চলিয়া গিয়াছে।

বড়খোকা একখানি খামেমোড়া চিঠি আনিয়া মার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল—"তোমার চিঠি মা। আমি বানান করে করে পড়ে

দেখেছি—শ্রীমতী সুনীতি দেবী—শ’য়ের তলায় একটা ‘র’ ফলা দেওয়া আছে। কে লিখেছে মা বল না ?”

বড়খোকা এখন দ্বিতীয় ভাগ পড়িতে শিখিয়াছে। সুনীতি আনাজ ধোওয়া ভিজা হাতের উল্টাপিঠ দিয়া চিঠিখানি সোজা করিয়া দেখিয়া কহিল—“তোমার বড়পিসীমা লিখেছেন যে ?”

“বড়পিসীমা কবে আস্‌বে মা ? তপ্‌সী, তনু চলে গিয়ে আমাদের আর ‘পাঠশালা পাঠশালা’ খেলাই হয় না। তুমি বড়পিসীমাকে লিখে দাওনা মা —শীগ্‌গির করে যেন চলে আসেন !”

মা বলিলেন—“আচ্ছা আমি তাই লিখে দেবো। কি লিখ্‌বো শোন্—আমি লিখ্‌বো—‘বড়খোকা তোমায় শীঘ্র আসিতে বলিতেছে। তুমি পত্রপাঠ এখানে চলিয়া আইস। না হইলে তাহাদের খেলা হইতেছে না’—কেমন এই ত ?”

বড়খোকা হাসিয়া—“হাঁ মা ঐ কথা লিখো” বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল—এমন সময় অদূরে পিতাকে আসিতে দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুনীতিও চাহিয়া দেখিল। একখানি খোলা চিঠি হাতে স্বামী বোধ হয় তাহারই উদ্দেশে আসিতেছেন। সে হাতের কাজ বন্ধ করিয়া কোলের উপরের চিঠিখানি সবেমাত্র খুলিবার উপক্রম করিতেছিল—এখন তাহা আবার যথাবৎ রাখিয়া দিয়া প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে স্বামীর মুখের পানে তাকাইল। কাছে আসিয়া হাস্যমুখে জলদ কহিল—“বাবা লিখেছেন—নিরুর বিয়ে ঠিক হ’য়ে গেছে। ফাল্গুনের প্রথমেই দিনস্থির করা হবে। আমায় পনেরো দিনের ছুটি নেবার জন্যে দরখাস্ত কর্‌তে বলেছেন !”

সুনীতি মুহূর্ত্তে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া কহিল—“ঠাকুরপোর ধনুকভাঙ্গা পণ ভাঙ্গ্‌লো তা হ’লে ; বিয়েতে রাজী হয়েছে ? বেশ, বেশ আমার খুব আহ্লাদ হচ্চে কিন্তু !”

নীরদ জলদের মেজ ভাই। সে এতদিন বিবাহ-বিরোধী দলে ছিল। সম্প্রতি ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মত পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

জলদ মৃদু হাসিয়া কহিল—"চিরদিন কারও সমান যায় না। আচ্ছা আমি যদি এর চেয়েও আর একটা ভাল খপর দি ত কি দেবে বল দেখি?"

সে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল বটে কিন্তু সে হাসিতে একটুখানি লজ্জার আভাষও যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকাশ পাইতেছিল। সুনীতি স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া কহিল—"ডবল্ বক্‌শিশ! খবরটা কি শুনি ত আগে?"

জলদ মনের ইতস্ততঃ ভাবটুকু সরাইয়া সহজ সুরে কহিল—" 'আমার কিরণ' এবার থেকে তোমাদের সকলকারই হলেন। আমারও তিনি মেজমা হলেন এবার! কেমন খুসী হলে ত?"

সুনীতি একদিন স্বামীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল—"তোমার কিরণের চিঠি!" জলদ আজ সময় পাইয়া তা'র শোধ লইল। ছেলেটিকে আমরা যতটা আত্মভোলা নিরীহ মনে করি—দেখিতেছি আসলে সে ঠিক ততটা নয়!

স্বামীর এ বিদ্রূপের আঘাতটুকু সুনীতি কিন্তু পুষ্পাঞ্জলীর মতই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। এ অশ্রু—আনন্দ অভিমান ও মুক্তির ত্রিধারা সংযোগের। চেষ্টা করিয়াও সে মনের এ অভিনব ভাবাবেগকে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার চোখের জল—তাহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী যে কাছেই দাঁড়াইয়া আছেন—আর মনের এ দুর্ব্বলতা তাঁহার নিকট প্রকাশ করা যে লজ্জাজনক—তাহা যে স্মরণ রাখিতে পারিল না। জলদ কাছে আসিয়া তাহার ললাটে দুইটি অঙ্গুলীর মৃদু স্নেহস্পর্শে কহিল—"ছি—ছেলেমানুষি করে না! চোখ মুছে ফেল। বড়খোকা চেয়ে আছে যে অবাক হয়ে।"

সে স্ত্রীকে শান্ত হইবার অবসর দিবার জন্যই পুনরায় ব্যস্ত হইয়া বৈঠক-

থানায় ফিরিয়া গেল। তাহার মনে হইল—এইবার বুঝি তাহার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইল। যে প্রণয়প্রতিমা নিজের মন হইতে সে অনেক দিন পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন দিয়াছিল তাহার কাটামো খানা এতদিন ভারী পাথরের মতই তাহার স্ত্রীর বুক জুড়িয়া বসিয়া ছিল। আজ সে পাষাণভার নিজ হইতেই নামিয়া গিয়াছে! ভগবান্ সত্যই তাহার প্রতি দয়ালু!

স্বামী চলিয়া গেলে বিস্মিত বিষণ্নমুখে ছেলেকে কাছে ডাকিয়া—হঠাৎ চোখে ধূলা পড়ার জন্য বার কতক আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া—ছেলেকে আদরে ভুলাইয়া বাহিরে খেলিতে পাঠাইয়া এইবার সে শৈলের চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। শৈল লিখিয়াছে—"ভাই বৌ! এবার তোমার ম্লান মুখখানি মনে এঁকে এনে বড় অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেম। হয় ত তাতে ঠাকুর পূজোর কোন ব্যাঘাত হয়েছিল। অন্তর্যামী তাই কৈফিয়ৎ চাইলেন—'বল কি হয়েছে'? কিছু যে হয়েছে—এটা ঠিক না বল্লে তো কিছুতেই শুন্‌বো না! কিন্তু এও কি একটা বল্‌বার কথা নাকি? তোমার নন্দাই যখন এটর্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন—শুনে তুমি বলেছিলে মনে আছে যে—'ঠাকুর-জামায়ের পরিশ্রম সার্থক হ'লো—এটা খুব সুখের বিষয়! কিন্তু ভাই কাজটা বড় মন্দ! ওরা—এটর্নীরা নাকি দিনকে রাত করে! জ্যান্ত মানুষকে উড়িয়ে দেয়। বাপের নামেও ডিক্রীজারী করে'! কথাটা নিছক না হোক—অনেক খানি সত্যি! এই দেখ না—তার সাক্ষী! কখন যে ভাল মানুষটির মত আমার মত যুধিষ্ঠিরের শাপবিবর্জ্জিতা শৈল অর্থাৎ পাষানের পেটের কথাটি বার করে নিয়েছেন—জান্‌তেও পারি নি আমি! হঠাৎ সেদিন বাবার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। বাবা লিখেছেন,—তাঁর জামায়ের চিঠিতে শুন্‌লেন, মহেন্দ্রবাবু ডেপুটীর মেয়েকে তোমার নাকি ভয়ানক মনে ধরেছে। নিরুর সঙ্গে তার বিয়ে দিতেই হবে—এটা তোমার আর্জ্জি, দাদার ও নাকি তেমন অপছন্দ নয়! তবে তোমারই একান্ত

জিদ্ ও আবদার! বাবাকে ত জানই! তোমার আব্দার ঠেল্‌বার তাঁর সাধ্যই নেই। কাজেই উপযাচক হয়ে মহেন্দ্রবাবুকে লিখে তাঁর ডাক্তার ছেলেটির জন্যে মেয়েটিকে ভিক্ষে চেয়েছেন। তোমার এত সাধ—নিরু বেচারাই বা করে কি? বিশেষ—এবার তার 'মরা' কাটা ছেড়ে 'জ্যান্তর' পালা এলো। মা-ই একটু যা বিগ্‌ড়ে ছিলেন—'ডাগর মেয়ে, শিক্ষিত মেয়ে'—ইত্যাদি। তা—সে তাঁর এটর্নী জামাই একদিন নিমন্ত্রন খেতে গিয়ে তাঁকে এমন বুঝিয়ে দিয়ে এসেচেন যে মাও চট্‌পট্ মত দিয়েচেন। শুনলাম্—মেয়ে এখন ত্রিপুরায়! পোড়ারমুখি!! আমি মরছি ওঁর ভাবনায়—আর রাণী আমার নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কচ্ছেন। কাল কলি কি না? বেইমান কোথা কার? একটা খপর দেওয়াও দরকার মনে হয় নি বুঝি? এমনিই লো? তবু লোকে দোষ দিতে হলে—ননদের দেয়—বলে—'ভাজ বড় গুণবতী! ননদিনী কুটিলা'—আরো কত কি? আচ্ছা এসো তুমি—এর শোধ তোলা রৈল! এইবার কোমরে কাপড় বেঁধে দেওরের বিয়ের উদ্যোগে লাগ্‌বে এসো। ঢ় মন নাড়ুর চাল কুট্‌তে হবে—মনে থাকে যেন? এটর্নী মশাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন—তাঁর বিলটা কবে পাঠাবেন? জানো ত—এঁরা স্ত্রীর নামেও বিল করেন! হাঁ৷ রে বৌ—সুর্য্যি এখন কোন দিকে উঠ্‌ছে ভাই? ডোবে বোধ হয় এখন দক্ষিণে? ইতি—

তোমার আপদ বালাই চিরদিনের

শৈলাঙ্গিনী।"

চিঠি মুড়িয়া আঁচলে বাঁধিয়া সুনীতি কাপড়ে আবার চোখ মুছিল। তবু অবাধ্য অশ্রুধারা ক্রমাগতই ঝরিতে লাগিল। এ অশ্রু দুঃখের নয়—বিষাদের নয়—এ অশ্রু আনন্দের! নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের—পরম শান্তনার—অশ্রু-ধৌত উচ্ছলিত নির্ম্মল অন্তঃকরণে সে বার বার মনে মনে আবৃত্তি

করিল—"আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলেম কিরণ !! জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্ তোমার দেওয়া যে দুঃখ আমি বহন করেছি—তার এতটুকুও অভিশাপও যেন কখন তোমায় স্পর্শ করতে না পারে ! তোমার ভবিষ্যৎ যেন চির-সুন্দর, চির-মধুময় হয়—তোমার পথ যেন বাধাহীন আনন্দোজ্জ্বল হয়, এই আমার একান্ত আশীর্ব্বাদ ! তোমার উপর আমার ক্রটী—চিরদিনের স্নেহ দিয়ে আমি শুধ্‌রে নেব !"

মন যখন কানায় কানায় পূর্ণ থাকে তখন মানুষ দেউলিয়া হইয়াও নিজেকে বিলাইয়া দিতে ব্যস্ত হয়। সুনীতিরও আজ যেন এই অবস্থা আসিয়াছিল। তাহার মনের উষ্ণ-নদীতে অকস্মাৎ জোয়ারের প্লাবন আসিয়াছিল। কিরণ ত' তুচ্ছ ! সে আজ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলকেই ভালবাসিতে ব্যগ্র—সকলের জন্যই নিজেকে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত ! বিড়ালটা ছোট খোকার দুধের বাটীতে চুমুক দিয়া পলাইয়া গেলে, পশ্চাদ্ধাবিতা দাসীকে যে অনুনয়ের স্বরে কহিল,—"আহা মারিস্ নে, অবলা জীব ! ওরে খাবার ত কেউ দেয় না ? কাজেই চুরী করে খায়" ! বিস্মিতা দাসী অবাক্ হইয়া মা ঠাকুরাণীর পানে চাহিয়া দেখিল। সপ্তাহ খানেক এখনো অতীত হয় নাই, ঠিক এই অপরাধেই উনিই না সে দিন অবলা জীবের শাস্তি-বিধানে অক্ষম হইয়া ঠাকুর, চাকর ও তাহার মাহিন কাটিতে চাহিয়া ছিলেন ? এবং পোড়ারমুখো বিড়াল কি জন্য তাঁহার দাসদাসী রক্ষিত বাড়ীতে ঢুকিবার অধিকার পায়, তাহারই জবাব চাহিয়া তাহাকে গলদ-ঘর্ম্ম করিয়া ছাড়িয়া দিয়া ছিলেন ? আজ তাঁহার আবার এ হইল কি ? তামাসা ত নহে ? তাই হইবে। কোন নূতন ধরণের বকুনী খাইবার সম্ভাবনার ভয়ে দাসী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া দু'দিক বাঁচাইয়া অস্পষ্টভাবে কি বলিতে বলিতে কর্ত্রীর চোখের বাহিরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল !

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিয়ে বাড়ী

"হ্যাগা ছোট্‌ঠাকুমা! মালী বৌ যে সিঁথী, মৌর, টোপর, মালা সব দিয়ে গেল,—তা 'গোড়ে' কই? গোড়ে নৈলে কি কখন বিয়ে হয়? মালা বদল হবে কি দিয়ে।"

"হয় লো হয়! সাহেব বিবিদের সব হয়, দেখিস্‌নি? আসর সাজান দেয়ালে টাঙ্গাবার পাতার মালাগুলো পর্য্যন্ত পরে বিয়ে হয়। ঐ জন্যেই ত আষাঢ়মাসে বিয়ের ঠিক করেছিলেম। তখন বনে-বাদাড়ে ফুলে ফুলবৃষ্টি! তা মহারাণী আমার প্রতিজ্ঞা করে বস্‌লেন—যে ওঁকে যুদ্ধে হারাবে—সেই ওঁর পতি হবে! বুড়ো জমিদার—ঘি দুধ খেয়ে ভুঁড়ি বানিয়েছে, থুপ্‌-থুপে নাদুস্‌-নুদুস চেহারাখানি,—সে ও সর্দ্দারণী মেয়ের সঙ্গে পারবে কেন বল্‌? বেচারী মনের দুঃখে তাই, বৌ মারা যেতে কাশী-বাসী হোল! এখন অঘ্রাণ মাসে ভাল ভাল ফুল পাবি কোথা লা ছুঁড়ি? হয় গাঁদা, টগর, মোরগ—নয় ত—নিগন্ধি যা তা ফুলের ক'টা একুটে মালা দিয়েই কাজ সেরে নিতে হবে। মেয়েটা গেল কোথা আবার?—আল্‌তা পরেচে ত? বলি মেজুনি,—তোর কি আক্কেলখানা বল্‌তো? ঢুলিরা জল খাবারের জন্যে সেই খন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েচে,—তুই কি না স্বচ্ছন্দে বসে গল্প জুড়ে দিয়েচিস্‌!—ওগো বাছারা,—মাছগুলো ঐ উঠানের কোন ঘেঁসে ঢালো না? আঁশবঁটির ভাব্‌না কি, ঐ যে চালার পেছনে গাদা জড় করা রয়েছে! ওগো—ও বাগ্‌দী-বৌ, তোরা বাপু মাছ কুটতে বসে যা না—রোদ চড়ে উঠ্‌ছে যে, ভাজ্‌বে কখন? 'কামান টামান' গুলো সেরে নে—মা গো—

মেয়েরা! সেও কি এই বুড়ীকে নজর রাখ্‌তে হবে না কি? রাণু কোথা গেলি গো?—ও রাণু!—এই নে মা, মেয়ের হার, রুলী আর দুল দিয়ে গেল—স্যাকরা-বৌ। উচ্ছুগ্যু করে পরিয়ে দিয়ে যা। তোর লক্ষ্মীপ্রতিমা-মেয়ের যুগ্যি হয়নি বাছা! অবশ্য গরীব দিদিমার যুগ্যি হয়েচে" ইত্যাকার মন্তব্য ও তদায়ক কার্যে মুক্তা ঠাকুরাণী আজ একাই এক শত জনের কাজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। চিরদিন তিনি-ই সকলেরি করিয়াছেন। আজ সুযোগ পাইয়া অনেকেই তাহার শোধ নিতে চাহিতেছিল। তবু যজ্ঞেশ্বর-হীন যজ্ঞের মত যেখানে তিনি নাই সেই খানেই বিশৃঙ্খলা। মালতী ও হিমুকে শুনাইয়া মধ্যে মধ্যে মুখে নিজ নির্ব্বাচিত বরের প্রশংসা ও অরুণের নিন্দাও চলিতেছিল। তবু তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল—সেটা নিতান্তই মৌখিক! অন্তরে তাঁহার আজ আনন্দের তুফান বহিতেছিল। এ বাড়ীতে এমন করিয়া মঙ্গল-শঙ্খ ত তাঁহার জ্ঞানে কখনো আর বাজে নাই! তা' ছাড়া—অরুণ ও হিমু,—ত' মেয়েটা যেমনই দুর্ম্মুখ হউক না কেন, উহারা যে তাঁহার মনের নিভৃততম প্রদেশে স্নেহের কঠিন শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে? ইহাদের একটিকেও ছাড়া যে কত কঠিন ছিল—তাহা তাঁহার দুর্ভেদ্য অন্তঃকরণই শুধু বলিতে পারিত। এই অকল্পিত অঘটন ঘটনার সমাবেশে ভক্তিমতী বিধবা বিপুল আনন্দে ভাসিয়া আনন্দময়ের লীলাই কেবল প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। এমন করিয়া এ দু'জনের 'গাঁটছড়া' বাঁধা কখনও কি মানুষের দ্বারা সম্ভব ছিল?

অরুণের প্রকৃত পরিচয়লাভের আনন্দ সহিয়া গেলে, গৌরীপতি যে দিন মুক্তা ঠাকুরাণীর কাছে হিমানীকে পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করিলেন,—সে দিন হিমু ও অরুণ গভীর বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়াছিল। এ যেন একটা অসম্ভব ঘটনা—তবু অরুণ ইহাতে খুসীও হইয়াছিল! হিমু এখন হইতে চিরদিনই তাহার কাছেই থাকিবে—সে আর পরের ঘরে, পর হইয়া চলিয়া যাইতে

পারিবে না। কিন্তু তখনি সে মনকে কঠোর কশাঘাতে ফিরাইয়া লইল—স্বার্থপর সে—একি অন্যায় চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে বসিয়াছে ? অরুণ পিতাকে জানাইল,—প্রফুল্লের সংবাদ না লইয়া সে সংসারের কোন কিছুতেই স্বীকৃতি দিতে পারেনা। গৌরীপতি তাহাতেই সম্মতি দিলেন।

এবার সে সহজেই প্রফুল্লের সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিল। আলোকনাথের কর্ম্মচারীদের কাছে সে জানিতে পারিল—মাতৃ-বিয়োগের পর প্রফুল্ল তাহার রুগ্ন মাতুলকে লইয়া মাতুলালয়েই সেই হইতে বাস করিতেছে। আলোকনাথও স্ত্রী-বিয়োগের পর মাতৃসহ কাশীবাস করিতেছেন। হেমাঙ্গিনীর শেষ ইচ্ছা পূরণার্থ তাহাকে কাশী লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাহার দেহান্তের পর কর্ত্তা ও তাঁহার মাতাঠাকুরানী—কাহারো আর সংসারে ফিরিবার ইচ্ছা না হওয়ায় সেখানেই তাঁহারা রহিয়া গিয়াছেন। অরুণ আরও শুনিল—আলোকনাথ উইল করিয়া তাহর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর বিষয়সম্পত্তি প্রফুল্লকেই দান করিয়াছেন। প্রফুল্ল যদি তাহা গ্রহণ না করে—ভবিষ্যতে তাহার উত্তরাধিকারীরা উহা পাইবে। আলোকনাথের নিজের জন্য জীবিতকালে মাসিক কয়েকশত টাকার বন্দোবস্ত আছে মাত্র। মানবমনের এই অকস্মাৎ বৈরাগ্যের বিচিত্র সংবাদে অরুণ বিস্মিত হইল! স্ত্রী বর্ত্তমানে যে মানুষ বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল,—স্ত্রী-বিয়োগে সে আজ কত অনায়াসে সর্ব্বত্যাগী হইল! আশ্চার্য্য! অরুণ ভাবিয়া দেখিল আলোকনাথের চরিত্রের এইটুকুই বিশেষত্ব,—হিমুকেও সে এমনি করিয়াই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিল!

প্রফুল্লের সহিত দেখা হইলে দুইবন্ধুতে সুখদুঃখের অনেক আলোচনাই হইল। অরুণের অপ্রত্যাশিত পিতৃমিলন সংবাদে প্রফুল্ল আন্তরিক আনন্দ লাভ করিল। অরুণ প্রফুল্লের মাতৃ-বিয়োগে ও খুড়ীমার মৃত্যুতে

দুঃখপ্রকাশ করিলে—সে কেবল শান্তভাবে চুপ করিয়া রহিল। সে ক্ষত এত গভীর যে ইহার স্পর্শের বেদনাও বুঝি সহা যায় না! বন্ধুকে সে তা'ই আনন্দেরদিনে তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখের অংশ দিতে পারিল না।

অবশেষে অরুণ যখন মৃদুকুণ্ঠিত বিনম্রস্বরে মালতী দেবীর পক্ষ হইতে তাহাকে হিমুকে বিবাহ করিবার অনুরোধ জানাইল, তখন প্রফুল্ল হাসিতে লাগিল। কহিল—"তুমি তা হলে কিছু খবরই রাখনা দেখ্‌চি। তাঁকে কাকীমা বল্‌তে আমার ঘোর আপত্তি ছিল, কিন্তু 'বৌমা' বলায় একটুও নেই। তুমি এ থেকে সুক্ষ্ম-অর্থ বার করে—ত্যাগের আদর্শ, বন্ধুপ্রেম, নভেলী-লীলার সে সব ব্যাপার স্থির করোনা যেন! বিয়ে এ জন্মে আমি কর্‌বনা। সেটা হিমুর অভাবে নয়,—আমার প্রয়োজনের অভাবে। স্পষ্টকরে সব কথা বোঝ! আমি মনে করিনা যে জীবমাত্রকেই একই নিয়মে সংসারী হতে হবে। যে যাতে যোগ্য বা অধিকারী সে সেই পথেই চলুক। ইন্দ্রনাথ জ্যাঠামশায় বিয়ে করেন্‌নি। তিনি পরম জ্ঞানী, আনন্দময় স্বভাব ও সুখী ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্যের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। আমিও সেই পথকেই কৈশোর থেকে নিজের জন্যে নির্ব্বাচন করে নিয়েচি। অবশ্য দু জনের মতের কিছু পার্থক্য আছে বই কি! কাল হিসেবে সেটা সম্ভবও। দেশের সেবা, গ্রন্থপাঠ ও প্রণয়ন—এই হচ্চে আমার জীবনের ব্রত। অবস্থার ফেরে সম্প্রতি একটা প্রোফেসারী চাকৃরি আমি নিয়েচি—সত্যি। মামাকে নিয়ে শীঘ্রই সেখানে যাব। কিন্তু তাই বলে মতের বদল আমি কখনো করিনি। চাকৃরি করাই আমার আদর্শ নয়। আমারও মামার বইখানা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কাজটাই আমায় নিতে হোল। কারণ আমার বা মামার অর্থসচ্ছলতা নেই। ওঃ—কাকার উইলের কথা তুমি বল্‌চ? হ্যাঁ—সে বিষয়েও তোমাকে সব কথা বলা দরকার রয়েছে যে এখনও! সে সম্পত্তি ন্যায়তঃ আমার নয়। তবু ন্যায্য অন্যায্যের তর্ক আমি

এখানে তুল্‌ব না। আমি শুধু বল্‌ব যে—মাতৃদ্রোহ, দেশদ্রোহের শপথ নিয়ে যা আমি ত্যাগ করেচি, সে সম্পত্তির কণা মাত্রও স্পর্শ করা আমার আর সাধ্য নয়। কাকা,—তাঁ'কেও আমি দুঃখ দিয়েছি, বিস্তর অন্যায় করেচি। তবু তিনি তাঁর অকৃতজ্ঞ সন্তানকে ত্যাগ কর্ত্তে পাল্লেন না। খুড়ীমার শেষ ইচ্ছা পালনে—আর একটা কষ্টকর কাজে কাশী আমি গেছ্‌লেম। অবশ্য দেখাও হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সেখানেই আমি শুনে এসেছি—কাকা উইল করেচেন। সম্পত্তি যদি নেহাৎই আমি না নিই—আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা তা ভোগ করবে। অরুণ,—এটা ন্যায়ের ফাঁকী। কাকার উদ্দেশ্য—আসলে আমি পয়সার দুঃখ না পাই! তাঁর না নিই—ছেলের নেব। এইবার আমরা আসল জায়গায় এসেচি। যাঁর বিষয়—ইন্দ্রনাথ জ্যাঠামহাশয়ের—মনের ইচ্ছা সকলেই জান্‌ত। তিনি হঠাৎ মারা না গেলে,—এ সম্পত্তি যে কাকা বা আমি কোনদিনই পেতেম না,—এটা নিঃসন্দেহ; কারণ, তিনি বেঁচে থাক্‌তে আমাদের কোন খবর কখনো নেন্ নি। এর ন্যায্য অধিকারী তুমি! মেসের বাসায় ছ বৎসর আগে—যেদিন প্রথম তোমার পরিচয় জান্‌লেম সেইদিনই আমার মনে হয়েছিল—এ বিষয় ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তোমারই পাওয়া উচিৎ। কোনো সময়—হিমুকেও এর অধিকার দিতে কাকার ইচ্ছে হয়েছিল। সুতরাং সম্পত্তির অতীত ও বর্ত্তমান—জীবিত ও মৃত—প্রকৃত অধিকারী দু জনেরই নির্ব্বাচিত পাত্র ও পাত্রীদেরই ইহা উচিত প্রাপ্য।—তর্ক কোরনা অরুণ! তাতে আমায় তুমি হারাতে পারবেনা—কক্ষণো! বিশেষতঃ আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী কেউ যখন কখনও থাকবে না—তখন এ তর্ক ত ফুরিয়েই গেল! কাকাকে আমি কালই এ সব কথা বুঝিয়ে লিখ্‌ব। সম্ভবতঃ—এতে তিনি খুসীই হবেন। তিনি হঠাৎ একেবারে বদ্‌লে গেছেন—চলো, এইবার মামার সঙ্গে দেখা করবে। কত বড় শক্তি যে কি অন্যায় রূপে নষ্ট হ'য়ে গেল,—তাঁকে একটু

ভাল করে না বোঝ্‌বার সময় পেলে বুঝ্‌তে পার্ব্বেনা। জ্ঞানের আধার! প্রেমের সিন্ধু! দেশকে কি ভালই যে তিনি বেসেছেন! দু খানা বই লিখেছেন,—দেখো কি সুন্দর জিনিষ হয়েছে। অরুণ—তুমি এ দু খানা পাবলিস্‌ করিয়ে দিতে পার? তুমি আমার ধার শুধ্‌তে চেয়েছিলে,—দেখ,—আমি তারও সুযোগ পাইয়ে দিলেম তোমায়!"

প্রফুল্লের সে অপার্থিব হাসি ও স্বর্গীয় আলোকদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া অরুণ তাহার সকল আদেশই মান্য করিয়া লইল। প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে আশ্চর্য্য হইল! এই মানুষের বিরূদ্ধেও লোকে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিতে পারে? এবং সেও তা' বিশ্বাস করিয়াছিল!

অরুণ ফিরিয়া আসিয়া বিবাহে সম্মতি দিলে—হিমু একদফা গণ্ডগোল বাধাইল। ছিঃ—অরুণদাদাকে কখনো বুঝি আবার বিবাহ করিতে আছে? এ কি হিন্দুর বাড়ী নয়? ভাইবোনে বিয়ে—মাগো! কেমন করিয়া বউ সাজিয়া ঘোমটা টানিয়া সে অরুণের সম্মুখে বাহির হইবে? না, না,—ঐ সব কিছু তাহার দরকার নাই। শেষে মালতীর অনুনয়, উপদেশ, ভৎর্সনা, তাড়নায় সে যখন মৌনে সম্মতি বুঝাইল—তখন লজ্জার যেন তাহার আর সীমা রহিল না। সে যেন একদিনেই বড় হইয়া গেল। দিদিমার ব্যঙ্গ বিদ্রুপকে সে এখন আর প্রতি-আক্রমণ করেই না বরং ভয় করে। আবার তাহাতে আনন্দও পায়। গোপনে অরুণের চিন্তায় অনেক সময় তাহার বুকের ভিতর গুরু গুরু করে। আবার লজ্জাও অনুভূত হয়। অরুণকে সে এখন দেখিতে পায় না। গৌরীপতি অন্যত্র বাসা লইয়াছেন। শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া একেবারে ছেলে বৌ লইয়া বাড়ী ফিরিবেন। লজ্জাবশে অরুণও আর এ বাড়ীতে আসে না।

হিমুর মনে হইল—মার কথা শুনিয়া সে ভালই করিয়াছে। এই ত

অরুণ নিজের বাড়ী চলিয়া যাইত! সে ত আর কখন তাহাকে দেখিতে পাইত না? হয় ত তাহাকেও আর কাহারা কোথায় বন্দিনী করিয়া রাখিয়া দিত। তবু ভারী লজ্জা করে যে!

মাথার রাশকরা এলোচুলের খোঁপার ভিতর লোহার ছোট কাজলনতা-খানি লুকাইয়া চন্দনচর্চ্চিতা লাল-পাড় সাড়ী-পরিহিতা হিমু—দিদিমাকে দূর হইতে দেখিয়াই পলাইতেছিল,—কিন্তু পারিল না। মুক্তা ঠাকুরাণী কাছে আসিয়া হাসিমুখে কহিলেন,—"কি গো, আমার হেমবরণি—হিমুরাণীর রণসাজটা একবার দেখি! ভ্যাবাকান্ত আমার ভ্যাড়াকান্ত হতে পারবেন কি না? মুখ ফেরানা লো নাত্নি—আমরাও একবার চোখ ভরে দেখি" বলিয়া তিনি সুর করিয়া গান ধরিলেন—

'মেয়ে হয়ে রণসজ্জা—লাজের মাথা খেয়েছ কি?
এমা, ওমা,—একিগো মা,—এমন মেয়ে দেখেছ কি?'

হিমু—"যাও!" বলিয়া মৃদু হাসিয়া দিদিমার পানে ফিরিয়া চাহিলে, মুক্তা ঠাকুরাণী মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। হাতে দুইগাছি ফিতা প্যাটার্ণ সোণার রুলী, গলায় একছড়া সরু গোটহার আর কাণে দু'টি রাঙ্গা পাথর বসান দুল! অলঙ্কারের বহর ত এইটুকু—এও হিমুর অঙ্গে আজ নূতন। তবু সে অলঙ্কারের তুচ্ছ শোভাকে ম্লান করিয়া দিয়া তাহার তরুণ-অঙ্গে যে অম্লান রূপের হিল্লোলে বহিতেছিল—আজ যেন তাহা সম্পূর্ণই নূতন বলিয়া মনে হইল। বালিকা চঞ্চলা হিমুর চোখের দৃষ্টিটিও আজ যেন নূতন ভাবের স্নিগ্ধতার কোমল হইয়াছিল। লজ্জা-নম্রা কিশোরীর সদ্য প্রস্ফুটিত হৃদয়-শতদলের অরুণ রাঙ্গা বার্ত্তাটি তাহার মনের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সে মুখের পানে চাহিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী আজই যেন প্রথম অনুভব করিলেন—এ দেহের জন্য বৃথাই তিনি

মণি-মুক্তার লোভ করিয়াছিলেন। ইহাকে সাজাইতে যাওয়া বুঝি—ইহার পক্ষে অপমানই!

তিনি হাসিমুখে কহিলেন,—"সাধে কি আর ছোঁড়া, বুড়ো সবাই পাগল হয় রে? এরূপ দেখে যে মেয়েমানুষেরই মুণ্ডু ঘুরে যায়,—পুরুষ ত কোন ছার!

'কেমনে বল ভাল না বেসে থাকি?
পাগল করেচে তোমার ও দুটি আঁখি!'

কি লো হিমু, মিনি যুদ্ধেই বরকে হার মানালি না কি?"

হিমু সহসা দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সজলকণ্ঠে কহিল, "তোমাদের কাছেই আমায় রাখ্‌লেনা কেন দিদিমা? ওদের ঘরে কেমন করে আমি দিন কাটাব? তোমাদেরই বা দিন কাট্‌বে কেমন করে তা হলে—?"

"কেটে যাবে ভাই! এম্‌নি করে যুগ যুগ ধরে সবারই যে দিন কেটে আস্‌চে। শুধু খবর যেন পাই,—দিন গুলো তোর সুখেই কাট্‌চে! আর মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ যখন মেরে যাবে,—তখন ঝাল খেতে এক আধ বার আসিস্ দিদি! নৈলে—হাঁপিয়েই যে মরে যাব!"

"হ্যাগা পিসি, এখনও নাত্‌নী নিয়ে ঘরের কোনে রঙ্গ কচ্চ? গোধূলিতে যেন বে? বর ত এলো ব'লে। বরের দাদা প্রফুল্লবাবু এই দলিল পত্র গুলো ভাল করে তুলে রাখ্‌তে বল্লেন। তাঁর কাকা আলোকনাথ বাবু তাঁর সমস্ত জমিদারী, ঘর বাড়ী, বিষয়সম্পত্তি দানপত্র করে বর কনেকে এতে যৌতুক দিয়েচেন। কি অশ্চর্য্যি বাবু! কলিকালে এমন যৌতুক দেওয়া ত কখন শুনিওনি—জাত নয়—গুষ্টি নয়!—নাও,—এখন তুমি একবার বেরিয়ে হাঁক-ডাক কর। মলতীদিদি ভাল মানুষ—ওর কথা কি কেউ মানে—না শোনে? বেলা যে পড়ে এলো—!"

প্রতিবাসিনী রোহিনীর কথায় সচকিত হইয়া মুক্তা ঠাকুরাণী অশ্রুভরা কণ্ঠে কহিলেন—

"বেলা যে আমারও পড়ে এলো রে! এবার তোরাই সব হাল ধর্! পরামানিকের পো—ধুতুঁরো ফুলগুলো রাখ্‌লে কোথা? সাজিয়ে ফেল্‌তে বলে দেনা মা? মেয়েদের সব ডাক্ দিকি, বরণের জিনিষ-পত্রগুলো গুছিয়ে রাখুক। ওলো হিমি—কাগজগুলো বাক্সে তুলে রাখ্ দিদি! এরেই বলে—'যার ধন তার ধন নয়—নেপোয় মারে দই!' এ বুড়োর ভালবাসারে,—যুবোর নয়! বাসুক্ দিকি তোর সাতটা অরুণ,—কেমন এমন বাস্‌তে পারে? ও হলে এতক্ষণ জামার আস্তিন গুড়িয়ে আমাদের সেই কাশীর পথের—রেলের সঙ্গী—বেঞ্চি দখল করা পাঞ্জাবী মেয়েটির মত বল্‌তো—'লড়োগী'?"

* * * * * *

"ওগো শাঁখ বাজগো—শাঁখ বাজা! বর এলো যে!"

"অ—ন'দি—বর দেখ্‌বি আয়। বরকে কি সেজেচে দেখ্!"

"বরের কি রূপ—ভাই!"

"রাণু কোথা গেল? মেয়েকে পুঁথি কোলে দিয়ে পাটে বসাক্ না, নিজেও দইয়ের হাঁড়ীতে হাত ডুবিয়ে বসুক!"

"খাসা মানাবে খুড়ি,—যেন শিব-দুর্গা মিলন হবে!"

"মেয়ের তপস্যার জোর আছে বৈ কি! নৈলে কি আর এমন মিলন মেলে?"

"এযে ভগবানের মেলানো দিদি! তোমরাও সব মন খুলে আশীর্ব্বাদ কর, আমার দুঃখিনী রাণু—রাজারাণীর মা হচ্চে—এ দিন যেন তার বর্ত্তমান থাকে!"

"একশোবার খুড়ি! একশোবার! প্রাতঃ বাক্যে একশোবার আশীর্ব্বাদ

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ—

উপন্যাস

স্পর্শমণি (২য় সংস্করণ)	...	...	২৲
স্রোতের গতি	...	...	১॥০
সৌধরহস্য	...	...	১৲
পরাজিতা	..	...	১৲

ছোট গল্প

নির্ম্মাল্য (২য় সংস্করণ)	...	...	১।০
ফুলের তোড়া (২য় সংস্করণ)	...	...	॥০
মাতৃহীন	...	...	॥০
কেতকী	...	...	১৲

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

মা	(উপন্যাস)	...	...	৩৲
পোষ্যপুত্র	ঐ	...	...	২॥০
পথহারা	ঐ	...	...	২॥০
চক্র	ঐ	...	...	২॥০
মহানিশা	ঐ	...	...	২৲
মন্ত্রশক্তি	ঐ	...	...	২৲
রামগড়	ঐ	...	...	২৲
জ্যোতিঃ হারা	ঐ	...	...	২৲
বাগ্‌দত্তা	ঐ	...	...	২৲
রাঙ্গাশাঁখা	(ছোট গল্প)	...	...	৸০
সোনার খনি	ঐ ২	...	...	১৲